শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

বেগম রোকেয়া

সংকলন ও সম্পাদনা

ড. মিজান রহমান

কথাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া
সংকলন ও সম্পাদনা ড. মিজান রহমান

© সম্পাদনার স্বত্ব সম্পাদক

প্রকাশক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
প্রকাশকাল একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১২

অফিস কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৬৫০৯১৯, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪, ০১৯১২৬০৩৪৬১
Email katha@professorsbd.com
Web www.professorsbd.com

বিক্রয়কেন্দ্র ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১২৪৬৫৩, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

শব্দগ্রন্থক কথা কম্পিউটার্স
মুদ্রক সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১২৪৬৫৩

মূল্য ৩০০.০০

SRESTHA PROBANDHO BEGUM ROKEYA
Edited by Dr. Mizan Rahman

Published by Mohd. Jashim Uddin
Kathaprokash, 87 Aziz Super Market, (2nd Floor)
Shahbag, Dhaka 1000
Ph. 8650919, 01766590404, 01912603461
Email katha@professorsbd.com
Web www.professorsbd.com

First Published February 2012
Price Tk. 300.00

প্রচ্ছদ সব্যসাচী হাজরা
ISBN : 984-70120-0238-4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকের উৎসর্গ

আলেয়া বেগম
আমার মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তিনিই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্বপ্রথম সমাজে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তুলে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজও আমাদের সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলন প্রত্যক্ষ। বেগম রোকেয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান পুরুষরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। আর মেয়েদের তো কথাই নেই। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েদের ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা, গৃহই ছিল তাদের একমাত্র ঠিকানা। বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। লেখাপড়ায় তেমন সুযোগ ছিল না, কেবল নিজ গৃহে বা স্থানীয় মক্তব পর্যন্ত ছিল তাদের গণ্ডী। সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে বেগম রোকেয়া বলেন

> সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত।... পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র—কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তাপোষের নিচে লুকাইতাম।...
>
> কোন সময় চক্ষের ইসারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, "কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ" ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না। ['অবরোধবাসিনী']

রোকেয়ার জীবনের প্রধানতম গৌরব এই অচলায়তনের প্রাচীর তিনি ভেঙেছিলেন। এমন এক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা, নারী-অধিকারের প্রতিকূল সময়ে নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে হাজির হন। আর দশজন মুসলমান মেয়ের মতো বেগম রোকেয়াও বেড়ে উঠেছিলেন মুসলিম পারিবারিক নিয়মে। কিন্তু অসীম মনোবলসম্পন্ন এই নারী অকালবৈধব্য হয়েও নারী শিক্ষার বিস্তার ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মেয়েদের জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়ার গার্লস স্কুল', নারী সংগঠন 'আনজুমান খাওয়াতীনে ইসলাম' তৈরির পাশাপাশি নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লেখনির মাধ্যমে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। অন্তরে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা লালন করে আজীবন কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই.

বেগম রোকেয়ার সাহিত্যজীবনের সূচনা হয় ১৯০২ সালের দিকে। তাঁর রচনাবলী বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। রোকেয়ার গ্রন্থগুলো মতিচূর-প্রথম খণ্ড (১৯০৪); মতিচূর-দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০৭); Sultanas Dream (সুলতানার স্বপ্ন) ১৯০৮; পদ্মরাগ (১৯২৪); অবরোধবাসিনী (১৯৩১)। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর একাধিক ছোটগল্প, রম্যরচনা, ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মতিচূর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রবন্ধের সংকলন। এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রবন্ধগুলো এবং বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো আলোচ্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মতিচূর গ্রন্থদুটিতে তৎকালীন সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি এবং নারীর দুঃখ-দুর্দশার চিত্র যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মতিচূর প্রথম খণ্ড প্রসঙ্গে আবুল হুসেন লেখেন

> পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবে, শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের মর্যাদা বুঝাইয়া দিবে, স্বামীকে প্রভু বলিতে ভুলাইবে, স্বাধীনতা দ্বারা দাম্পত্যজীবনের মাধুরী ও আনন্দ যে কতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা অজ্ঞ নারীকে বুঝাইয়া দিবে ও অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে নারী যে সংস্কারজ্ঞান পুতুলঘরের মধ্য হইতে বহন করিয়া আনে, স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে অন্ধ পূজার উপহার দিতে শিখে, তাহা ভুলাইয়া দিয়া মার্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়া দিবে।

মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে [এম.] আনসারী বলেন 'মুসলমান নারী সমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।' রোকেয়ার দৃষ্টিতে পুরুষের অব্যাহত দাপট ও আধিপত্য মানসিকতার ফলে নারীর নিরক্ষরতা, আলস্য ও কর্মবিমুখতার প্রসার ঘটেছে। এক্ষেত্রে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা অনেকটা দ্বায়ী। তাই বেগম রোকেয়ার কণ্ঠে শোনা যায়

> আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলো প্রবেশ করিতে পায় না।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিশেষ করে নারী সমাজের অবনত অবস্থা, অধিকারহীনতাকে দেখানো হয়েছে পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতার প্রেক্ষাপটে। তিনি সমাজজীবনে পুরুষের এই দৃষ্টির পরিবর্তন চেয়ে বলেন

> যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না,—সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। [অর্ধাঙ্গী]

বেগম রোকেয়া মনে করেন সমাজকে স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলেই নারী মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। নারী মুক্তি ও বেগম রোকেয়ার চিন্তার বিভিন্ন দিক অনুধাবনের জন্য কয়েকটি অনিবার্য লাইন নিম্নরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।... শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতালাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি।... তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হউক। [বোরকা]

২. যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছে, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যার মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। [বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি]

৩. পর্দা অর্থেও আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি–কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালোমতে শরীর আবৃত না করাকে 'বেপর্দা' বলি। যাহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাহারা ভালোমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হয়, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়। [বোরকা]

৪. আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত-নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকদের বাটিকে আপন ভবন মনে করিবার যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে সে সুখী নহে, সে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহারা নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হয় হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা–সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থা শোচনীয়। [গৃহ]

৫. মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্দ্ধেক', অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইতে আমরা 'আড়াই জন' হই। আপনারা 'মুহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমীদারী পরির্দশন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্য্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে। [অর্ধাঙ্গী]

৬. আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব, পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানে পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষণার অর্ধেকই আমরা পাই নাই, যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি?... পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। [অর্ধাঙ্গী]

৭. জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্না ঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে। [অর্ধাঙ্গী]

৮. প্রথমে জাগিয়া ওঠা সহজ নয়, জানি, সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি, ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে (but nevertheless it (earth) does move)। আমাদিগকেও এইরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। [স্ত্রীজাতির অবনতি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী মুক্তির পাশাপাশি স্বদেশহিত, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকুলতা, পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার; রাজনীতির প্রতি বিরূপতা প্রকাশিত হয়েছে সৌরজগৎ, মুক্তিফল, নিরীহ বাঙালি, গৃহ প্রভৃতি প্রবন্ধে। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়

> আমরা সর্ব্বপ্রথাম ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। [সুগৃহিনী]

এভাবেই বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধের বিষয়াবলী বহুবৈচিত্রে ভরপুর হয়ে উঠেছে। বেগম রোকেয়া আমাদের গর্ব–আমাদের আদর্শ। এই মহীয়সী নারীর জীবন, চিন্তা ও কর্মের কথা পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' সংকলন।

তিন.

সংকলনটির বানান বিষয়ে দু'একটি কথা বলে নেয়া জরুরি বলে মনে করছি। বাংলা ভাষার বানান অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এই জটিলতা অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে। এ বিষয়ে সম্যক শিক্ষা এবং যথেষ্ট সতর্ক না-হওয়ার দরুন, আজকের দিনে সে জটিলতা আরও বেড়ে চলেছে। বাংলা বানানের এ দুর্গতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালেই লক্ষ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি ২১ জুলাই ১৯৩৫ সালে অসিতকুমার হালদারকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চিঠিটা উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

> বানান সংস্কার পড়লুম। তিন সয়ের মধ্যে মূর্দ্ধণ্যষকে রক্ষা করায় অর্থ বুঝিনে। শ বাংলা উচ্চারণে ব্যবহৃত হয় বাকি দুটো হয় না। জ-এর বদলে য ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। বাংলা অন্ত্যস্থ য কে আমরা বর্গীয় জ-এর মতোই উচ্চারণ করি। অন্ত্যস্থ য-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই।... উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলাদেশে কামাল পাশার আবির্ভাব যদি হয় তবেই বর্ত্তমান বানানের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হতে পারে, যুক্তি তর্কের দ্বারা হবে না। দ্র. *দেশ*, শারদীয় সংখ্যা ১৪০৩, পত্র নং ৪৭

অতীতের বানানরীতি বর্তমানকালের পাঠকের কাছে জটিল মনে হতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আশাকরি বেগম রোকেয়ার 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' সংকলনটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

বাংলা বিভাগ
নটর ডেম কলেজ

ড. মিজান রহমান
২ ফেব্রুয়ারি ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

পিপাসা ১৩॥ স্ত্রীজাতির অবনতি ২১॥ নিরীহ বাঙালি ৩৪॥ অর্ধাঙ্গী ৩৮॥ সুগৃহিণী ৪৭॥ বোরকা ৫৮॥ গৃহ ৬৪॥ নূর-ইসলাম ৭৪॥ সৌরজগৎ ৯৫॥ সুলতানার স্বপ্ন ১২১॥ ডেলিশিয়া-হত্যা ১৩৯॥ জ্ঞানফল ১৬১॥ নারী-সৃষ্টি ১৬৮॥ নার্স নেলি ১৭২॥ শিশু-পালন ১৮৬॥ মুক্তিফল ১৯৩॥ সৃষ্টিতত্ত্ব ২১৫॥ রসনা-পূজা ২২০॥ ঈদ-সম্মিলন ২২৬॥ সিসেম ফাঁক ২২৮॥ চাষার দুক্ষু ২৩০॥ এন্ডি শিল্প ২৩৫॥ রাঙ ও সোনা ২৪২॥ বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি ২৪৪॥ লুকানো রতন ২৫১॥ রানি ভিখারিনী ২৫৪॥ বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ ২৫৭॥ সুবেহ্ সাদেক ২৬১॥ ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম ২৬৩॥ হজের ময়দানে ২৬৮॥ বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল ২৭২॥ নারীর অধিকার ২৭৫॥ কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন ২৭৭॥ নারী-পূজা ২৮১॥ আশা-জ্যোতি ২৮৯॥ মোসলমান কন্যার পুস্তক-সমালোচনা ২৯৩॥ দজ্জাল ২৯৬॥ কাটা মুণ্ড কথা কয় ৩০০॥ উন্নতির পথে ৩০২॥ ৭০০ স্কুলের দেশে ৩০৫॥ গুলিস্তাঁ ২১০॥ কৌতুক-কণা ৩১১॥ God Gives, Man Robs ৩১৩॥ Educational Ideals for the Modern Indian Girl ৩১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিপাসা

মহরম

কাল বলেছিলে প্রিয়! আমারে বিদায়
দিবে, কিন্তু নিলে আজ আপনি বিদায়!
* * *
দুঃখ শুধু এই—ছেড়ে গেলে অভাগায়
ডুবাইয়া চিরতরে চির পিপাসায়!
যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,—
'পিপাসা, পিপাসা' লেখা জ্বলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ 'পিপাসা' বাজায়।

প্রাণটা সত্যই নিদারুণ তৃষানলে জ্বলিতেছে। এ জ্বালার শেষ নাই, বিরাম নাই, এ জ্বালা অনন্ত। এ তাপদগ্ধ প্রাণ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পোড়া চক্ষে কিছুই দেখি না। পুষ্পময়ী শস্যশ্যামলা ধরণীর আনন্দময়ী মূর্তি আমি দেখি না। বিশ্বজগতের মনোরম সৌন্দর্য আমি দেখি না। আমি কী দেখি, শুনিবে? যদি হৃদয়ের ফটোগ্রাফ তোলা যাইত, যদি চিত্রকরের তুলিতে হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার শক্তি থাকিত—তবে দেখাইতে পারিতাম, এ হৃদয় কেমন! কিন্তু সে উপায় নাই।

ঐ যে মহরমের নিশান, তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়, ঢাকঢোল বাজে, লোকে ছুটাছুটি করে, ইহাই কি মহরম? ইহাতে কেবল খেলা, চর্মচক্ষে দেখিবার তামাসা। ইহাকে কে বলে মহরম? মহরম তবে কী? কী জানি, ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। কথাটা ভাবিতেই পারি না—ও-কথা মনে উদয় হইলেই আমি কেমন হইয়া যাই—চক্ষে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরিতে থাকে। সুতরাং বলিতে পারি না—মহরম কী!

আচ্ছা তাহাই হউক, ঐ নিশান তাজিয়া লইয়া খেলাই হউক; কিন্তু ঐ দৃশ্য কি একটা পুরাতন শোকস্মৃতি জাগাইয়া দেয় না? বায়ু-হিল্লোলে নিশানের কাপড় আন্দোলিত হইলে, তাহাতে কি স্পষ্ট লেখা যায় না—'পিসাসা, পিপাসা'? উহাতে কি একটা হৃদয়বিদারক শোকস্মৃতি জাগিয়া ওঠে না? সকল মানুষই মরে বটে—কিন্তু এমন মরণ কাহার হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—স্বপ্নে মাত্র, যেন সেই কারবালায় গিয়াছি। ভীষণ মরুভূমি, তপ্ত বালুকা, চারিদিক ধুধু করিতেছে; সমীরণ 'হায় হায়' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! আমি কেবল শুনিতে পাইলাম—'পিপাসা, পিপাসা'! বালুকা-কণায় অঙ্কিত যেন 'পিপাসা পিপাসা'! চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সব শূন্য, তাহার ভিতর 'পিপাসা' মূর্তিমতী হইয়া ভাসিতেছে!

সে দৃশ্য অতি ভয়ংকর—তথা হইতে দূরে চলিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা আরও ভীষণ, আরও হৃদয়বিদারক! দেখিলাম—মরুভূমি শোণিত-রঞ্জিত।[২] রক্তপ্রবাহ বহিতে পারে নাই—যেমন রক্তপাত হইয়াছে, অমনি পিপাসু মরুভূমি তাহা শুষিয়া লইয়াছে! সেই রুধির-রেখার লেখা—'পিপাসা, পিপাসা।'

নবীন যুবক আলী আকবর (হোসেনের পুত্র) যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পিতার নিকট পিপাসা জানাইতে আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন—'আল-আৎশ! আল-আৎশ!!' (পিপাসা, পিপাসা!) ঐ দেখ, মহাত্মা হোসেন স্বীয় রসনা পুত্রকে চুষিতে দিলেন, যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়! কিন্তু তৃপ্তি হইবে কি—সে রসনা যে শুষ্ক—নিতান্ত শুষ্ক। যেন দিক দিগন্তর হইতে শব্দ আসিল—'পিপাসা পিপাসা'।

মহাত্মা হোসেন শিশুপুত্র আলি আসগরকে কোলে লইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে! তাঁহার কথা কে শুনে! তিনি দীন নয়নে আকাশপানে চাহিলেন—আকাশ মেঘশূন্য নির্মল—নিতান্তই নির্মল! তিনি নিজের কষ্ট—জলপিপাসা অম্লান বদলে সহিতেছেন। পরিজনকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন। সকিনা প্রভৃতি বালিকারা জল চাহে না—তাহারা বুঝে, জল দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আসগর বুঝে না—সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত অজ্ঞান। অনাহারে জলাভাবে মাতার স্তন্য শুকাইয়া গিয়াছে—শিশু পিপাসায় কাতর।

শহরবানু (হোসেনের স্ত্রী) অনেক যন্ত্রণা নীরবে সহিয়াছেন—আজ আসগরের যাতনা তাঁহার অসহ্য। তিনি অনেক বিনয় করিয়া হোসেনের কোলে শিশুকে দিয়া জল প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—'আর কেহ জল চাহে না; কেবল এই শিশুকে একটু জল পান করাইয়া আনো। শত্রু যেন ইহাকে নিজ হাতে জল পান করায়—জলপাত্রটা যেন তোমার হাতে নাই দেয়!!'

মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জল প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, 'আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি, আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোনো দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না।' শত্রুগণ কহিল, 'বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।'

বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্তে তীরবৃষ্টি হইল!!

'পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু,
বজর পড়িয়া গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযুক্ত অতিথি-অভ্যর্থনা বটে! হোসেন শরবিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, 'আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে! আর 'জল জল' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না! আর বলিবে না—'পিপাসা, পিপাসা'! এই শেষ!'

* * *

শহরবানু কী দেখিতেছেন? কোলে পিপাসু শরবিদ্ধ আসগর, সম্মুখে রুধিরাক্ত কলেবর 'শহীদ' (সমরশায়ী) আকবর! অমন চাঁদ কোলে লইয়া ধরণী গরবিনী হইয়াছিল—যে আকবর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুকালে একবিন্দু জল পায় পাই! শোণিতধারায় যেন লেখা আছে 'পিপাসা, পিপাসা'! শহীদের মুদ্রিত নয়ন দুটি নীরবেই বলে যেন 'পিপাসা, পিপাসা'!! দৃশ্য তো এইরূপ মর্মভেদী তাহাতে আবার দর্শক জননী!—আহা!!

যে ফুল ফুটিত প্রাতে—নিশীথেই ছিন্ন হ'ল,
শিশিরের পরিবর্তে রুধিরে আপ্লুত হ'ল!

আরও দেখিলাম—মহাত্মা হোসেন সমরশায়ী। সমরক্ষেত্রে কেবলই পিপাসী শহীদগণ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের শুষ্ক কণ্ঠ যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে 'পিপাসা, পিপাসা'! জয়নব (হোসেনের ভগিনী) মুক্ত কেশে পাগলিনীপ্রায় ভ্রাতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন। ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন—'ভাই! তোমাকে মরুভূমে ফেলিয়া যাইতেছি! আসিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে—যাইতেছি তোমাকে ছাড়িয়া! আসিয়াছিলাম অনেক রত্নে বিভূষিত হইয়া—যাইতেছি শূন্য হৃদয়ে! তবে এখন শেষ বিদায় দাও! একটি কথা কও, তবে যাই। একটিবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—আমাদের দুরবস্থা দেখ, তবে যাই।' জয়নবের দুঃখে সমীরণ হায় হায় বলিল—দূর-দূরান্তরে ঐ হায় হায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল!—

* * *

এখন আর স্বপ্ন নাই—আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। দূরে শৃগালের কর্কশ শব্দে শুনিলাম—'পিপাসা, পিপাসা'! একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? কেবল 'পিপাসা' দেখি কেন? কেন 'পিপাসা' শুনি কেন?

আমার প্রিয়তমের সমাধিস্থানে যাইলাম। বনপথ দিয়া যাইতে শুনিলাম, তরুলতা বলে 'পিপাসা, পিপাসা'! পত্রের মর্মরশব্দে শুনিলাম 'পিপাসা, পিপাসা'! প্রিয়তমের গোর হইতে শব্দ আসিতেছিল —'পিপাসা, পিপাসা'! ইহা অতি অসহ্য! প্রিয়তম মৃত্যুকালে জল পায় নাই—চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। সুতরাং পিপাসী মরিয়াছে।

আহা! এমন ডাক্তারি কে রচনা করিয়াছেন? রোগীর প্রতি (রোগ বিশেষে) জল-নিষেধ ব্যবস্থা কোন্ হৃদয়হীন পাষাণের বিধান? যখন রোগীকে বাঁচাইতে না পার, তখন প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইয়া জল পান করিতে দিও। সে সময় ডাক্তারের উপদেশ শুনিও না। নচেৎ আমারই মতো আজীবন পিপাসায় দগ্ধ হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো রোগী মৃত্যুর পূর্বদিন বলিয়াছিল, 'বাবাজান! তোমারই সোরাহির জল দাও।' রোগী জানে, তাহার পিতার সোরাহির জল অবশ্যই শীতল হইবে। পিতা তাহার আসন্নকাল জানিয়া স্বহস্তে সোরাহি আনিয়া দিলেন। অন্যান্য মিত্ররূপী শত্রুগণ তাহাকে প্রচুর জল সাধ মিটাইয়া পান করিতে দেয় নাই। ঐ রোগীর আত্মা কি আজ পর্যন্ত কারবালার শহীদদের মতো 'পিপাসা, পিপাসা' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না? না; স্বর্গসুখে পিপাসা নাই! পিপাসা—যে বাঁচিয়া থাকে, তাহারই! অনন্ত শান্তি নিদ্রায় যে নিদ্রিত হইয়াছে, পিপাসা তাহার নহে! পিপাসা—যে পোড়া স্মৃতি লইয়া জাগিয়া থাকে, তাহারই!!

কিন্তু কী বলিতে কী বলিতেছি—আমার হৃদয়ানন্দ মৃত্যুর পূর্বদিন গোপনে জননীর নিকট জল চাহিয়াছিল। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে জল দিত না। জননী ভয়ে ভয়ে অল্প জল দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়াছিল—হায়! না জানি সে কেমন পিপাসা!

হৃদয়ানন্দ জানিত, আমি তাহাকে জল দিব না। আমি চিকিৎসকের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত থাকা সময় জল চাহিতে সাহস করে নাই। কী মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা!! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চা'র পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটি দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত জড়াইয়া) ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল!! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা! অনলরচিত পিপাসা!! কিংবা গরলরচিত পিপাসা!!!

সে সময় হয়তো তাহার শরীরে অনুভবশক্তি ছিল না—নচেৎ অত গরম পেয়ালা ও-কোমল হস্তে সহিবে কেন? আট বৎসরের শিশু—ননীর পুতুল, তাহার হাতে গরম পেয়ালা!—আর সেই তপ্ত চা—স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে নিশ্চয় গলায় ফোস্কা হইত! আর ঐ মাখন-গঠিত কচি হাত দুটি জ্বলিয়া গলিয়া যাইত!! সেই চা তাহার শেষ পথ্য—আর কিছু খায় নাই।

আক্ষেপ এই যে, জল কেন দিলাম না। রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না। রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এইজন্যই তো রাত্রিদিন শুনি—'পিপাসা, পিপাসা'! ঐজন্যই তো এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে! চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি—অন্ধকারে জ্যোতির্ময় অক্ষরে লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'!

নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল, কোটি কোটি তারকা ও চন্দ্র হীরকপ্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়াচক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'। আমি নিজের পিপাসা লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বচরাচর পিপাসা দেখায়—পিপাসা শুনায়! বোধহয় নিজের পিপাসার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই মাত্র—আর কেহ পিপাসী নহে। অথবা এ বিশ্বজগৎ সত্যই পিপাসু!

কুসুমকাননে আমি কী দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে—'পিপাসা, পিপাসা'। লতায় পাতায় লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'! কুসুমের মনোমোহিনী মৃদু হাসি আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু—পিপাসা।

বিহগ-কূজনে আমি কী শুনিতে পাই? ঐ 'পিপাসা, পিপাসা'! ঐ একই শব্দ নানা সুরে নানা রাগে শুনি—প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ—কিন্তু কথা একই। চাতক পিপাসায় কাতর হইয়া ডাকে—'ফটিক জল'! কোকিল ডাকিয়া উঠে 'কুহু', ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা ও হৃদয়ের পিপাসা ঝরে! একি, সকলে আমাকে পিপাসার ভাষা শুনায় কেন? আহা! আমি কোথায় যাই? কোথায় যাইলে 'পিপাসা' শুনিব না?

চল হৃদয়, তবে নদীতীরে যাই—সেইখানে হয়তো 'পিপাসা' নাই। কিন্তু ঐ শুন! স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা কুলকুল স্বরে গাহিতেছে। 'পিপাসা, পিপাসা' আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে! একি তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, 'সাগর-পিপাসা'। আহা! তাই তো সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের—যাহার চরণে, জাহ্নবি! তুমি আপনার প্রাণ ঢালিতে যাইতেছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।

একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের তরঙ্গ গণনা করিতেছিলাম। ঊর্মিমালা কী যেন যাতনায়, কী যেন বেদনায় ছটফট করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এ অস্থিরতা, এ আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

তবে ওই সচঞ্চল লহরিমালায়
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায়।
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়,
বল হে জলধি! তব পিপাসা কোথায়?

আবার তাহার গভীর গর্জনে শুনিলাম, 'পিপাসা, পিপাসা'! হায়! এই পোড়া পিপাসার জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম—ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্রে আবার গম্ভীর গর্জন করিল। এবারও তাহার ভাষা বুঝিলাম—স্পষ্ট শুনিলাম— 'পিপাসা, পিপাসা'!!

'পিপাসা, পিপাসা'!—মূর্খ মানব! জানো না এ কিসের পিপাসা? কোথায় শুনিয়াছ সাগরের পিপাসা নাই? এ হৃদয়ের দুর্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল! এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? পিপাসা পিপাসা—এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা! অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! আহা! এই মোটা কথা বুঝ না? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কী লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয়পিপাসা—যতদিন আছি, পিপাসাও থাকিবে! প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা—প্রকৃতির ঈশ্বর-পিপাসা! এইটুকু কি বুঝিতে পার না?***'

তাই বটে, এতদিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি-পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী—ঐকতান সম্বন্ধীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী!!

আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য—কল্পিত নহে। আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য-কল্পনা নহে। ঈশ্বরপ্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেমপিপাসু।

টীকা

১. একদা জয়নাল আবদীন (হোসেনের পুত্র) জনৈক কসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছাগল জবেহ করিতে আসিয়াছ, উহাকে কিছু খাওয়াইয়াছ?' কসাই উত্তর করিল, 'হাঁ, ইহাকে এখনই প্রচুর জলপান করাইয়া আনিলাম।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি ছাগলটাকে প্রচুর জলাপানে তৃপ্ত করিয়া জবেহ করিতে আনিয়াছ, আর শিমর আমার পিতাকে তিন দিন পর্যন্ত জলাভাবে পিপাসায় দগ্ধ করিয়া জবেহ করিয়াছে।'

কারবালার যুদ্ধের সময় জয়নাল রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া শহীদ (সমরশায়ী) হন নাই।

২. ধর্মগুরু মহাত্মা মোহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পর, ক্রমান্বয়ে আবুবকর সিদ্দিক, ওমর খাত্তাব ও ওসমান গণি 'খলিফা' হইলেন। চতুর্থ বারে আলি খলিফা হইবেন, কি মোয়াবিয়া খলিফা হইবেন, এই বিষয়ে মতভেদ হয়। একদল বলিল, 'মোয়াবিয়া হইবেন'; এক দল বলে, আলী মোহাম্মদের (সা.) জামাতা, তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অতঃপর মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ, আলির পুত্র হাসান ও হোসেনের সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। এজিদ মহাত্মা হাসানকে কৌশলে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মা হোসেনকে ডাকিয়া (নিমন্ত্রণ করিয়া) কারবালায় লইয়া গিয়া যুদ্ধে বধ করে।

কেবল যুদ্ধ নহে—এজিদের দল-বল ইউফ্রেতিজ নদী ঘিরিয়া রহিল, হোসেনের পক্ষের কোনো লোককে নদীর জল লইতে দেয় নাই। পানীয় জলের অভাবেই তাঁহারা আধমরা হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের নামে একই দিন হোসেন আত্মীয়স্বজনসহ নিহত হইলেন। এ কথায় মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তিন দিন যুদ্ধ হয়, কেহ বলেন একই দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে সমরশায়ী হইয়াছেন। নদীর জল হইতে হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া এজিদ অশেষ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছে।

অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন যুবক কাসেম (হাসানের পুত্র) মৃত্যুর পূর্বরাত্রে হোসেনের কন্যা সকিনাকে বিবাহ করেন। কারবালা যখন সকিনাকে নববধূ বেশে দেখিল, তাহার কয় ঘণ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেই তাঁহাকে নববিধবা বেশে দেখিয়াছিল! যেদিন বিবাহ, সেইদিনই বৈধব্য। হায় কারবালা! এ দৃশ্য দেখার চেয়ে অন্ধ কেন হও নাই? পুরুষগণ তো যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর ললনাগণ কী করিতেছিলেন?— একজনের জন্য শোক করিতেছিলেন, আর একটির সমরশায়ী হওয়া সংবাদ পাইলেন!—কাসেমের জন্য কাঁদিতেছিলেন, আলি আকবরের মৃতদেহ পাইলেন! শোকোচ্ছ্বাস কাসেমকে ছাড়িয়ে আকবরের দিকে ধাবিত হইল—আকবরের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন, শিশু আসগরকে শরবিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন! এক মাতৃহৃদয়—আকবরকে কোল হইতে নামাইয়া আসগরকে কোলে লইল—কত সহ্য হয়? পুত্রশোকে আকুলা আছেন—কিছুক্ষণ পরে সর্বস্বধন হোসেনের ছিন্ন মস্তক (শত্রু উপহার পাঠাইল) পাইলেন, তাই দেখিতেছেন, ইতোমধ্যে (হোসেনের কন্যা) বালিকা ফাতেমা পিতার মাথা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, শহরবানু তাহার জন্য সান্ত্বনার উপায় খুঁজিতেই ছিলেন—ফাতেমার শ্বাসরোধ হইল! ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর বালিকা কত সহিবে? হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল। শহরবানু এখন সকিনার অশ্রু মুছাইবেন, না ফাতেমাকে কোলে লইবেন?

আহা! এত যে কেহই সহিতে পারিবে না। আমার শোকসন্তপ্তা পুত্রশোকাতুরা ভগিনীগণ তোমরা একবার শহরবানু ও জয়নবের শোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা একজনের শোকেই বিহ্বল হও—দশ দিক অন্ধকার দেখ। আর এ যে শোকসমূহ! আঘাতের উপর আঘাত। তোমরা একসময় একজনের বিরহে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পার, তাঁহাদের সে অবসর ছিল না। এক জয়নব কী করিবেন বল, নিজের পুত্রের জন্য কাঁদিবেন, না প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিকে চাহিবেন, না সব ছাড়িয়া ভ্রাতা হোসেনের ক্ষত ললাটখানি অশ্রুধারায় ধুইবেন? সেখানে অশ্রু ব্যতীত আর জল তো ছিল না!

বীরহৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া—আর কোনো যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোনোমতে পথ পরিষ্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না পান তো করিলেন না!—যে জলের জন্য আসগর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত চুষিয়াছেন—সেই জল তিনি পান করিবেন? না—তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন। বীরের উপযুক্ত কাজ!!

* * *

মহরমের সময় সুন্নি-সম্প্রদায় শিয়া দলে আমোদের জন্য যোগ দেয় না। এ-কথা যে বলে, তাহার ভুল-শোচনীয় ভুল। আলী ও তদীয় বংশধরগণ উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য ও আদরণীয়। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ সময়ে কোন্ প্রাণে সুন্নিগণ আমোদ করিবে? আমোদ করে বালকদল, সহৃদয় সুন্নিদল মহরমকে উৎসব বলে না।

শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভালো মনে করেন না। বুকে করাঘাত করিলে বা শোকবস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হজরত আয়েশা ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবিয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়েশাকে নিন্দা করে। আমরা আয়েশার (আলির সৎশাশুড়ি হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতীত আর) কোনো দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্মগুরু মোহাম্মদ (সা.) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবিয়া কিংবা আলি তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল 'চতুর্থ খলিফা মোয়াবিয়া', কেহ বলিল 'আলি'।

আয়েশা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবিয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়েশার নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লইয়াই দলাদলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীজাতির অবনতি

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনোদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কী? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন?—কারণ আছে।[১]

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকলপ্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষপক্ষ হইতে যতই বেশি সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রীপক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছে, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষাগ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের—প্রকারান্তরে পুরুষের দাসী হইয়াছি। ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধহয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'The five worst maladies that afflict the female mind are indocility, doscontent, slander, jealousy and silliness,...such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and obey her husband', (Japan, the Land of the Rising Sun.)

(ভাবার্থ স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই—[কোনো বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। ...নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন, 'অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার!' আমাদিগকে কেহ 'নাকেস-উল-আকেল' এবং কেহ 'যুক্তিজ্ঞানহীন' (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের 'এ সকল দোষ' আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশের জামাতা খুব আদরণীয়—এমনকি ডাইনিও জামাই ভালোবাসে। তবু 'ঘরজামাইয়ের' সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন।[২] আর আমরা ক্রমশ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তিবিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমতো হইল! ইহাও স্বাভাবিক! 'জোর যার মুলুক তার'। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই-যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল[৩]। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দিগণ পায়ে লৌহনির্মিত বেড়ি পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ বা রৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধহয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার পারিয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ি' পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে 'স্বামী'র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কী হইতে পারে? আবার মজা দেখুন যাঁহার দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যগণ্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখসমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মতো হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কী অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভালো লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদকদ্রব্যে যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্বে স্ফীতা হই!

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোনো কোনো ভগ্নি আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়তো এরূপ কৌশলে ভগ্নিদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দুকথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই-একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ির আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন। বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পরদার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই 'স্বামী' নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখানো বই তো নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে।[৪] এ পোড়া সংসারে কোন্ কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? 'পৃথিবীর গতি আছে' এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo)-কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভালো কথা বা ভালো কাজের বর্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোনো বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন, 'আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব'! কবিবর সার্দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'আয় মরদাঁ বকুশিদ, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ'। অর্থাৎ 'হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীয় পোশাক পরিও না।' আমাদের পোশাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোশাকটা কী—কাপড় তো তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড শাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। 'Ladies's jacket' শুনা যায়, 'Gentlemen's jacket'ও শুনিতে পাই! তবে 'জামা-এ-জানাঁ' বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবত রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে 'বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া' রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলত তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, 'তাহাদের সুখের সামগ্রী আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?' আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু—কবিতা নহে

'কাব্য উপন্যাস নহে—এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে—ইহা প্রকৃত ভবন—'

তাই যা কিছু মুশকিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোনো অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে 'ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহ্বলা' ইত্যাদি হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

'অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।'

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা উই-এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন—

কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ। বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের 'নাকি কান্নার' কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।[৫]

ব্যাঘ্র ভল্লুক তো দূরে থাকুক, আরশোলা, জলৌকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমনকি অনেকে মূর্ছিতা হন। একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়িসুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাশা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি আর সে-কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় শরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে-সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমার নাই।

ভীরুতার চিত্র তো দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় 'অচেতন পদার্থ' হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখনো বেহারের কোনো ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোনো প্রসিদ্ধ জাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পরদার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরিতে পর্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোশ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড়পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুলহিনবেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১. মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।
২. কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩. কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)!
৪. সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫. কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)
৬. চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাসার্ধ চারি ইঞ্চি![৬] পরিহিত পা-জামা বেচারা সলমা চুমকির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারি বধূ ক্লান্ত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কী করিবেন? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ—১. সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া বেশবিন্যাস, ২. বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, ৩. অর্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফশাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুমকি বসানো হইয়াছে, ভ্রূযুগল চুমকি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসানো হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনোরূপ শারীরিক পরিশ্রম না-করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কী মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখি শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোনো পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, 'অভাগীর ইহলোক-পরলোক উভয়ই নষ্ট'। যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, 'তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কী সদ্ব্যবহার করিয়াছ?' তাহার উত্তরে বেগম কী বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বলিলাম, 'তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোনো পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কী জওয়াবদিহি (explanation) দিবে?' সে বলিল, 'আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়'—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলাফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, 'শুধু ঘুরাফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।' দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গররা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, 'উল্টা বুঝলি রাম!' কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে–ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দায় করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্রজনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোকদীপ্তি পাইতে-না-পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'!

আজিকালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এইসকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোনো নেটিভ খ্রিস্টিয়ান হয়তো মনে করিবেন যে, রমণীয় জ্ঞানপিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ! যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।[৭]

যাহা হউক 'শিক্ষার' অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাস করা বিদ্যা'কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি-কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনেবাসন প্রস্তুতকরণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কী উত্তর দিব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, 'যা, আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস!' দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোনোকালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কী হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, 'ভরসা কেবল পতিতপাবন', কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে (God helps those that help themselves)। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলোআনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধহয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি-পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও তো স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।[৮] ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই

'অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনি!'

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি!![৯] (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি তো, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, 'কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে' [but nevertheless it (Earth) does move']!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পারসি নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি একখণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পারসি মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতি সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নামমাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পরদায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ির ভিতর বসিলেও তাহাতে পরদা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আজিকালি পারসি মহিলাগণ পরদা ছাড়িয়াছেন। খোলা গাড়িতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারি) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পরদার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল'!

কই পৃথিবী তো ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে!

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ়সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা[১০] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[১১]

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকি মাসিক ৩ আর চাকরানির খোরাকি ২। অবশ্য কখনো কখনো স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী—সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না-করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো—এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে-সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নিগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

টীকা

১. কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্থলে আমরা ধর্মগ্রন্থের কোনো মতামত লইয়া আলোচনা করিব না—কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

২. ...Although the Japanese wife is considered only the *First servant her husband*, she is usually addressed in the house as the honorable mistress.' 'Acquaintance with European customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women' (Japan.)

ভাবার্থ যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয় গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় এই যে, এখন ইউরোপীয় রীতিনীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশ রমণীয় অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।

'দাসী' শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'স্বামী' শব্দের অর্থ কী? দানকর্তাকে 'দাতা' বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে 'গ্রহীতা' বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে 'স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর' বলিলে অপরকে 'দাসী' না বলিয়া আর কী বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতিপ্রেমপাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই-এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি-মুড়কির শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্বারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর 'স্বামী'কে যে একমুঠা—আধপেটা অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কী চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে 'প্রেম-দাস' না বলিয়া স্বামী বলে কেন? হ্যাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে 'দাসী' বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা-সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন। যাহাকে অর্থ দ্বারা 'ক্রয়' করা হয়, তাহাকে 'ক্রীতদাসী' ভিন্ন আর কী বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাসবিক্রয়ের কথা, কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে 'বর বিক্রয় হয়' এরূপ বলে না। বিশেষত বরের পাসই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোনো গুণ বা 'পাস' থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়। একদা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?' তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, 'পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা-বেচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে করলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে করবে।'

কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোনো দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এইজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্য অবশ্য পালনীয়।

৩. পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শমস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন—'নথ নাকেল-এর (নাকাদড়ির)-ই রূপান্তর।'

৪. অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

৫. সেদিন (গত ৯ এপ্রিলের) একখানা উর্দু কাগজে দেখিলাম তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন যে, 'চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোনো কাজ নাই। আমাদিগকে অন্তত এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটি এবং নগর পুরুষদের মতো বন্দুক-কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন

ক. প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না (যেহেতু 'অবলা'গণ নগর রক্ষা করিবেন।)

খ. সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সেপাহি হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।

গ. তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

ঘ. অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্তত তিন বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, 'আমরা উর্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্নমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।' দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কী উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন-তেমন 'মুসলমানী পুঁথির' পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই—(যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

'জয়গুন নামে বাদশাজাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার' ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ 'লেডিকেরানি' হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজানো ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোনো শ্রমসাধ্য কার্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডিযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কী করিবেন? মূর্ছা যাইবেন না তো?

৬. কোনো কোনো নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়! ওজন এক ছটাক!!

৭. পরন্তু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যিশুখ্রিস্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, Through woman came curse and sin and through woman came blessing and salvation also. ভাবার্থ : নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে। পুরুষ খ্রিস্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যিশুখ্রিস্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

৮. বঙ্গীয় কোনো কোনো সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতা দাবি করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. সমাজের সমঝদার (reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু unreasonable অবলা সরলাগণ (যাঁহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা) শতমুখী ও আঁইস-বঁটির ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

১০. আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে-প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই! যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা! আমরা ইহা বলি না যে, 'কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীব দিয়াছেন কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।' বরং এই বলি, 'কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।'

১১. কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক-প্রজা থাকিতে জমিদার কাঁধে লাঙল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকর ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরানি ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণস্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়-সেখানে শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, কেবল চিরবসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকত লতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে!! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডি-ভাইসরয় হইবার কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্যে উপমা দিব?

আবার ইহাও বলি—লেডি-কেরানি হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডি-কেরানি বা লেডি-ব্যারিস্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে 'স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-বক্তা, স্ত্রী-চিকিৎসক, স্ত্রী-রাজনীতিবিদ্' প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরীহ বাঙালি

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া গঠিত হইয়াছে, আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরেজি ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙালি তাহাতে সাজসজ্জা (Drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন তবে বাঙালি তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙালি পুরুষিকা!![১] অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল—রসালো এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চলনের (Ventilation-এর) কোনো বাধাবিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোটশার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গিগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদনুকরণে ইংরাজ-ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম 'হাওয়ার শাড়ি' পরেন! বাঙালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসি, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই-চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়—বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াস-সাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এইজন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিতলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা-রুপা বা হীরা-জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষত আজিকালি কোন্ জিনিসটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক 'দীর্ঘকেশী' তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে 'হ্রস্বকেশী' তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ 'কৃষ্ণকেশী' তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা 'শুভ্রকেশী' বাহির করি। 'কুন্তলীনের' সঙ্গে 'কেশলীন' বিক্রয় হয়। বাজারে 'মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী' ঔষধ আছে, 'মস্তিষ্ক উষ্ণকারী' দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম 'বর' এবং ক্রেতাকে 'শ্বশুর' বলে। এক-একটি পাসের মূল্য কত জানো? 'অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী'। এম.এ. পাস অমূল্যরত্ন, ইহা যে-সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙালি কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথার্সবস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থবিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ! এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C. পাস করা সহজ! আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি-বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য ইতস্তত ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরামকেদারায় দুর্ভিক্ষ সমাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্ন উৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তাতে আমাদের কী?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা—

১. রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ।

২. শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc ও D.Sc পাস করা সহজ।

৩. অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোনো মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা 'খাঁ বাহাদুর' বা 'রায় বাহাদুর' উপাধিলাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

৪. প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক-দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড়লোকদের মৃত্যুদুঃখে 'শোকসভার' সভ্য হওয়া সহজ।

৫. দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

৬. স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

৭. স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful) হওয়া অপেক্ষা (শুষ্ক গণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, Milk of Rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

৮. কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে আগ্রহী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ, তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে ১. তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর ২. জবেহ কর, তারপর ৩. ফাঁসি দাও!!

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিই? 'ভগ্ন শূর্প', 'জীর্ণ কাঁথা', 'পুরাতন চটিজুতা'—কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা—'অতি শুভ্রনীলাম্বর', 'সাশ্রুসজল নয়ন' ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপপ্রলাপপূর্ণ পদ্যের 'অশ্রুজলের' বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।[২]

টীকা

১. 'নায়িকা' বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ, অনেক বাঙালি পুরুষকে 'বেচারি' বলে। উর্দু ভাষায় পুরুষকে 'বেচারা' ও স্ত্রীলোককে 'বেচারি' বলে। যদি আমরা 'বেচারি' হইতে পারি, তবে 'পদ্মিনী', 'নায়িকা' ও 'পুরুষিকা' হইলে দোষ কী?

২. গত ১৩১০ সালে 'নিরীহ বাঙালি' লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, বর্তমান সালে আর বাঙালি 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্তন হইবে, ইহা কে জানিত? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধাঙ্গী

কোনো রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব। সে-রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধপথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পরদাপ্রিয় ভগ্নিদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে পরদাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে-প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধ বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পরদানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোনো একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমত গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পারসি মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্র ব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পারসি মহিলাদের পরদামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পরদা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার তো কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পারসি পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পরদার বাহিরে আনিয়াছে, ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির তো কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের 'নাকের দড়ি' ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পরদার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কী? ঐরূপ পরদাবিরোধ কখনোই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্বস্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কী?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহ প্রভৃতি 'দেবী'ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পরদানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোনো বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে; পুতুলহারা হলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনীযাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে-ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারানো পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না। কারণ, হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ। বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র 'স্বামিত্বের' ষোলোআনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব-শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই। কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটানো যাইত না;—সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না!

আচ্ছা, দেশকালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি—অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (না হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত তাঁহাদের চাকুরি উপলক্ষে যথাতথা) অনুগামিনী, সুখদুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী ইত্যাদি। কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা 'প্রভু'দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়—ঐ শকটের একচক্র পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরেজি ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী ('partner'), উত্তমার্ধ ('better half') ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে—

'সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতিনীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।'

বোধহয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন, কোনোস্থানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাব স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন—

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বামদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুঁকিয়াছে। দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ। দেখুন!—ভালো করিয়া দেখুন, আপনার মূর্তিটা কেমন! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমতো না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে-শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে-শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না;—সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধিব্যবস্থা আমাদিগকে তাঁহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখদুঃখ একপ্রকার, আমাদের সুখদুঃখ অন্যপ্রকার। এ-স্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতার দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

বর। কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

বর। জগৎ ছানিয়া, কী দিব, আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে সখি, বল করিব কী?
কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়।

বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর 'বোধোদয়' পর্যন্ত!

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতিবেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিণী কই? বোধহয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিণীর না-যাওয়াই ভালো!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে। যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ এ বি এ পাস হয় বটে, কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায় এ-কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।[১]

আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙ্‌নির্ণয়ের কথা (Cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্ দিকে হইবে?' উত্তর পাইলেন, 'আমার পশ্চাৎ দিকে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহলওয়ান' দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুসিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধহয়, তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার-পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, 'মাৎ মারো! চোট্ লাগ্‌তা হায়!' এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্তাকে শাসাইয়া বলে যে, 'কায় মারতা থা? হাম নালিশ করেগা!' তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রিস্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোলোআনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই (Better half) তাঁহার অংশীয় (partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যায় না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপির (bonnet-এর) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক', অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াই জন' হই। আপনারা 'মহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারি পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি এ পর্যন্ত) পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাস (এন্ট্রান্স পাস ও এফ এ ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যে-স্থলে ভ্রাতা 'শমস্-উল-ওলামা'[২], সে-স্থলে ভগিনী 'নজম্-উল-ওলামা' হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য 'নজমন্নেসা' 'শামসন্নেসা' শোভা পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা সাহিত্যগগনে 'নজম্-উল-ওলামা' দেখিতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরিফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মতো আবৃত্তি কর। কোনো পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে 'হাফেজা' করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই 'হাফেজা'। আমাদের আরবি শিক্ষা ঐ পর্যন্ত। পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমে 'করিমা ববখশা এবর হালেমা' এবং একেবারে (উর্দু) 'বানাতন্ নাশ' পড়া।[৩] একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোনো সহজ পাঠ্যপুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যাজীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, 'যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।' কোনো কোনো বালিকা রন্ধন ও সূচিকর্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমতো বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্‌মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ (সা.) আপনাদের হিসাবনিকাশ লয়েন যে, 'তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায়-ব্যবহার করিয়াছ?' তবে আপনারা কী বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার-আনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রী-জাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসীগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (সা.) কন্যাকুলের রক্ষণস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি

'করিমা ববখ্‌শা-এবর হালেমা।' করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু 'সাধনায় সিদ্ধি।' আমরা 'করিমের' অনুগ্রহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ তো নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহমমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এবার রন্ধন ও সূচিকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সূচিকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোনো-না-কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্যপ্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর 'স্বামী', না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর 'স্বামী'? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves); আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে, যেহেতু 'না জাগিলে সব ভারতললনা' এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিংবা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না-পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় 'হাজার হোক ব্যাটা ছেলে' বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই তো ভুল।'[৪] আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানি ছাড়িতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়তো ভয় পাইয়াছেন যে, বোধহয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইনকানুনের পাঁজিপুঁথি লুঠিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান—এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরামপ্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, মন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার—বিশেষত আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন 'স্বামী' স্থলে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দ প্রচলিত হইবে।

টীকা

১. 'দাসী' পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না—

প্রশ্ন When was Cromwell born (ক্রম ওয়েলের জন্ম কখন হয়েছিল)?

উত্তর In the year 1649 when he was fourteen years old (১৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন)।

প্রশ্ন Describe his continental policy (তাঁহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর)।

উত্তর He was honest and truthful and he had nice children (তিনি সাধু প্রকৃতির এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়জন সন্তানসন্ততি ছিল)।

প্রশ্ন What is the adjective of ass (গর্দভের বিশেষণ কী)?

উত্তর Assansole (আসানসোল)।

প্রশ্ন Who was Chandra Gupta (চন্দ্রগুপ্ত কে)?

উত্তর Chandra Gupta was the granddaughter of Asoka (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী)।

"পরীক্ষারহস্য। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, 'roasted some plantations'? আর একজন লিখিয়াছেন 'roasted some plantagenets'; অপর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plaintiffs' কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।"

২. 'শম্‌স্‌-উল-ওলামা', পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলির অনুবাদ এইরূপ হয় শম্‌সল—sun; ওলামা, ('আলম' শব্দের বহুবচন)—learned men. এইরূপ নজম্‌-উল-ওলামা অর্থে the star of the learned men (or women) বুঝিতে হইবে।

৩. এইখানে একটি দশম বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লীগ্রামে অনেকের বাড়ি ধান ভানিবার জন্য 'ভানানী' নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা 'বানাতন্ নাশ' পড়িতে যাইয়া হোসেন আরার মেজাজের বর্ণনাটা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভানানীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিত। তাই সুযোগ পাইলেই যে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই-এক সের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত। সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিষ্কার পাওয়া যাইত না—তাহা 'whole meal' ময়দার ন্যায় ধান্য-তুষ-তণ্ডুল মিশ্রিত একপ্রকার অদ্ভুত সামগ্রী হইত। সে রোগীদের জন্য হোলমিল ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য উক্ত হোলমিল-তণ্ডুলচূর্ণ অবশ্যই উপকারি খাদ্য, সন্দেহ নাই!

৪. এ-স্থলে জনৈক নারীহিতেষী মহাত্মার উর্দু গাথা মনে পড়িল। তিনি (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের কোনো মাসিক পত্রিকায়) লিখিয়াছেন "জগতে তোমাদের নিন্দাগীতি এতদূর উচ্চরাগে পাওয়া গিয়াছে যে, শেষে তোমরাও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে, 'আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি। সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নতমস্তকে প্রস্তুত হইলে।"

কী চমৎকার সত্য কথা! জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুগৃহিণী

ইতিপূর্বে আমি 'স্ত্রী-জাতির অবনতি' প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই।[১] অতঃপর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অংশবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোনো শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। এক চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কানা বলে।

যাহা হউক, আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? বোধহয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন,

'সুগৃহিণী হওয়া'

বেশ কথা। আশা করি, আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে-যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ, আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মতে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরিলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, 'নবাব' 'রাজা' উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোশামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোনো সময়ে দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না—তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই-যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও তো বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী, কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানত এই—

ক. গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।
খ. পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালি সম্পন্ন করা।
গ. রন্ধন ও পরিবেশন।
ঘ. সূচিকর্ম।
ঙ. পরিজনদিগকে যত্ন করা।
চ. সন্তান পালন করা।

এখন দেখা যাউক, ঐ কার্যগুলি এদেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হয়া উচিত। আমরা ধনবান এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা (taste) দেখাইতে হইবে।[২] কোথায় একটি বাগান হইবে, কোন্ স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পছন্দ অনুসারে হওয়া চাই। ভাড়াটে বাড়ি হইলে তাহার কোন্ কামরা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই—যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, কয়জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহ-ব্যাপারই বুঝি না। আমাদের বিসমিল্লায়ই গলদ!

গৃহনির্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন্ জিনিসটা থাকিলে মানায় ভালো, কোথায় কী মানায় না, এসব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলি প্রবাদ আছে, 'সেই ধান সেই চাউল, গিন্নি গুণে আউল ঝাউল' (এলোমেলো)। ভাঁড়ার ঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে। তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশি হইয়া আছে, কোথাও ধানের সহিত মৌরী মিশিয়াছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। চারিদিক বন্ধ থাকে বলিয়া ভাঁড়ার ঘরের দ্বার খোলামাত্র বদ্ধ বায়ুর একপ্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ-দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানের ডিবে কোন্ ছেলে কোথায় রাখে তা ঠিক নাই। কখনো বা খয়ের ও চুনের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারি থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়তো থাকে কাপড়ের বাক্সে। অবশ্য 'সাহেবে সলিকা'গণ এরূপ করেন না। তাঁহাদের পানের সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-pot) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনিতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয়। পিতলের বাটিতে তেঁতুলের আচার থাকে! পূর্বে মুসলমানেরা 'মোকাবা' (পাত্রবিশেষ, যাহাতে চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজিকালি অনেকে toilet table রাখেন। ইহাদের 'মোকাবায়' কিংবা টেবিলের উপর চিরুনি তৈল (toilet সামগ্রী) ছাড়া আরও অনেক জিনিস থাকে, যাহার সহিত কেশবিন্যাস সামগ্রীর (toilet এর) কোনো সম্পর্ক নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক-একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্তি করিবেন। স্বামী বেচারা একসময় চাকরির আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুনুঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকা! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ না।

স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশি, তাই একজন কাউনটেসের (Countess) উক্তি উদ্ধৃত করা গেল

> 'The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income'
>
> (ভাবার্থ বাড়িঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে, তাঁহার গৃহস্থালির যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা-যে স্বামীকে ভালোবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, কিন্তু বুদ্ধি না-থাকাবশত প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধনশিক্ষা করা উচিত, এ-কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে-খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই 'কালাই'[৩] রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোরমা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কী হইতে পারে? এ সম্বন্ধেও সেই কাউনটেসের (Countess) উক্তি শুনুন

> 'Bad food, ill-cooked food, monotonous food, insufficient food, injure the physique and ruin the temper. No lady should turn to the more tempting occupations or amusements of the day till she has gone into every detail of the family commissariat and assured herself that it is as good as her purse, her cook, and the season can make it.'
>
> (ভাবার্থ কোনো মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দোবস্ত এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগ না করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে কি না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ষড়ঋতুর পরিবর্তনের সহিত আহার্য বস্তুরও পরিবর্তন করা আবশ্যক। ভোজ্য-দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হইলে কিংবা সর্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্বল এবং নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারি ও রসায়ন (Chemistry) বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কী গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন্ ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এ-সব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা? অযোগ্য ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান পালনের ভার দেয় না, তদ্রূপ অযোগ্য রাঁধুনীর হাতে খাদ্যদ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দিকে কাদা হইলে সেই স্থান হইতে সতত দূষিত বাষ্প উঠিতে থাকে; বাড়ির লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাষ্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না; যে-স্থানে আহার করা হয়, সে জায়গায় বায়ু (Atmosphere) পর্যন্ত যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, গৃহিণী সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসবজি খাইতে ভালোবাসেন। বাজারের তরকারি অপেক্ষা গৃহজাত তরকারি অবশ্য ভালো হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুষ্মাণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুতপ্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুমড়ার কি সমধিক উন্নতি হইবে না? অন্তত কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ, কোথায় শশা ভালো ফলিবে, কোথায় লঙ্কা ভালো হইবে, গৃহিণীর এ-জ্ঞানটুকু তো থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না-থাকায় উহারা বাড়ির মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়িখানাকে পশুশালা বা পশুপক্ষীদের 'ময়লার ঘর' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্‌ণ না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোংরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওলাদার হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্‌ন পশুপক্ষীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধনশিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপতত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of Heat) শিখিতে হয়!!

অন্নের পরই বস্ত্র—না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। শীতগ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্তব্য। পূর্বে তাঁহারা চরকা কাটিয়া সুতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কলকারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ নিজ taste (পছন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে হয়। এ জন্যও সুশিক্ষা লাভ আবশ্যক। আপনারা হয়তো মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। এতকাল হইতে নিরক্ষর দরজিরা ভালোই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাইয়ের সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কী? সেলাইয়ের সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষত ইংরেজি) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine-এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন (machine) দ্বারা ভালো সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখাপড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের সেলাই-এর সহিত মেশিন-এর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন তো কোনটি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়। এতদ্ব্যতীত ক্যানভাস (canvas)-এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য ইংরেজি (Knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থা পুস্তক পাঠে শিক্ষয়িত্রীর বিনাসাহায্যে সূচিকর্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁটকাট সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাটছাটের জন্যও তো বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবাযত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করা রমণীজীবনের ধর্ম, এ-কার্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন তো দূরের কথা, তাঁহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদলকলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ির নিন্দা ননদিনীর নিকটে, আবার ননদের কুৎসা যার-তার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য। যথারীতি শুশ্রূষাপ্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধপথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়। অনেক স্থানে নিরক্ষর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধানতাবশত বিষাক্ত ঔষধ যেখানে-সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অত্যধিক স্নেহবশত তিন-চারিবারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এদেশে বিরল নহে। ডাক্তারি বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এ-কথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারি না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারি জানো বা না-জানো, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না যে, 'এত যত্ন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল; আমার নিজের পরমায়ু দিয়াও যদি মাকে বাঁচাইতে পারিতাম।' এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া অনাহার দিনযাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে আধমরা হয় না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনো পীড়িত শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনীযাপন করেন নাই? যিনি কখনো এরূপ রোগীর সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল 'হায়! হায়!' করিয়া কাঁদিতে জানি! বোধহয় আশা থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদেব সদয় হইবে! অনেক সময় দেখা যায়, রোগী এদিকে পিপাসায় ছটফট করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু-যে দুধ না-খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশি মন্দ হইল।

এ-স্থলে একটি পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, 'এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।' গৃহিণী অনিদ্রায় নিশিযাপন করিলেন, একটু তৈলমর্দন করিলেন না। কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রি জাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ, রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সারিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা 'জেনানা মেডিকেল কলেজ' চাই, তবে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তান পালন।—ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, 'মাতা হইবার পূর্বে সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।' যে বেচারিকে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেকস্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়। বিশেষ কোনো কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবত দেখা যায়, আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবত মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতিফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কী চমৎকার ভাষায় বলিতেছেন :

'—দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণাগাথা বিক্রম কাহিনী,
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী।'

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীরজননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়; ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে-অক্লেশে সহ্য করে। কোনো মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কুলি 'নৌতুন জুতা দিয়া মারল—দাম ভী লইল না' বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেক 'ভদ্রলোকের' অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব, সন্তানপালনের নিমিত্ত বিদ্যাবুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬/১৭ ঘণ্টা সময় কাটানো কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া নির্দোষ আমোদে কাটাইলে ভালো হয় না কি? সেজন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ। অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধেও এ-ক্ষেত্রে দুই-চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এককালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, আরবীয় কোনো ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে, বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ি ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেন না!

আর আমরা শুধু নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয় হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি-না, সেই কথাই পূর্বে মনে উদয় হয়! কেহ দুঃসময়ে কোনো জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগে জিনিসটি বেশ সুলভে পাওয়া যাইবে! ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা একজনে হয়তো ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহার ভালো চাকরানিটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরানিকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সেই স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ি নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না-বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উড়িষ্যা—এ-সবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোনো কারখানায় কাজ করেন, সেই কারখানার কর্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোনো অভাবের বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্যপ্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘট স্থলে কার্যগ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসি বা খ্রিস্টিয়ান অথবা বাঙালি, মাদ্রাজি, মাড়ওয়ারি বা পাঞ্জাবি নহি— আমরা ভারতবাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবনসদৃশ ও পরিজনতুল্য হইবে। এমন ভারতমহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিত মূল্যে ক্রয় করিলে তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে; বিস্তারিত বলাবাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালক-বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারি দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কী-যেন-কী মনে করে। বেতনভোগী হইলেও ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান-অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে এ-কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দু 'বানাতন্ নাশ' গ্রন্থে বর্ণিত নবাব-নন্দিনী হোসেন-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার দৌরাত্ম্যে দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি-ত্রাহি করিত![৪] যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্টশান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture-এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নির্ভয়, ন্যায়পরতা, মাশুকের[৫] নিমিত্ত আত্মবিসর্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নির্বোধ বন্ধু হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, কারণ, 'কে বে-ইলমে না তওযাঁ খোদারা শেনাখ্ত'—অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না। অন্যত্র প্রবাদ আছে, 'মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান।' অতএব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যেসব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালির জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মতো যেমন-তেমনভাবে গৃহস্থালি করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না এবং ঐসব ডোমচামারের পুত্রগণ-যে কালে 'বিদ্যাসাগর', 'বিদ্যাভূষণ' বা 'তর্কালঙ্কার' হইবে এরূপ আশাও বোধহয় কেহ করেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের কর্তব্য। যদি সুগৃহিণী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

টীকা

১. কেহ আবার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সগর্বে বলিয়াছেন, 'ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক।' বেশ! বলি, হিন্দু আরাধ্য দেবতা কোন্ জিনিসটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ ইহার কোন্ পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গো-জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের 'উপাসক মানুষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?

২. উর্দু ভাষায় 'সলিকা' manner, taste, নিপুণতা যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সলিকা শব্দের ন্যায় মেয়েলি ভাষায় 'কাজের ছিরি' কথা চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সলিকার সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। তাই সুবিধার নিমিত্ত এ শব্দটাকে বাঙলায় প্রবেশ করাইতে চাই। 'আরজি' 'তহবিল' 'মাহসুল' (মাশুল) ইত্যাদি শব্দ বহুকাল হইতে বাঙলার প্রচলিত আছে। 'সলিকা'ও চলুক। 'সাহেবে সলিকা' অর্থে যাহার সলিকা আছে (person of taste) বুঝায়।

৩. 'কালাই' শব্দের বাঙালা কী হইবে? ইংরেজিতে Tinning বলে।

৪. হোসেন-আরার বালসুলভ ঔদ্ধত্যের বর্ণনা বেশ আমোদপ্রদ। পাঠিকাদিগকে একটু নমুনা উপহার দিই হোসেন-আরা পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাভগিনী-কাহাকেই ভয় করিত না। সমস্ত বাড়ি সে মাথায় তুলিয়া রাখিত! একদিন তাহার বড়মাসি শাহজামানী বেগম তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকার দল হয়তো ভাবিল, ছোট বেগমের (হোসেন-আরার মাতার) নিকট অভিযোগে বিশেষ কোনো ফল হয় না; বড় বেগম নবাগতা, তাঁহাকে দেখিয়া হোসেন-আরার চপলতা কিঞ্চিৎ দমিয়া যাইবে। শাহজামানী বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ক্রমান্বয়ে দুই-চারি অভিযোগ উপস্থিত হইল।

নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসেন-আরা) এমন পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।'

সোসন আসিয়া বলিল, 'দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহ্বা, যেই আমি জিহ্বা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, আমার সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল।'

গোলাপ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'হায়, আমার কান রক্তাক্ত করিয়া দিলেন।'

রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'এই দেখুন, ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মুঠা ভরিয়া ছাই দিতেছে!'

ঐসব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, 'হোসনা! এখানে আইস।' হোসনা তৎক্ষণাৎ আসিল তো; কিন্তু আসিয়া মাসিকে নমস্কার করিবে তো দূরের কথা,—হাতে ছাই, পায় কাদা—এই অবস্থায় যে হঠাৎ মাসির গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, 'হোসনা! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসনা তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এই সম্বেল পেত্নী বুঝি কোনো কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?' এই বলিয়াই সে মাসির ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। 'আঁ! ও কী কর! কী কর!' বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরে হোসেন-আরা জেনানা মক্‌তবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন, অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভালো হয়।

৫. মাশুক—যাহাকে ভালোবাসা যায়; beloved object.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরকা

আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের 'জঘন্য অবরোধ-প্রথা'ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নিদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কী? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

আমাদের তো বিশ্বাস যে, অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ.এ.বি.এ পরীক্ষার জন্য পরদা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University Hall-এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে! কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এইরূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাস-করা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। কেননা, পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্য গাড়ি পালকি প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের 'অস্বাভাবিক' সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি।

পৃথিবীর অসভ্য জাতিরা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বে অসভ্য ব্রিটনেরা অর্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বে গায় রং মাখিত! ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোশাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (civilized) ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নিগণ মুখ ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে-মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখণ্ড বস্ত্রাবরণ (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন। যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরেজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।

পরদা অর্থে আমরা বুঝি গোপন হওয়া বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালোমতো শরীর আবৃত না-করাকেই 'বে-পরদা' বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ভালোমতো পোশাক পরিয়া মাঠে-বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পরদা বেশি রক্ষা পায়।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নিগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পরদা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নিরা বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পরদা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়দের মতো শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy), না আছে আমাদের মতো বোরকা!

কেহ বলিয়াছেন যে, 'সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব সাজা যে কী হাস্যকর ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন'—ইত্যাদি। তাহা ঠিক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোনো ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

ইংরেজি আদব-কায়দাও (etiquette) আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর-রহিত (simple) পোশাক ব্যবহার করিবেন—বিশেষত পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে![১]

নিমন্ত্রণ ইত্যাদি রক্ষা করিতে যাইলে মহিলাগণ সচরাচর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাড়ি হইতে নামিবার সময়ে ঐ পরিচ্ছদ রূপ আভরণ কোচম্যান দ্বারবান প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য একটা সাদাসিধা (simple) বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিংবা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয় ভগ্নিগণও বলিয়া থাকেন, 'আপনি কেন পরদা ছাড়েন না (why don't you break off purdah)?' কী জ্বালা! মানুষে নাকি পরদা ছাড়িতে পারে? ইহাদের মতে পরদা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, তাঁহারা নিজেও পরদার (অর্থাৎ privacy-র) হাত এড়াইতে পারেন না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ঐরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোশাকেও সম্পূর্ণ পরদা রক্ষা হয় না, বিশেষত সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) তা নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি শাড়ি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা–। অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কী উন্নতি হয়, তাহা আমরা তো বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও তো শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোনো-না-কোনো রূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি 'জঘন্য' বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (Civilization)-ই জগতে পরদা বৃদ্ধি করিতেছে। যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (Civilizad) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্যলোকে খাদ্যসামগ্রীর তিন-চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (Tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা 'খানপোশ' বা 'সরপোশ' ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশি সভ্য তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি।

আজিকালি যে সকল ভগ্নি নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিতা (Enlightened) ভগ্নিগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization-এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পরদা করিতে বাধ্য থাকেন। কখনও কোনো প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবমবর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়ত তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পরদাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই-চারিমাস কেবল 'জড় পুত্তলিকা' সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন। ঐরূপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে সেই জানে! কথিত আছে, কোনো সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নববধূর পৃষ্ঠে ঘটনাক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি যে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস 'চৌথী'র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠে ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজিকালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধহয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা হউক, ঐ সকল কৃত্রিম পরদা কম (modertate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব,—তাঁহারা যে-কোনো ধর্মাবলম্বিনী (ইহুদি, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা-ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই-যে 'গয়ের মজহব' বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পরদা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম তো ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কী?

আমরা অন্যায় পরদা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পরদা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোনো অসুবিধা হয় না। তবে সেজন্য সামান্যরকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন্ কাজটা হয়?

সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এদেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধ থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রমিত হইতেছে। পঞ্চমবর্ষীয় বালক যখন দেখে যে, তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে, পতঙ্গ বাস্তবিকই ভয়ানক কোনো বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে, কীটপতঙ্গ দেখিয়া মূর্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরেজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। 'গালিভারের ভ্রমণ' নামক পুস্তকে (Gulliver's Travels-এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভার 'ব্রবডিঙ্গন্যাগ' (Brobdingnag)-দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রবডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল! ইংরেজ-ললনা যেমন কীটপতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার গালিভারকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল! কারণ, দীর্ঘকায়া ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি, পরদা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই, যাহাতে মস্তিষ্ক মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক-জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতিপূর্বেও বলিয়াছি যে, 'নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।' এখনও তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই—তাহারা যে-টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ-মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখলাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার—

'চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।'

আমি আরো দুই-চারি পঙক্তি বাড়াইয়া বলি

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন—
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা 'জেনানা স্কুলের' আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নিগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কী বলিব—আমার ভগ্নিদিগকে বোধহয় একপ্রকার গৃহসামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়! তাই টেবিলটা যেমন ফুল-পাতা দিয়া সাজানো হয়; জানালার পরদাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্যকিছু দ্বারা সাজানো হয়, সেইরূপ গৃহিণী আপন পুত্রবধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজানো আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন! সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে 'সোনা-রুপা রাখিবার স্তম্ভ (Stand) বিশেষ' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধরম কাহিনী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা হউক, পরদা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজ হইলে যথাবিধি পরদা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। প্রয়োজনীয় পরদা কম করিয়া কোনো মুসলমানই বোধহয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।[২]

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা ভগ্নিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।

টীকা

১. ঐ উপদেশে আমরা কোরআন শরীফের অষ্টাদশ 'পারার' 'সূরা নূরের' একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা—'বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নিচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্তত না-দেখে) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না-দেখায়।'

২. এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraser-এর 'The purdah of ignorance' শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষে দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিয়াছেন Let the efforts of educationists be first directed to the instruction of our girls within the purdah, and let woman begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts of shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction, of emancipation of women.' (গত ৮ মার্চের 'Telegraph' সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।)

আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতন বুঝায়—যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র-বৃষ্টি-হিম হইতে রক্ষা করে। পশুপক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব-স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরেজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন

'Home, sweet home;
There is no place like home,
Sweet sweet home,'

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবত সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়—বাড়ি আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহ রচনা স্বাভাবিক; বিহগ-বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত প্রস্তুত হয়! ঐ নিলয় ও গর্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত 'গৃহ' নয়। সে যাহা হউক—পশুদের 'গৃহ' আছে কি না, এস্থলে তাহা আলোচ্য নয়।

এখন আমাদের গৃহ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত-নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগারতুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (Member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পরদা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিতেন, সে-পর্যন্ত দলে দলে কামানের গোলায় ধ্বংস হইতেন! সে কোন উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের—কোরআনের মহিমা এবং ইসলাম-প্রেম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমিন)।

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে : গয়গম্বরের 'নবুয়তে' সর্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী—তিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে পয়গম্বরের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জ্বলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোনো বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোনো সভা-সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে-সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমনকি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি-নিকটবর্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম 'পয়গম্বরি' এবং সত্য বলিতে কি এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মহিসের (যিশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই।[৫]

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের একগুঁয়ে গোঁড়ামির জন্য তাঁহার ধর্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া নিজের পক্ষে মানহানিকর বোধ করিতেন; নতুবা তাঁহার কার্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, 'হে পিতৃব্যপ্রাণ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্তব্য পালন করিতে থাকো; আমার জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কটাক্ষপাত করে?' একদিন আবু তালেব স্বীয় পুত্র হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর ধর্মবিশ্বাস কী? আর তুই মহম্মদ (সা.) সম্বন্ধে কী মনে করিস? হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, 'পিতৃদেব! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহকেই পূজনীয় মনে করি এবং মোহাম্মদকে আল্লাহতায়ালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এইজন্য পয়গম্বরের সংস্রব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না।'

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইবারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা তো হইল না! বরং তিনি বলিলেন, 'পিতৃপ্রাণ-পুত্তলি! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব

দুর্নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।'

নবুয়তের (পয়গম্বরি প্রাপ্তির) তিন বৎসর পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য করিতেছিলেন। সে-সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহতায়ালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা-বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধীদলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যতপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তন্মুহূর্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, 'তুই মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহকে অস্বীকার কর!' কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন।

একদা কোনো দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'এ সময় তুই যদি নিজের পুত্র-পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছটফট করিত তবেই বেশ ভালো হইত!' কিন্তু সেই সত্যধর্মপ্রাণ মুসলমান মৃত্যু পর্যন্ত এই একই উত্তর দিতেছিলেন, 'আমার গৃহ, পুত্র কলত্র—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমুদয় হজরত রাসূলের পদতলে উৎসর্গ হউক! আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণ-কমলে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।'[৬]

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে, তাঁহারা শেষে রাসূলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্তী যখন শত্রু-তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য খ্রিস্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'রাজন! আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দান্ত পশু-প্রকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নরপিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; কিংবা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুল্লুক তার' ব্যতীত অন্য বিধি-নিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহতায়ালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন—যাঁহার সত্যতা সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ এক, সর্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে, বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি, পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি, নিয়মমতো দৈনিক উপাসনা ও উপবাস (রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি। রাজন! আমরা এই ধর্মে বিশ্বাস রাখি এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।'

ভদ্র মহোদয়গণ! পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতা ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণস্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হে খোদার রাসূল! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্যপথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।' পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্যমনস্ক থাকাবশত তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমার কথা শুন, ধর্মপথ দেখাও!' তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুণ্নচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে 'অহি' (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার মর্ম এই : রাসূলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রাসূল) অবজ্ঞা করিল ও তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কী করিয়া জানো যে, সে পাপমুক্ত হইবে না, উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং সে উপদেশে সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধনী, তাহার সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে অবিশ্বাসী (ঈমানদার) না হইত, তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এরূপ না হয়)।'

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি যখনই তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু ইহারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষে আল্লাহ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে অত্যন্ত আদরযত্ন করিতেন এবং দুইবার তাঁহাকে মদিনায় কোনো উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, গয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতেন।

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আরবীয় পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানীল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম-সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে, পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্তব্য তেমনই নির্ভীকচিত্তে পালন করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণবিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা শুন্, অমূল্য প্রাণ এমন অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্তপিপাসু খঞ্জরসমূহ তোরই জন্য শাণিত হইতেছে! তুই নিবৃত্ত হ, তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।'

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন

'পিতৃব্যদেব! আমি নিরুপায়। আমি তো কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্বারা করাইতেছে। যদি বিধর্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলেন, 'তুমি আপন কার্য পরিত্যাগ কর' তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য হইতে বিরত হইব না—যে পর্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমিই আমার এই সাধনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেন তা বলুন, আমি এই মুহূর্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই—আমার আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকিবেন।' এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রুনয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'প্রাণাধিক! আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না, তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। তুই নির্ভয়ে আপন কাজ কর।'

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ! আরবীয় পয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক দিন তাঁহার সহিত থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আর এই বৎসরই তাঁহার পতিপ্রাণা বণিতা খাদিজা বিবিও প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে অতি কঠোর শোক ও বিপদাকীর্ণ পরীক্ষার সময় ছিল! রাসূলের শত্রুপক্ষ এই সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। (আহা! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দিক—মাত্র এই দুইজন ব্যতীত, তাহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব তো আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিন্ত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের অরাতিকুল যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি! এ তো মোহাম্মদ (সা.) নহেন। এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন! উনারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দিকসহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন, 'হে হজরত! আমরা তো মাত্র দুইজন!' তিনি উত্তর করিলেন, 'না, না। আমরা তিন জন—ইহাদের একজন অতিশয় প্রতাপশালী—সমুদয় বিশ্বজগৎ একদিকে, আর তিনি একা একদিকে।' আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, 'হজরত! সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কী বুঝাইতে চাহেন?' উত্তর হইল, 'সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে আছেন।' এ কথায় আবুবকর নিশ্চিন্ত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদিনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষাকল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধাদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন

'জগৎ-পিতা! তুমি সমস্তই দেখিতেছ এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।'

অবশেষে এই প্রথম রক্ত-প্রবাহিনী যুদ্ধ—যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। ওদিকে তো সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্যত ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোনো অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত—যাহা তিনি অনন্যোপায় হইয়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের মুসলিম-বিদ্বেষীগণ মহাসমারোহে যুদ্ধায়োজন লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা—শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু সর্বদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায় বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমনকি তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন রাখিতে বাধ্য হইলেন—যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয় এবং অপরাধীকে শাস্তিদান করিতেও হইত। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্বের অর্থাৎ যে সময়কে মুসলমানদের মূর্খতার যুগ বলা হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্যাতন করা হইত যে, তাহার তুলনা নিতান্ত অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের সময়ে যুদ্ধে ধৃত বান্দীদিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার আদর্শ অদ্যাপি কোনো অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। একদা রণযাত্রা-কালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একদল বন্দি ছিল। খাদ্যসামগ্রীতে (রসদে) আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল; তচ্ছ্রবনে রাসূলুল্লাহ আদেশ দিলেন যে, বন্দিদিগকে রুটি দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জুর ভক্ষণ করুক। (কী মহত্ত্ব!)

আর একবারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইল, তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে দিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহেব তাহা অবগত হইয়া সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ! তোমরা জানো, পূর্বে তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ তোমাদের বিপন্মুক্ত করিয়াছেন; তোমরা একে অপরের রক্তপিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন; তোমরা কুফরের (অধর্মের) অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্মল জ্যোতিতে তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহ পুরস্কার কি তোমরা প্রাপ্ত হও নাই?' তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, আমাদের অবস্থা বাস্তবিক এইরূপই ছিল এবং এখন যে সুখ-সম্পদ ভোগ করিতেছি, আল্লাহতায়ালারই অনুগ্রহে এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।' তিনি উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'না, না, বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইরূপ বলিতে তো আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তুমি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি; তুমি দুঃখ-চিন্তা-ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমায় সান্ত্বনা দিয়াছি' (এ কথায় তাঁহারা কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহেব বলিলেন, 'হে প্রিয় সহচরবৃন্দ! লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপক্ষে দাঁড়াইলেও মোহাম্মদ আপন সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে—শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ—যাঁহারা মরিতে ও মারিতে নির্ভীক, শৌর্য-বীর্যে সিংহতুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ। আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।'

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার তো তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে; যাহা কোটি কোটি লোকের অন্তরে ঈশ্বরপ্রেম অঙ্কিত করিয়াছে। আপনারা আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাব ও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন তো! তিনি অনুবর্তীগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিংবা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদেরই মতো মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌঁছাই।' পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমান ও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে জীর্ণ বস্ত্রে চীরসংলগ্ন করিতেন—ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন! তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছিলেন, 'আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নাই।' (হাদিস শরিফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ছিল সেই সম্রাটের যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্যার জন্য সহস্রাধিক দাসদাসী রাখিতে পারিতেন!

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনে'র জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নামাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন (নামাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণকণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের জন্য যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণ শোধের নিমিত্ত আমার ঘর-দ্বার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।'

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রাসূলুল্লাহ তন্মুহূর্তে শোধ করিলেন।[৭] এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন। অতঃপর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃন্ময় দেহত্যাগ করিলেন, যাহাতে অতি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। এই জীবন অতি উচ্চ, পবিত্র, বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়গম্বরের যোগ্য ছিল (অবশ্য, সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যেসব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে, অথবা শুধু কুসংস্কারবশত রাসূলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্বসুদ্ধ ৯ জন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোনোপ্রকার 'মকারাদি' কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায়বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কী ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন্ শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রাসূলের প্রয়োজন ছিল।–কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে রাসূলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোনো উপায় ছিল না।

আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি আর একটি দোষারোপ এই করা যায় যে, তিনি রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতেন এবং কারণে-অকারণে কাফের হত্যা করিতে আদেশ দিতেন। এখন এ সম্বন্ধে আপনারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যখন আইনের দুই দফা প্রায় একই প্রকার হয় অর্থাৎ একটি কোনো শর্তের অধীন এবং অপরটি শর্তবিহীন, তখন শর্তহীন ধারাও সর্বদাই শর্তাধীন ধারা বলিয়া মানিতে হয়। মুসলমানদের শাস্ত্রকারগণ সর্বদা এ বিষয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং কোরআনের বচনসমূহেও এ-কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা একস্থলে বলা হইয়াছে, 'কাফেরকে হত্যা', এবং অপর স্থলে বলা হইয়াছে, 'হত্যা কর, যদি তাহারা তোমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেয়।' এখন আমি আপনাদিগকে সেই মূল বচনসমূহের—যাহা রাসূলের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, শাব্দিক অনুবাদ শুনাইতেছি। আমি নিজের ভাষায় বলিব না, কারণ যদি আপনারা মনে করেন যে, আমি তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্ম প্রচার করিতেছি। তবে শ্রবণ করুন 'যদি তাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করা যাউক। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত যেরূপ শাস্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিবে। এজন্য উহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত উহারা পৌত্তলিকতা রক্ষার নিমিত্ত তোমাদের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত না হয় এবং অদ্বিতীয় খোদার ধর্মকে অমান্য করে যুদ্ধ করিতে থাকে। আর যদি তাহারা মানে তবে, নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি তাহারা সত্যধর্মের বিরোধী হয়, তবে আল্লাহ তোমাদের সহায় হইবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং সাহায্যকর্তা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটি বিষয়, যাহা পয়গম্বরকে উপদেশ দানের নিমিত্ত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি

'মনুষ্যদিগকে নম্র মৃদুভাষায় যুক্তিসহকারে উপদেশ দিয়া আল্লাহতায়ালার ধর্মপথে আহ্বান কর; তাহাদের সহিত অতিশয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সহিত সদয়ভাবে তর্ক কর, কেননা উহাদের কে সত্যপথ ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং কে সত্যপথে আছে—তাহা আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন। যদি তুমি প্রতিশোধ লও, তবে লক্ষ্য রাখিও যে, তাহা তোমার প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হইয়াছে (ন্যায়বিচার অনুসারে) তাহার সমান হয়; আর যদি তুমি প্রতিশোধ না লইয়া সহ্য কর, তবে সাবের (সহিষ্ণু) ব্যক্তির পক্ষে আরও ভালো কথা। সুতরাং ভালো হয়, যদি শত্রুদের প্রপীড়ন ধীরতার সহিত সহ্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার কার্যকলাপ তবেই সফল হইবে, যখন তাহার সহিত আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকিবে। কাফেরদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, এবং উহাদের চাতুরী শঠতায়ও ব্যতিব্যস্ত হইও না, কারণ আল্লাহ তাহাদেরকেই সাহায্য করেন যাহারা সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তাঁহাকে ভয় করে।'

আর একটি উপদেশ শ্রবণ করুন,—'ধর্ম কর্ম ব্যাপারে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না, যদি সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তবে বুঝিও আল্লাহ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর যদি ধর্ম স্বীকার না করে, তবে আর কী করা—তোমার কাজ তো কেবল উপদেশ দান ও প্রচার করাই ছিল।'

আরও শ্রবণ করুন,—পয়গম্বর সাহেব কাফেরের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 'কাফের তাহারাই যাহারা ন্যায়বিচারের বিপরীত কার্য করে; পাপী কেবল তাহারাই যাহারা ইসলাম ধর্মের বাহিরে।' ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ধর্মের বৃত্তি তত সঙ্কীর্ণ নহে যে, কেবল পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

আর একস্থলে (প্রত্যাদেশে) আসিয়াছে যে, 'যদি তাহারা তোমাদের বিরোধী হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের সহিত যুদ্ধ-কলহ না করে আর তোমাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে, তবে তাহাদিগকে হত্যা করা কিংবা তাহাদের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা ঈশ্বরাদেশের বিরুদ্ধ।'

উপস্থিত মহোদয়গণ, আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ইহা ন্যায়বিচারের কথা হইবে, আমরা পয়গম্বর সাহেবের তাদৃশ মিলনপ্রয়াসী শান্তিসূচক বচনসমূহের প্রতি—যাহা সেরূপ যুদ্ধ-কলহ এবং অত্যাচারের যুগে বলা হইয়াছিল, একটু মনোযোগ না করি, আর কেবল ঐ সকল বচন যাহা তিনি কোনো এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবার সময় উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে ধরিয়া লই? আর আমার মতে যে-কোনো সেনাপতি এরূপ স্থলে থাকিতেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিক যোগ্যতার কাজ আর কী করিতেন?

বেশ, এখন আপনারা সেই শান্তিপ্রিয়তা শিক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত, যাহা পয়গম্বর সাহেবের স্বকীয় ব্যবহারে দেখা যায়, একটু সমালোচনা করিয়া দেখুন তো অত্যাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কোনো ছিল না, যাহা পয়গম্বরের প্রতি করা হয় নাই—আর তিনি তাহা ক্ষমা না করিয়াছেন; কোনো নির্যাতন এমন হয় নাই, যাহা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না ছিলেন। হে ভ্রাতৃগণ! কোনো ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখুন, যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা পরিয়া দেখিবেন না।

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু-না-কিছু দোষ জন্মিয়াই থাকে; সমস্ত সাধু-প্রকৃতির লোকের কার্যকলাপে কোনো-না-কোনো দোষ থাকেই, বিধর্মী এবং মূর্খ শিষ্য একে আর বুঝিয়া থাকে। কোনো ধর্ম দেখিতে হইলে সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে দেখা উচিত, তাহা না করিয়া কোনো নরাধমকে দেখিয়া তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করা অন্যায়। তবেই আমরা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় ভালোবাসিতে শিখিব এবং বন্য অসভ্যদের মতো একে অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না।

আমার দুঃখ হইতেছে যে, সময়াভাবে আমি ইসলামের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। যদিও সে বিষয়টিও আপনাদের ভালো লাগিত কিন্তু তাহা তত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া আমি এস্থলে সে বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রত্যেক ধর্মেই বাহ্যিক অবস্থার পরে দর্শন থাকে। যদি এ-সময় ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহার স্বল্পতা দেখিতেছি, (তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই) কারণ, আমরা যখন সেই সময়ে—যখন ইসলামের জ্যোতি আরম্ভ হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত করি তাহার গুণ ব্যাখ্যার উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ পাই না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তেরোশত (১৩০০) বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কী বলিয়াছেন :—'বিদ্যা শিক্ষা কর; যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্র হয়; যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের স্তব করে; যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা (ইবাদত) করে; যে উহা শিক্ষা দেয় সেও উপাসনা করে; বিদ্যাই মানবকে ভালো ও মন্দ (সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ) জ্ঞান শিক্ষা দান করে; শিক্ষাই সুপথ প্রদর্শন করে; শিক্ষাই নির্জনে নির্বাসনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে; বনবাসে সান্ত্বনা প্রদান করে; বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতি-মার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বন্ধুসভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ; শত্রুসম্মুখে অস্ত্রস্বরূপ।[৮] বিদ্যার দ্বারা আল্লাহতায়ালার বিপন্ন দাস পুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয়।'

পয়গম্বর সাহেবের নিম্নোক্ত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি ভক্তিপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তিনি বলিয়াছেন, 'বিদ্বানের (লিখিবার) মসি শহীদ (ধর্মার্থে সমরশায়ী)-দের রক্তাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।' ভ্রাতৃগণ! বিদ্যার গৌরব বর্ণনা এতদপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে? হজরত আলী যিনি পয়গম্বর সাহেবের প্রিয় জামাতা ছিলেন, আর যাঁহার সম্বন্ধে পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে, 'আলী ইসলামে বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।' মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে এলমে-এলাহি প্রচার আরম্ভ করেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হজরত আলীর যে-সকল বক্তৃতা আছে তাহা পাঠের উপযুক্ত। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধর্ম-বক্তৃতা (খুতবা) পাঠ করিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে হজরত আলীর রচনাবলি হইতে কয়েকটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি

'অন্তর আলোকিত করিবার জন্য সুশিক্ষা উজ্জ্বল রত্ন; সত্য তাহার (বিদ্যার) লক্ষ্য, ঈশ্বরতত্ত্ব (এলহাম) তাহার পথপ্রদর্শক; বুদ্ধি (সুবোধ?) তাহাকে গ্রহণ করে; মানবের ভাষায় বিদ্যার যথোচিত প্রশংসা হইতে পারে না।'

ওদিকে মুসলমানেরা দেশ-সংক্রান্ত কর্তব্যসাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হজরত আলীর শিষ্যবর্গ শিক্ষাবিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তেও শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।[৯]

ইংল্যান্ডের লোকদিগকে মুসলমানেরাই তাহাদের বিস্মৃত বিদ্যার বর্ণমালার পুস্তকাবলি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়াছেন; রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাবলি রচনা করিয়াছেন।

জনৈক পোপ (দ্বিতীয় মিসলউটিয়র) যিনি খ্রিস্টীয় ধর্মের অতি উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও গুরু ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরই কর্ডোভা মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে লোকে তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে 'শয়তানের বাচ্চা' বলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, সে-সময় ইউরোপের খ্রিস্টীয় বিভাগ কেমন ঘোর মূর্খতায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর কেবল ইসলামের অনুবর্তীগণই তাঁহাদিগকে (ইউরোপীয়দিগকে) জ্ঞানের আলোকরশ্মি দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানেরা শিল্প এবং আবিষ্কারেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাঁহারাই নির্মাণ করেন; পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ তাঁহারাই স্থির করেন। গ্রিকদের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যা লাভ করেন; সঙ্গীত ও কৃষিবিদ্যাকে তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং ধর্মের দর্শনতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া 'ফানাফিল্লাহ'র গূঢ়তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং সমুদয় মানবজাতি একজাতীয় (মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই) আর এই বিধান তাহারা অতি মনোরম ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি ঐ শাস্ত্রবিধানমূহের বিষয় চিন্তা করেন, তো আপনারা উহাকে প্রকৃত (আসল) বেদান্তস্বরূপ পাইবেন; মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ছয়শত বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্য যদি আমার মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্বপুরুষদের রচিত শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকাবলি আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন, তবে আমর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা ইসলাম দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। আর ইসলামের আবালবৃদ্ধবণিতা (কচি কচি শিশুগণ)ও ইসলামী দর্শন কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে (যেমন হিন্দুগণ এখন আপন বেদান্ত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন)। আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা ইসলামের প্রকৃত গৌরব সৃষ্টিজগতকে দেখাইবার জন্য কিরূপে ধর্মের সেবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ, হজরত ঈসা, মূসা, মহর্ষি বুদ্ধদেব—সকল একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য, তাঁহাদের শিশুসন্তান—আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় শিষ্যের নিকটবর্তী হন না, যে পর্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়।

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! পয়গম্বর সাহেব আপনাদের সেইরূপ আমাদেরও আপন। যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবি (হক) আছে। আমরা তাঁহাদিগকে ভালোবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি এবং তাঁহাদের সম্মুখে অতি নম্রভাবে ভক্তিসহকারে মস্তক অবনত করি।

খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকলেরই আল্লাহ;—তিনি আমাদিগকে এইরূপ বুঝিবার শক্তি দান করুন যে তাঁহার নামের জন্য যেন আমরা পরস্পরে ঝগড়া না করি—আমাদের শিশুসুলভ দুর্বল অধরে যে নামই উচ্চারিত হউক না কেন—কিন্তু তিনিই তো অদ্বিতীয় এবং সকলেরই উদ্দেশ্য (উপাস্য) একমাত্র তিনিই।[১০]

টীকা

১. আশ্চর্যের বিষয় এই সভ্যযুগেও বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘরে ঐরূপ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী বিবাদ দেখা যায়। এইজন্য আমরা কলিকাতা হাইকোর্টে 'Hereditary enemy' শব্দ শুনিতে পাই। আহা! কবে আমাদের প্রতি খোদাতায়ালার রহমত হইবে।

২. হজরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যে স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাহকে প্রস্তরমূর্তির নিকট বলিদান করিতে গিয়াছিলেন, এ-কথার সত্যতায় আমার একটু দ্বিধাবোধ হয়। আলেম ফাজেলগণ দয়া করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঙালা 'আমির হামজা' পুঁথিতে দেখিয়াছি—(হজরত আবদুল মুত্তালিবের অন্য পুত্র হজরত আমির হামজা পিতাকে বলিলেন)—

'কাফেরে খাজনা দিবে মোসলমান হৈয়া।
আমি এয়ছা বেটা তবে কিসের লাগিয়া॥'

(এ ঘটনাটা সত্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. ইহা মিসেস বেশান্তের অতিশয়োক্তি।— (আল-এসলাম সম্পাদক)

৪. মিসেস এ্যানি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই? ছি! ছি! ধিক আমাদের! আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি ও কলসি একেবারে নাই কি?

৫. অল্পদিন হইল—মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইংরেজি ভাষায় ইসলাম-সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্বে ইউরোপে এসলাম সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যই খ্রিস্টান মিশনের এজেন্সি হইতে সংগ্রহ করা হইত—কাজেই অজ্ঞ ইউরোপ এসলামের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত।

এই অল্পদিনের চেষ্টায় কিরূপ ফল হইয়াছে, এই বক্তৃতা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। লর্ড হেডলি, খাজা কামালুদ্দিন, মি. এহয়া-উন-নাসর পর্কিনসন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কিরূপ মত পরিবর্তন হইতেছে, 'Islamic Review' পত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।

—(আল-এসলাম,—সম্পাদক)

৬. মিসেস বেশান্ত এখানে দুইটি ঘটনা ভ্রমক্রমে এক বর্ণনার ভিতর ফেলিয়াছেন। অমুসলমানের পক্ষে এইরূপ ভ্রম মার্জনীয়।—(আল-এসলাম,—সম্পাদক।)

৭. মিসেস এ্যানি বেশান্ত এস্থলে 'আক্কাসের তাজিয়ানার' বিষয় উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় এজন্য 'প্রতিশোধ' বিষয়টি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে তাজিয়ানার কথা এই

কোনো একদিন হজরত কোনো কারণে আক্কাস নামে এক ব্যক্তিকে এক ঘা কোড়া মারিয়াছিলেন। অদ্য সেই আক্কাস মসজিদে আসিয়া সেই কোড়ার প্রতিশোধ পাইবার দাবি করিল, তখন রাসূল তাহার হস্তে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সহচরবৃন্দ ও আত্মীয় বান্ধবগণ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, যেহেতু হজরত এমন পীড়িত অবস্থায় কোড়ার আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুনয়-বিনয় করিয়া আক্কাসকে নিবৃত্ত হইতে, অথবা রাসূলের পরিবর্তে তাঁহাদের গাত্রে একাধিক কোড়া মারিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আক্কাস তাঁহাদের কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা অতিশয় অধীর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন—নিষ্ঠুর আক্কাস করে কী! হায়, হায়, রাসূল হত্যা করিবে। হজরত কিন্তু অবিচলিত চিত্তে আক্কাসকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশোধ লইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল, 'হজরত! আমি নগ্নপৃষ্ঠে আপনার কোড়ার আঘাত পাইয়াছিলাম।' এতচ্ছ্রবনে রাসূলে করিম তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নগ্নদেহে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন!!

বলি, আজ পর্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রাসূলকে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত (ফেরেশতা) পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন! এরূপ মাহাত্ম্য আর কোনো মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

আক্কাস অবশ্য রাসূলকে কোড়া মারিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হজরতের পবিত্র পৃষ্ঠ চুম্বন করা। সে উদ্দেশ্য সফল হইল—ক্রন্দনের রোলের মধ্যে ভক্তির জয়জয়কার ঘোষিত হইল।—লেখিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. সুশিক্ষার কল্যাণে শত্রু জয় করা যায় এ-কথা ধ্রুব সত্য। ঐ কারণেই বোধহয় নারীবিদ্বেষী মহাশয়গণ স্ত্রীশিক্ষায় আপত্তি করেন। যেহেতু তাহা হইলে স্ত্রীলোকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়। শুনিয়াছি করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুমা খানম সাহেবা নাকি বলিয়াছিলেন, 'এখন মরদের হাতে কলম; একবার জানানার হাতে কলম দিয়া দেখ।' ইংরেজি প্রবচন বলে 'Pen is mighter than sword'.—লেখিকা

৯. আমাদের সদাশয় ব্রিটিশপ্রভুরা দাবি করেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন বলিয়াই আমরা (বর্বরেরা) শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমরাও নত-মস্তকে স্বীকার করিয়া বলি যে,—'ইয়ে হয় আহলে মগরেবকে বরকৎ কদমকি' (ইহা পশ্চিম দেশবাসীদিগের শ্রীচরণের প্রসাদ)। কিন্তু মিসেস বেশান্ত তো বলেন যে, শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে মুসলমানেরাই ইউরোপের শিক্ষাগুরু।

১০. এই সকল বিষয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। মিসেস এ্যানি বেশান্ত মহোদয়া থিওসোফির একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষাগুরু। তিনি নিজের শিক্ষা ও ধর্মের দিক দিয়া ইসলামের সমালোচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সব কথার সহিত আমাদের মতের মিল থাকিতে পারে না। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এখনও বহুস্থলে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা যদি যথাযথভাবে ঐ স্বরূপটি জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ও সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়ই তাহার নিকট আত্মদান করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত ধর্মপ্রচারক যাহারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, মুসলমান মাত্রেরই মান্য ও নমস্য। তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস না করিলে কেহ মুসলমানই হইতে পারে না। আর আমাদের ধর্মশাস্ত্রে যে সকল পয়গম্বরের নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা বাদে আরও অনেক পয়গম্বর আছে যাঁহাদের নাম হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে জ্ঞাত করা হয় নাই। অধিকন্তু প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়াছেন ও স্বর্গের বাণী শুনাইয়াছেন, এই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি কোরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা মিসেস মহোদয়ার মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছি।

(আল-এসলাম সম্পাদক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌরজগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারসিয়ঙ্গ পর্বতের দ্বিতল গৃহে অপরাহ্ণে গওহর আলী স্ত্রী ও কন্যাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়াছেন। তাঁহার নয়টি কন্যা যে-যেভাবে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই এ পরিবারটিকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে হয়। সর্বকনিষ্ঠা দুহিতা মাসুমা তাহার সর্বজ্যেষ্ঠা সহোদরা কওসরের ক্রোড়ে এবং অবশিষ্ট শিশুগুলি পিতামাতার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট পাদপীঠে বসিয়াছে।

এইরূপে ভাগ্যবান গওহর আলী তারকাবেষ্টিত সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

কওসর পিতামহের অতি আদরের পৌত্রী। তিনি সাধ করিয়া ইহার নাম 'কওসর' রাখিয়াছেন। কওসর শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জলাশয়, যেমন মন্দাকিনী।[১]

যে কক্ষে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন, সেটি কতক মুসলমানি ও কতক ইংরেজি ধরনে সজ্জিত; নবাবি ও বিলাতি ধরনের সংমিশ্রণে ঘরখানি মানাইয়াছে বেশ। ত্রিপদীর (টিপায়ের) উপর একটি ট্রেতে কিছু জলখাবার এবং চা-দুগ্ধ ইত্যাদি যেন কাহার অপেক্ষায় রাখা হইয়াছে।

গওহর আলীর হস্তে একখানি পুস্তক; তিনি তাহা পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য-বিষয় ছিল বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব, বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রোতৃবর্গ বেশ মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতেছে; কেবল সপ্তমা দুহিতা সুরেয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পিতার ধৈর্যগুণ পরীক্ষা করিতেছে। কখনও ছবি দেখিবার জন্য পিতার হস্ত হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইতেছে। পিতা কিন্তু ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।

গৃহিণী নূরজাহাঁ একবার ঐ ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'ভাই এখনও আসিলেন না; চা তো ঠাণ্ডা হইতে চলিল।'

গওহর। তোমার ভাই হয়তো পথে লেপচাদরের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকা রাবেয়া বলিল, 'আমরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বেঞ্চের নিকট অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এইটুকু পথ তিনি এখনও আসিতে পারিলেন না?'

সুরেয়া। বাব্বা! বেন্ কি অল্প পথ? আমি তো হাঁটিতে না পারিয়া আয়ার কোলে চড়িয়া আসিলাম।

রাবেয়া! ঈশ! আমি একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ হইতে এখানে আসিতে পারি।

গওহরও কন্যাদের কথোপকথনে যোগ দিয়া বলিলেন, 'আগে একদৌড়ে আসিতে পারিয়া দেখাও, পরে বড়াই করিও। কোনো কাজ করিতে পারার পূর্বে 'পারি' বলা উচিত নহে!'

কওসর। এখান হইতে দ্বিতীয় বেঞ্চ প্রায় দুই মাইল হইবে, না আব্বা?

গও। কিছু বেশি হইবে। যাহা হউক, রাবু যখন বলিয়াছে, তখন তাহাকে অন্তত একবার একদৌড়ে সে পর্যন্ত যাইতেই হইবে!

আখতর! রাবু একদৌড়ে যাইবে, না পথে বিশ্রাম করিবে, তাহা জানিবার উপায় কী?

গও। (বিস্ফারিত নেত্রে) জানিবার উপায়? রাবু যতদূর পর্যন্ত গিয়া ক্লান্তি বোধ করিবে, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। সে নিজেই বলিবে, সে কতদূর গিয়াছিল। আমার কন্যা কি মিথ্যা বলিবে?

রাবু। (সোৎসাহে) না আব্বা! আমি মিথ্যা বলি না—বলিবও না।

আখ্। আমি বেশ জানি, তুমি মিথ্যা বল না; তবে যদি মিথ্যা বাহাদুরির লোভে একটি ছোট মিথ্যা বলিয়া ফেলিতে!

রাবু। (সগর্বে) মিথ্যা বলার পূর্বে মরিয়া যাওয়া ভালো!

গও। ঠিক! তোমরা কেহ একটি মিথ্যা বলিলে আমার মর্মে বড়ই ব্যথা লাগিবে। আশা করি, তোমরা কেহ আমাকে কখনো এরূপ কষ্ট দিবে না।

কতিপয় বালিকা সমস্বরে বলিয়া উঠিল :—'আমরা মিথ্যা না, —আমরা কষ্ট না', অথবা কী বলিল ঠিক শুনা গেল না!

এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কওসর ও মাসুমা ব্যতীত অপর বালিকা কয়টি 'মাম্মা আসিলেন' বলিয়া পলায়ন তৎপরা হইল। গওহর নয়িমাকে ধরিয়া বলিলেন, 'সেজন্য পলাইস কেন মা?'

নয়িমা। ও বাব্বা! আমি না—মাম্মা! (অর্থাৎ আমি থাকিব না—মাম্মা বকিবেন)।

ইতোমধ্যে জাফর আলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। পলায়মানা বালিকাদের দেখিয়া তিনি গওহরকে সহাস্যে বলিলেন, 'Solar system (সৌরজগৎ)টা ভাঙিয়া গেল কেন?'[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। তুমি 'ধূমকেতু' আসিলে যে!

নূরজাহাঁ ভ্রাতার নিমিত্ত চা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়া গওহরকে বলিলেন, 'তুমি একটু সর, ভাইকে অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিতে দাও।'

জাফর। না, আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিব না। যে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার সর্বাঙ্গ ঘর্মসিক্ত হইয়াছে। আমি এইখানেই বসি।

কওসর জলখাবারের ট্রেটা আনিয়া জাফরের সম্মুখে রাখিল, এবং তাঁহার ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে মুছিয়া দিল।

জাফর এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া ভগিনীর হস্তে পেয়ালা দিয়া বলিলেন, 'নূরু! আর এক পেয়ালা চা দে!'

গও। তোমার ভুল হইল। পেয়ালাটি লইবার জন্য তাঁহাকে এতদূর আসিতে হইল, ইহা অন্যায়! তুমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে পেয়ালা দিতে পারিতে।

নূরজাহাঁ অধোমুখে মৃদুহাস্য করিলেন। কওসরের খুব জোরে হাসি পাইল বলিয়া সে প্রস্থান করিল, এবং মাতার সাহায্যের নিমিত্ত বদরকে তথায় পাঠাইয়া দিল।

জাফ। দেখ ভাই! তোমার সাহেবিটা আমার সহ্য হয় না। তুমিই কি একমাত্র বিলাত-ফেরতা?

গও। না, তুমিও বিলাত-ফেরতা! তোমার গালি শুনিয়া আমোদ হয়, সেইজন্য সাহেবিভূতের দোহাই দিই! সে যাহা হউক, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? পথে পাহাড়িদের সহিত গল্প করিতেছিলে না কি?

জাফ। ভুটিয়াদের সহিত গল্প করিব কী, উহাদের ভাষাই বুঝি না; যে ছাই 'কানছু যানছু' বলে!

বদর তাহার পাহাড়ি ভাষার অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলিল, 'যানছু মানে যাওয়া'। নূরজাহাঁ তাহাকে বলিলেন, ইহাদের গল্পে যোগ দিয়া তোমার কাজ নাই মা! যাও তুমি কওসরের নিকট।'

গও। তবে কেন বিলম্ব হইল?

জাফ। প্রথম বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম তথা হইতে সমস্ত কারসিয়ঙ্গ শহরটা তো বেশ দেখা যায়। বাজার স্টেশন, কিছুই বাদ পড়ে না।

নূরজাহাঁ। হ্যাঁ ঐখানে বসিলে ধরাখানা সরাতুল্য বোধ হয়।

গও। আর যেদিন ইঁহারা পদব্রজে 'চিমনি সাইড'[৩] পর্যন্ত আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেদিনই ইহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল—সম্ভবত পোর্ট আর্থার এবং বালটিক ফ্লিট জয় করিয়াও জাপানিদের তত উল্লাস হয় নাই!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর। জাপানিরা তত উল্লসিত হইবে কিরূপে? তাহাদের কার্য এখনও যে শেষ হয় নাই। আর আমরা তো পদব্রজে ১২ মাইল ভ্রমণের পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম!

জাফ। এখন বাকি আছে শ্রীমতীদের বেলুন আরোহণ করা!

গও। সময়ে তাহাও বাকি থাকিবে না!

জাফ। তুমি সপরিবারে ইংল্যান্ড যাইবে কবে?

গও। যখন সুবিধা হইবে!

জাফ। হুঁ—কন্যাগুলি অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি? তোমার দুহিতা-কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য! উহাদের নামও তো এক-একটি তারকার নাম—মুশতরী, জোহরা, সুরেয়া![৪] তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন?

নূর। ভাই! তোমরা নিজেরা ঝগড়া করিতে বসিয়া মেয়েদের নাম লইয়া বিদ্রূপ কর কেন? আর এ নামও তো আমরা রাখি নাই, স্বয়ং কর্তা রাখিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রীদের নাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা রাখিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার অধিকার কী?

জাফরকে আরও অধিক খেপাইবার জন্য গওহর বলিলেন, 'কেবল ইংল্যান্ড কেন, আমেরিকা যাইবারও ইচ্ছা আছে,—কওসর 'নায়েগারা ফলস্' দেখিতে চাহে।'

জাফ। তোমার এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে। কওসরকে আর 'নায়েগারা' প্রপাত দেখাইতে হইবে না।

গও। কেন?

জাফ। আগামী বৎসর সে তোমার ক্ষমতার বাহির হইবে।

গও। আমার হাতের বাহির হইলেই বা কি, জামাতাসহ যাইব।

জাফ। জামাতা তোমারই মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ হইলে তো?

গও। তুমি তাঁহাকে অধিক জানো, না আমি?

জাফ। আমি সিদ্দিককে যতদূর জানি, তাহাতে আশা রাখি তিনি তোমার মতো Forward (অগ্রগামী) নহেন।

গও। আমিও আশা রাখি তোমার মতো backward (পশ্চাদগামী) নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কওসরকে নায়েগারা প্রপাত দেখাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'মাম্মা আব্বার সহিত তর্জন-গর্জন করিতেছেন, চল আমরা শুনি গিয়া' এই বলিয়া বদর আখতরকে টানিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখতর। আমরা সেখানে গেলে মাম্মা গর্জন ছাড়িয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিবেন।

বদর । আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইব না—পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া শুনিব।

কওসর। ছি বদু! লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান।

বদর। (ব্যগ্রভাবে) তবে আমি যে দুই-একটি কথা শুনিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় কী?

কও। যাহা হইবার হইয়াছে। আর কখনো এরূপ দোষ করিও না।

আখ। মাসুমা তো ঘুমাইয়াছে। যাও নয়িমু! তুমিও ঘুমাও গিয়া।

নয়িমা। না, আমি ধুম্‌না।—[৫]

আখ। তবে আমি আর তোমায় কোলে রাখিব না!

কও। চল এখন আমরা পড়াশুনা করি গিয়া। যাও তো বোন মুশতরী, তুমি দেখিয়া আইস, আমাদের পড়িবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডে কয়লা, আগুন—সব ঠিক আছে কি না।

জোহরা। আমরা ডাউহিল স্কুলে পড়িতে গেলে খুব ছুটি পাইব, না?

আখ। আরে! আগে যা তো ডাউহিল স্কুলে, তারপর ছুটি লইস!

বদর। আগে পাগলা ঝোরার[৬] জলে ভালো করিয়া মুখখানা ধো!

রাবু। কেন আপা। আমাদের স্কুলে যাওয়া হইবে না কেন? তোমরাই তিনজনে যাইবে না—তোমরা বড় হইয়াছ। আমরা কেন যাইব না?

কও। ওরে, মাম্মা যাইতে দিলে হয়!

রাবু। মাম্মাটা ভালো লোক নহেন,—তাঁহার চক্ষু দেখিলে আমার যে ভয় হয়। এখন তিনি আসিয়াছেন, কেবল আমাদের স্কুলে যাওয়ায় বাধা দিতে!

সুরেয়া। আমি তো স্কুলে যাইবই—

জোহ। হাঁ, তুই একাই যাইবি—তুই বড় সোহাগের মেয়ে কি না!

বদ। রাবু। তোরা পাগলা ঝোরার সুশীতল নির্মল জলে বেশ ভালো করিয়া মুখ ধুইস! আমরা তিনজন টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইব।

রাবু। তোমাদের মাম্মা বাধা দিবেন না?

কও। বাধা দিয়াছিলেন; এখন রাজি হইয়াছেন।

জোহ। আপা! সেখানে কেবল 'নান' আছে, 'নানা' নাই?

বদ। না, সে স্কুলে 'নানা' নাই—কেবল একদল 'নানি' আছেন! এখানে 'নানা' অর্থে নান শব্দের পুংলিঙ্গ বুঝিতে হইবে। দুষ্টু বালিকারা সেন্ট হেলেনস টেকনিক্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলের নানদিগকে 'নানি' বলে। তা তাহাদের সাত খুন মাফ! এই স্কুলে বালিকাদিগকে রন্ধন, সূচিকর্ম ও নানাপ্রকার বুনন গাঁথন (যাবতীয় ফ্যানসি ওয়ার্ক) শিক্ষা দেওয়া হয়।

জোহরা সাদরে আখতরের হাত ধরিয়া বলিল, 'আপা। তুমি আমার পুতুলের জন্য খুব সুন্দর শাল তৈয়ার করিয়া দিও।'

সুরেয়া কওসরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, 'আর তুমি অনেক মিঠাই তৈয়ার করিও।'

রাবু। হ্যাঁ, তাহা হইলে তুমি খুব মিঠাই খাও! (সকলের হাস্য)।

মুশতরী আসিয়া জানাইল পাঠগৃহে সব প্রস্তুত। অতঃপর সকলে সেই কক্ষে গেল।

কওসর শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে সকলকে সম্বোধনকরত বলিল, 'আব্বা যে সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে বায়ুর বিষয় বলিলেন, তাঁহার কোন্ কথা তোমরা কে বুঝিতে পার নাই? যে না-বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বুঝাইয়া বলি।'

মুশ। আব্বা হাওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রধনুর বিষয় তো কিছু বলেন নাই। আমি কালি তাঁহাকে ইন্দ্রধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জোহ। আমি আব্বাকে বলিব, আমায় একটা ইন্দ্রধনু আনিয়া দিতে।

সুরে। আমিও ইন্দ্রধনু লইব।

বয়োজ্যেষ্ঠারা হাসিল। মুশতরী বলিল, 'ওরে, ইন্দ্রধনু কি ধরা যায়?'

রাবু। ইন্দ্রধনু ধরা যায় না সত্য—কিন্তু যে উপায়ে বায়ু ধরিয়া কাচের নলে বন্ধ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়, সেইরূপে ইন্দ্রধনুকে ধরাও অসম্ভব নহে।

কও। এ অকাট্য যুক্তি। (সকলের হাস্য)

রাবু। কেন, মন্দটা কী বলিলাম?

আখ। না রাবু! কিছু মন্দ বল নাই। টেলিফোন, গ্রামোফোন, ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়, তবে ইন্দ্রধনু ধরা আর শক্তটা কি?

আবার হাসির গররা উঠিল।

কও। চুপ। চুপ। মাম্মা শুনিলে বলিবেন—'এইরূপে বুঝি পড়া হইতেছে?'

মুশ! (কষ্টে হাস্য সংবরণ) আব্বা তো আমরা হাসিলে কিছু বলেন না?

রাবু। না, বরং তিনিও হাসেন।

বদ। তোরা আর এক কথা শুনিয়াছিস? জাহেদ ভাই ও হুরন বুবুকে মাম্মা প্রহার করিয়া থাকেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোহ। সত্য নাকি? বাবা! তবে আর আমি মাম্মার বাড়ি যাইব না। যখন নিজের ছেলেমেয়েকে মারেন, তখন আমাদের তো আরও মারিবেন।

সুরে। আব্বা তো আমাদের কখনো মারেন না।

রাবু। আমাদের আব্বা ভালো, মাও ভালো, কেবল মাম্মাটি ভালো নহেন!

বদ। দাঁড়া। আমি মাম্মাকে বলিয়া দিব!

আখ। রাবু তাঁহার মুখের উপর বলিতে ভয় করে?

কওসর। ব্যস! এখন চুপ কর!

বদ। বায়ুর বিষয় ভালোরূপ বুঝিলাম কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না, বড় আপা?

কও। আমি কাল দিনের বেলায় মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব। তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন করিয়া ভালো করিয়া বুঝিয়া লও।

রাবু। আমি কাল পটাসিয়াম জলে ফেলিয়া তামাশা দেখিব।

মুশ। পটাসিয়াম জলে ফেলিলে কী তামাশা হইবে?

বদ। কেন তোমার মনে নাই?—উহা জলে ফেলিবামাত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিবে!

মুশ। হাঁ, মনে পড়িল। আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরম জল লইয়া।

নয়িমা। (নিদ্রাবেশে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে) আল আমি? আমি তি থেলিব?

আখ। (সহাস্যে) তোমার এখন 'থেলিয়া' কাজ নাই! চল, তোমায় শয্যায় রাখিয়া আসি।

রাবু। মুশতরী! তোমার আগুন অপেক্ষা আমার আগুনের রঙ বেশি সুন্দর হইবে।

মুশ। কেন? সোডিয়াম গরম জলে ফেলিলে বেশি সুন্দর হলদে রঙের আগুন বাহির হইবে।

কও। তোমরা ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই জানো না? রাবুই বড় দুষ্ট—ওই ঝগড়া আরম্ভ করে।

রাবু। ক্ষমা কর, বড়আপা! এখন কাজের কথা বলি। আমরা যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার তুষার দেখি, উহাও কি পূর্ব অবস্থায় বায়ু ছিল?

কও। হাঁ; এবং এখন আবার উপযুক্ত উত্তাপে বাষ্পীভূত হইতে পারে।

রাবু। তবে সূর্যোত্তাপে গলিয়া যায় না কেন?

কও। গলে বইকি! ঐ বরফ অল্প উত্তাপে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীর মতো বহিয়া যায়; তাহাকে ইংরেজি 'গ্লেসিয়ার' বলে। আব্বা উহার নাম দিয়াছেন 'নীহারনদী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবু। বাহ্! বরফের নদী তো বড় সুন্দর দেখাইবে। চল আমরা একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট নীহারনদী দেখিয়া আসি।

বদ। বটে? কাঞ্চনজঙ্ঘা বুঝি খুব নিকটে?

রাবু। নিকট না হউক, আমরা কি পথ চলিতে ভয় করি? একদিন চিমনি সাইডে উঠিয়াছিলাম—তাহা কি অল্প পথ ছিল? পাঁচ-ছয় মাইল আরোহণ ও অবতরণ কি সামান্য ব্যাপার? আবার সেদিন ডাউহিল ও ঈগেলস ক্রেগের সন্ধিস্থলে নামিয়াছিলাম।

বদ। ডাউহিলের সন্ধিস্থলে অবতরণ করিয়া কেমন ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মনে নাই?

কও। রাবু তো বলিয়াছিল, আমি আর হাঁটতে পারি না; আমাকে ফেলিয়া যাও! আমায় ভল্লুকে খায় খাইবে।

রাবু। ডান্ডিটা[৭] সময়ে না পাওয়া গেলে আসিতেই পারিতাম না।

কও। আব্বাই ডান্ডির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, অর্ধপথে বদু ও রাবুর বীরত্ব প্রকাশ পাইবে।

বদ। আমি তো ভাই রাবুর মতো অহঙ্কার করি না যে, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত পদব্রজে যাইতে পারিব, একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ অতিক্রম করিব। হাঁ, ভালো কথা! আমি যে সেই ঈগেলস ক্রেগের সন্ধিস্থলের বিজন অরণ্য হইতে ফুল আনিয়াছিলাম, তাহা কোথায় রাখিয়াছি? মনে তো পড়ে না।

কও। ফুলগুলি বনে ফিরিয়া গিয়া থাকিবে।

বদ। তবে তুমি তুলিয়া রাখিয়াছ। আর ভাবনা নাই।

কও। তোমার ফুল কিরূপ ছিল? আমার সংগৃহীত কুসুমরাজি হইতে তাহা বাছিয়া লইতে পার?

বদ। বেশ পারি—সে ফুল বকুলফুলের মতো; গন্ধ ও আকৃতি বকুলের, কেবল বর্ণ পীত।

রাবু। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর ক্রেগের ওড়নার মতো পাতলা মেঘের গাঢ়-গোলাপি বেগুনি চাদর দেখিতে পাই, তাহা কোথা হইতে আইসে?

কও। সূর্যের উত্তাপে ঐ জমাট তুষার হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই মেঘের ওড়নারূপে কাঞ্চনের চূড়া বেষ্টন করিয়া থাকে।

আখ। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাঞ্চনের ওড়নাগুলি বানারস হইতে আইসে।

সুরেয়া ধীরে ধীরে কওসরের নিকট আসিয়া বলিল, 'বড়আপা! আমাকে ইন্দ্রধনু দিবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কও। (সুরেয়ার মুখ চুম্বন করিয়া) আমি কাল তোমায় ইন্দ্রধনু দিব।

বদ। সে কি! তুমি ইন্দ্রধনু ধরিবে কেমন করিয়া?

কও। ঝাড়ের কলমে (ত্রিকোণ কাচখণ্ডে) ইন্দ্রধনু দেখা যায় তা জানিস না?

বদ। তবে তো ইন্দ্রধনু ধরিয়া দেওয়া বড় সহজ। হাঁ হাঁ!

আখ। বড়আপা যে 'কল্পতরু'। তিনি দিতে না পারেন কী?

কও। 'কল্পতরু' নহে—'কল্পলতা' বলিতে পার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে নূরজাহাঁ চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া জাফর ও গওহরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মাতার অঞ্চল ধরিয়া মুশতরী বলিল, 'কেন মা, আজি এখন কেন আমরা বেড়াইতে বাহির হইব না?'

নূরজাঁহা। সকালে তোমার মাম্মা ভিকটোরিয়া স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন, এখন তিনি বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে একা রাখিয়া আমরা কিরূপে যাইব?

জোহরা। কেন? মাম্মা একা থাকিতে ভয় করিবেন না কি? তুমি না যাও, আমরা আব্বার সঙ্গে যাইব।

কর্তা সে কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মুশতরী ও জোহরা তাহাদের দরখাস্ত পেশ করিল। গওহর বলিলেন, 'বেশ চল্—অধিক দূর যাইব না, কেবল ঈগেলস ক্রেগে গিয়া ফিরিয়া আসি।'

জোহ। না, আব্বা! ঈগেলস ক্রেগ না! সে দিকে বড় জোঁক।

মুশ। না, ও জোঁকের ক্ষেত্রে গিয়া কাজ নাই।

গও। ছি! তোরা জোঁক দেখিয়া ভয় করিস? (জাফরের পদশব্দ শুনিয়া) আচ্ছা চুপ কর্! তোদের মাম্মাকেও লইয়া যাইব। তাঁহাকে অগ্রে যাইতে বলিয়া আমরা পশ্চাতে থাকিব।

জোহ। (আনন্দে করতালি দিয়া) সে বেশ হইবে! পথে জোঁক থাকিলে পূর্বে তাঁহাকে ধরিবে।

মুশ। চুপ চুপ। মাম্মা!—

ইতোমধ্যে জাফর আসিয়া চায়ের টেবিলে যোগদান করিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। ভাই! আজ আর একটু বেড়াইবে না?

জাফ। না; আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে।

গও। তবু আজ একটু না হাঁটিলে কাল তুমি একেবারে খোঁড়া হইয়া যাইবে। বেশি নহে—চল এই ঈগেলস ক্রেগ পর্যন্ত।

জাফ। আমি যে বুট পরিতে পারিব না।

গও। বুট পরিবার দরকার কী, স্লিপার লইয়াই চল না? সে তো প্রস্তরসঙ্কুল পথ নহে; ঘাসের উপর চলিবে।

রাবু। (জনান্তিকে) স্লিপর পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে! (বালিকাদের হাস্য)

জাফ। (বালিকাদের প্রতি) ছি! হাসিস কেন? তোরা বড় বেআদব; কেন নুরু, তুই কি একটা ধমক দিতেও পারিস না?

নূরু। দোষ বুঝাইয়া না দিলে ওরা ধমক মানে না।

গও। বিনা দোষে বিনা কারণে ধমক মানিবেই বা কেন? হাসিলে দোষ কী?

জাফ। ব্যস! গওহর তুমিই মেয়েদের মাথায় তুলিয়াছ।

গও। আচ্ছা, এখন তোমার যাওয়া ঠিক হইল তো?

জাফ। না—পথ কি বড় ঢালু? উপরে উঠিতে হইবে, না নিচে যাইতে হইবে?

গও। পথ তো একটু ঢালু হইবেই—এখানে সমতল স্থান কোথা পাইবে?

জাফ। তবে আমি যাইব না—এ প্রকাণ্ড শরীর লইয়া গড়াইতে চাই না।

গও। ছি! তুমি পাথুরে পথকে ভয় কর, ঢালুপথে গড়াইতে চাও না,—ইহা তোমার womanishness (স্ত্রীভাব)!

নূর। 'womanish' শব্দে আমি আপত্তি করি। 'ভীরুতা' 'কাপুরুষতা' বল না কেন?

জাফ। পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে—সমালোচনা করে। তুমি কি গওহরকে ভাষা শিক্ষা দিবে?

গও। স্ত্রীলোকেরা আমাদের অনুপযুক্ত কথার প্রতিবাদ করেন, আমাদের গল্পে অংশ-গ্রহণ করেন, ইহা তো অতি সুখের বিষয়।

জাফ। তুমি এখনো মূর্খ!—তোমারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া নূরুকে ধমক দিলাম, আর তুমি উল্টা আমারই কথার প্রতিবাদ কর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। প্রবলের পক্ষ সমর্থনের আবশ্যকতা নাই। তুমি তোমার ভগিনীর পক্ষপাতিত্ব করিবে, ইহাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত।

নূর। ভাই আমার মত বা পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? আমি বেচারি তাঁহার কী কাজে লাগি?—আমি কি তাঁহাকে মোকদ্দমায় সৎপরামর্শ দিতে পারি? কি তাঁহার জমিদারি দাঙ্গার সময় পাঁচ-সাত জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারি?

গওহর হাসিলেন। জাফর অন্য কথা তুলিলেন :

'সত্যিই নূরু এবার আমার সঙ্গে যাইবে না? আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী বৎসর যাইতে পারিবে না, তখন কওসরুর বিবাহের ধুমধামে ব্যস্ত থাকিবে। এবার যাইবে না কেন? তুমি গুরুজি এই শিক্ষা দিয়াছ নাকি?'

আবার প্রবলবেগে হাসি পাওয়ায় বালিকাদল পলায়ন করিল।

গও। দোহাই তোমার! আমি কিছু শিক্ষা দিই না। উনি তো প্রতি বৎসর তীর্থদর্শনের ন্যায় তোমার সহিত পিত্রালয়ে যাইতেন। এবার কেন যাইতে অনিচ্ছুক, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জাফ। বল নূরু! কেন যাইবে না?

নূর। আমি রাবুদের ডাউহিল স্কুলে ভর্তি করিবার চেষ্টায় আছি।

স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন,—কী বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্তি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই—এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই। এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে? প্রথম অভিশাপ আমারই ভাগিনেয়ীদের উপর? প্রথম অধঃপতন আমাদেরই?

গও। তুমি ভালোরূপে কথাটা না শুনিয়াই বিলাপ আরম্ভ করিলে? ডাউহিল স্কুলে কেবল বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাত-আটজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাদৃশ্য বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইলে দোষ কী?

নূর। সে স্কুলে পুরুষ মোটেই নাই। মেমরানি ও আয়াই স্কুলগৃহের যাবতীয় কার্য করে। কেবল বাবুর্চি ও খানসামা পুরুষ। পাচকের সঙ্গে স্কুলগৃহের কোনো সম্বন্ধ নাই। কেবল রন্ধনশালা হইতে খানা বাহিয়া আনে দুই-তিনজন চাকর। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত আমি কথা ঠিক করিয়াছি যে, ঐ খাদ্যদ্রব্য বাহিবার জন্য যদি আমি উপযুক্ত চাকরানি দিতে পারি, তবে তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া পুরুষ কয়টিকে বরখাস্ত করিবেন। উক্ত শিক্ষয়িত্রীটি অতিশয় ভদ্রলোক—তিনি আমাদের পরদার সম্মান করিয়া থাকেন। সমস্ত স্কুলটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—কোথাও একটিও চাকর ছিল না।

জাফ। তোমরা বল—আমি শুনি। আর ঐ স্কুলের পার্শ্বেই যে বালকদের স্কুল। ছুটির সময় বালক-বালিকারা একত্রে খেলা করিবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। বালক স্কুল হইতে বালিকা স্কুলের ব্যবধান এক মাইলেরও অধিক; এমত-স্থলে তাহারা একত্রে খেলিবে কিরূপে?

জাফ। যদি তোমার চক্ষে কোনো পীড়া না হইয়া থাকে তবে স্টেশনের নিকট দাঁড়াইলেও দেখিবে—উভয় স্কুলের চূড়া পাশাপাশি।

নূরজাঁহা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গওহর সহাস্যে বলিলেন, 'তোমার অভিজ্ঞতার বলিহারি যাই! আজি তুমি ভিক্টোরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছ?'

জাফ। আমি স্কুলের ভিতর যাই নাই।

গও। (সবিস্ময়ে) তবে সকালে তিন ঘণ্টা তুমি কোথায় ছিলে?

জাফ। তৃতীয় বেঞ্চে কতকক্ষণ বসিয়াছিলাম। তারপর স্কুল-সীমানায় প্রবেশ করিয়া দেখি, পথ আর ফুরায় না। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, স্কুল পৌঁছিতে আরও ১৫ turn (পেচ) বাকি। (অর্থাৎ পথ তো সোজা নহে, আঁকাবাঁকা; তাই আরও ১৫ বার ঘুরিলে স্কুল পাওয়া যাইবে)। তখন আমি ভাবিলাম, আজি আর পথ শেষ হইবে না, তাই ফিরিয়া আসিলাম।

নূরজাহাঁ আবার হাসিলেন। আর গওহর বলিলেন, ব্যস। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তুমি স্কুলের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, ভিক্টোরিয়া স্কুলই দেখ নাই, অথচ ডাউহিল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ! তুমি কি জানো বালিকা বিদ্যালয় কোথায়? স্কুলগৃহের যে যুগল-চূড়া দেখা যায়. উহা এক ভিক্টোরিয়া স্কুলেরই। স্কুলটি কি তুমি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালা মনে করিয়াছ? উহা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা—এবং উহা অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকদের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণই তো প্রায় পাঁচ বিঘা জমি'!

নূর। এবং ডাউহিল স্কুল উহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড। একটি কক্ষে পঞ্চাশটি বালিকার শয্যা দেখিলাম এবং প্রত্যেক পর্যঙ্ক অপর পর্যঙ্ক হইতে দুই হাত ব্যবধানে। এখন আন্দাজ কর তো কক্ষটা কত বড়?

জাফ। অতবড় ঘর এ প্রস্তরসঙ্কুল দেশে নির্মাণ করা কি সহজ না সম্ভব?

নূর। সহজ না হউক, সম্ভব তো। বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে তো। প্রথমে একটা টেনিস কোর্ট দেখিয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল। কতগুলি কঠিন প্রস্তরের মস্তক চূর্ণ করিয়া ঐ সমতল প্রাঙ্গণখানি নির্মিত হইয়াছে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। কেবল প্রস্তর ভাঙিতে হয় নাই, স্থানবিশেষে জোড়া দিয়া ভরাটও করিতে হইয়াছে। অতখানি স্থান যে একেবারে গর্তশূন্য ছিল, তাহা হইতে পারে না। একদিকে মহাশিল্পীর পর্বত-রচনা কৌশল, অপরদিকে তাঁহারই প্রদত্ত মানববুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ—উভয়ের মিশামিশি বড় চমৎকার বোধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। ভাই! তুমি দিনকতক এখানে থাকো, তাহা হইলে তুমিও কবি হইতে পারিবে! কবিত্ব-জ্ঞান-রহিত অবলার মরুতুল্য হৃদয়েও যখন কবিত্ব-কুসুম ফুটিতেছে—

জাফ। আমি নূরুর অপেক্ষা কম Prosaic (অকবি) নহি! আমরা উভয় ভ্রাতা-ভগিনীই প্রসিদ্ধ Prosaic!

গও। কিন্তু এখানকার জলবায়ু এমন যে—

'বারেক দর্শন পেলে চিরমূক কথা কয়!
...মহামূর্খ কবি হয়!'

জাফ। কিন্তু তাহাতে লাভ কী? কবিত্বটা মস্তিষ্কের রোগবিশেষ! আমাদের কুলকামিনীরা পাহাড়ে ময়দানে বেড়াইয়া কবি হয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

গও। তবে কী বাঞ্ছনীয়?

জাফ। বাঞ্ছনীয় এই—তাহারা সুচারুরূপে গৃহস্থালি করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নামাজ প্রতিপালন করে।

গও। নামাজ কাহার উদ্দেশে?

জাফ। (আরক্ত লোচনে) কাহার উদ্দেশে?—খোদাতায়ালার উদ্দেশে!

গও। বেশ ভাই ঠিক বলিয়াছ। তুমি অবশ্যই জানো, একটা পারস্য বয়েৎ আছে—'চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে স্মরণ কর।' আর ইনি এখনই মহাশিল্পী বলিয়া কাহার প্রশংসা করিলেন?

জাফ। মহাশিল্পী তো ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে।

গও। তবে কবিত্ব ধর্মের বিরোধী হইল কিসে? ঈশ্বরের সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায়, ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, বর্ণ যথারীতি খাটাইয়া সৃষ্টিজগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালোমতে চিনিবে কিরূপে? পর্বতচূড়ায় দাঁড়াইলে আপনা হইতে হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়,—তখন অজ্ঞাতে হৃদয়তন্ত্রে বাজিয়া উঠে—

'সেই অদ্বিতীয় কবি আঁকিয়া এমন ছবি—
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায়?

জাফ। আমি ভালোমতো বাঙ্গালা বুঝি না।

গও। তবে বল—'জমীচঁমন গুল—'[৮]

জাফ। (বাধা দিয়ে) রাখো এখন তোমার কবিতা! কন্যাগুলি নিশ্চয় স্কুলে যাইবে?

গও। নিশ্চয়! কওসর, আখতর ও বদুর স্কুলে পড়িবার সময় গত হইয়াছে সেজন্য বড় আক্ষেপ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফ। তবে নূরজাহানকেও ভর্তি কর!

গও। আমার আপত্তি নাই। ইনি তো বলেন যে, 'শিং কাটাইয়া বাছুরদলে মিশিতে ইচ্ছা হয়।'

জাফ। (সহোদরার প্রতি) মিশিলেই পার! তোমারও একান্ত ইচ্ছা নাকি শ্রীমতীদের খ্রিস্টান করা?

নূর। মেয়েরা খ্রিস্টান হইবে কেন? আমি অহঙ্কারের সহিত বলি—আমার মেয়েরা ধর্মভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইহারা খাঁটি সোনা—অনলে সলিলে ধ্বংস হইবে না।

গও। আমিও সাহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ঈমান) টলিতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোনো তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়াপাখির মতো নামাজ পড়েন, কোনো শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধা না রাখো, তবে একবার কোনো মিশনারি মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন, 'বাহ্! যিশুর কী মহিমা!' সুতরাং সাবধান! যদি পার তো লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

জাফ। আর নূরু বুঝি নামাজে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ জানে?

গও। জানেন কি না পরীক্ষা কর! তুমি কি মনে কর এই কুড়ি বৎসরের বিবাহিত জীবনেও আমি আমার অর্ধাঙ্গীকে আমার ছায়াতুল্যা সহচরী করিয়া তুলিতে পারি নাই?

জাফ। তবে দেখ, নূরু-যে স্কুলে পড়ে নাই সেজন্য কি আটকাইয়াছে? তবে মেয়েগুলোর মাথা খাও কেন?

গও। আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেলপথে ভ্রমণ করেন নাই, টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান নাই, সেজন্য তাঁহাদের কিছু আটকাইয়াছিল কি? তবে আমরা টেলিগ্রাফ পাঠাই কেন, রেলগাড়িতে উঠি কেন?

জাফ। আমাদের তো ওসব আবশ্যক হয়।

গও। যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন। তাঁহারা আমাদের আবশ্যক অনুযায়ী বস্তুই তো জোগাইয়া থাকে। গ্রাম্য চাষার স্ত্রীরা জরির কাজ জানে না, আচার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না, কারণ চাষাদের তাহা আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় কামিনীরা পান সাজিতে জানে না; কারণ ইউরোপীয় পুরুষদের তাহা আবশ্যক হয় না। আবার আমাদের কুলবালারা চাষা স্ত্রীদের মতো ধান ঝাড়িতে জানেন না, যেহেতু আমাদের তাহা প্রয়োজন হয় না। ক্রমে আমরা কারি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটলেট, পুডিং খাইতে শিখিতেছি, আমাদের গৃহিণীরাও তাহা রাঁধিতে শিখিতেছেন। আমাদের ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাঁহাদের ছাড়া আমাদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই? স্কুল-কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহাদেরও প্রয়োজন। তোমার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা আমার গার্হস্থ্য জীবন অধিক সুখের, ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

জাফ। তাহা না পারুন; কিন্তু তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনিও বলেন—'হ্যাঁ, দিব্য জ্যোৎস্না!' আবার যদি আমি অমাবস্যা রাত্রিকে দিন বলি, তিনিও বলিবেন—'হ্যাঁ, রৌদ্র বড় প্রখর।'

গও। শাবাশ! (সকলের হাস্য)

জাফ। তা না তো কি! স্বামী-স্ত্রীর মত এক না হইলে দিবানিশি রুশ-জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

গও। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মত এক হইল কই? তুমি যেরূপ বলিলে তাহাতে কেবল তোমারই মত প্রকাশ পায়, তাঁহার তো মতামত জানাই যায় না। তিনি কদাচ নিজ মত ব্যক্ত করেন না। এবার যখন কোনো পশুশালায় যাইবে, অনুগ্রহ করিয়া পশুগুলির সমক্ষে কোনো বিশেষ মত প্রকাশ করিও, আর পশুগুলি উত্তর না দিলে বা মাথা নাড়িলে বুঝিয়া লইও পশুগণ তোমার সহিত একমত হইয়াছে।

জাফ। শুন, আর একটি কাজের কথা বলি; আগামী বৎসর তো কওসরুর বিবাহ, এখন তাহাকে লইয়া তোমরা পাহাড় পর্বতে বেড়াও, বরপক্ষীয় লোকেরা শুনিলে কী বলিবে?

নূর। বরপক্ষের ইহাতে আপত্তি নাই, জানি।

গও। বর তো শিমলাতেই কাজ করেন। আর স্বামীর সহিত স্ত্রী বেড়াইবে, পিতার সহিত কন্যা বেড়াইবে, তাহাতে অন্য লোকের আপত্তি করিবার অধিকার আছে কি?

জাফ। বেশ, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন। বরটিও তোমাদের মনোমতো পাইয়াছ। তাহা হইলে দেখিতেছি আমার নির্বাচিত পাত্রের সহিত আখতরের বিবাহ দিবে না?

গও। না। কওসরের ভাবী দেবরের সহিত আখতরের বিবাহ হইবে।

জাফ। তবে উভয় কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে দাও না কেন?

গও। তাহা হইলে ভালোই হইত কিন্তু সে ছেলেটি এখন বিলাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত টুঙ্গ নামক স্থানে একটি ঝরনার ধারে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সে বলিল—'মেজ আপা! দেখ তো এই ঝরনা কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে আবার কোথায় চলিয়াছে। তুমি বলিতে পার শেষে কোথায় গিয়াছে?'

আখতর। না, রাবু! আমি তো জানি না শেষে কোথায় গিয়াছে। আসিয়াছে ঐ পাহাড়ের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া।

রাবু। সামান্য জলধারা পাষাণ বিদীর্ণ করিল কিরূপে? তাহা কি সম্ভব?

কওসর। ঐ জলধারা কেবল পাষাণ বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহাই নহে; কত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড উহার চরণতলে গড়াইতে গড়াইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকণায় পরিণত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রস্তর বালুকায় পরিণত হওয়ার কথাটা রাবু সহজে ধারণা করিতে না পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্য আব্বা?'

গওহর কথা কহিবার পূর্বে জাফর বলিলেন, 'হাঁ সত্য। তোরা যেমন পিতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিস, ঐ নির্ঝরগুলি সেইরূপ পাষাণময় পিতৃবক্ষে নৃত্য করিতেছে—পিতা তবুও অটল। হিমাদ্রিও ঠিক গওহরেরই মতো সহিষ্ণু। আর শোন্, স্টিমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস, এইরূপ কোনো একটা শিশু-নির্ঝরই তাহার উৎস।'

রাবু। (আনন্দ ও উৎসাহের সহিত) তবে মাম্মা! বলুন তো ইহার কোন্‌টা গঙ্গার উৎস?

জাফ। গঙ্গার উৎস এখানে নাই।

কও। কী ভাবিতেছ আখতর?

আখ। ভাবিতেছি—এই ক্ষীণাঙ্গি ঝরনাগুলি হিমালয়ের হৃদয়ে কেমন গভীর হইতে গভীরময় প্রণালী কাটিয়া কলকল স্বরে স্রষ্টার স্তবগান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—আলস্য ঔদাস্য নাই—অনন্ত অবারিত গতিতে চলিয়াছে।

রাবু। মেজ আপা। আমিও একটি নদীর উৎস আবিষ্কার করিলাম।

আখ। বটে?

কও। কী আবিষ্কার করিয়াছিস বল্ তো?

রাবু। কারসিয়ঙ্গের পাগলা ঝোরাই পাগলা নদীর উৎস!

আখ। দূর পাগ্‌লি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদর। রাবু কিন্তু কথাটা একবারে অসঙ্গত বলে নাই—ত্রিস্রোতা নদী তো দার্জিলিঙের আশপাশেই—

কও। ধন্য তোমাদের গবেষণায়। বদু তো বেশ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বদু। যদি গবেষণায় ভুল হইয়া থাকে, তবে ও-কথা থাক; আর এক মজার কথা বলি—বেশ খেয়াল করিয়া দেখ তো, পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়া রেলপথ কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—একদিকে সুউচ্চ পর্বত, অন্যদিকে নিম্নস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ের স্তূপ—একটির পর অপরটি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দেখায়! ইহাকে পর্বত-তরঙ্গ বলিলে কেমন হয়?

কও। বেশ ভালো হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা তোমার মনে আছে বোন?

বদু। না দিদি! মনে তো পড়ে না।

রাবু! মাম্মা! আমি ঐ ঝরনার জল স্পর্শ করি গিয়া?

জাফ। যাবি কিরূপে? অবতরণের পথ যে দুর্গম।

রাবু। আপনি অনুমতি দিন—আমি যেমন করিয়া পারি, যাইব। সেজ আপা! তুমিও আসিবে?

বদু। না, তুমি একাই যাও।

জাফর অনুমতি দিলেন। রাবু অতিকষ্টে অগ্রসর হইল; শেষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার গতিরোধ করিল। সেটি অতিক্রম না করিলে জলস্পর্শ করা হইবে না। উপর হইতে কওসর শাসাইল, 'দেখিস কাপড় ভিজে না যেন।' প্রায় হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে রবু সে প্রস্তর অতিক্রম করিল। শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বদুর একটু হিংসা হইল। সে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া বলিল,—কিলো রাব্বু! স্বর্গে পঁহুছিয়াছিস যে? তোর আনন্দের সীমা নাই। তুই তবে থাক ঐখানে,—আমরা চলিলাম।

নূরজাহাঁও ডাকিলেন, 'আয় মা! বেলা যায়।'

সকলে আরও কতকদূর অগ্রসর হইলেন। ইহারা টুঙ্গ হইতে পদব্রজে কারসিয়ঙ্গ চলিয়াছেন।

পথে দুই-তিনজন পাহাড়ি তাহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া একদিকে দাঁড়াইল।

গওহর জাফরকে বলিলেন, 'দেখিলে ভাই, ইহাদের শিভালরি (অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন)?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফ। ইহা উহাদের অভ্যাস, অনেক সময় স্ত্রীলোকেরাও আমাকে সুপথ ছাড়িয়া দিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়।

নূর। যেহেতু তাহারা 'নিচেকা আদমি'কে দুর্বল মনে করে।

জাফ। আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট দুর্বলতা স্বীকার করি না।

গও। যে সবল, তাহার নিকট দুর্বলতা স্বীকার করায় দোষ কী?

জাফ। যাহাই হউক, স্ত্রীলোককে আমি কায়িক বলের শ্রেষ্ঠতা দিব না।

গও। কেন দিবে না? 'Give the devil even his due.' (শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দান কর)।

জাফ। কিন্তু আমি রমণীকে তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দিতে অক্ষম!

গও। তবে একবার শর্টকাট পথে কোনো পাহাড়িনীর সহিত race (বাজি) দৌড়াতে চেষ্টা কর দেখি!

জাফ। শর্টকাটে? তাহা মানুষের অগম্য!

নূর। তবে ঐ দুর্গম পথে যাহারা পৃষ্ঠে দুই মণ বোঝাসহ অবলীলাক্রমে আরোহণ করে, তাহাদের নিকট দুর্বল বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ কর কেন?

এস্থলে পার্বত্য শর্টকাট পথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তরসঙ্কুল গড়ানিয়া খাড়া সংক্ষিপ্ত পথকে short cut বলে। শর্টকাট পথ বড়ই দুর্গম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না। পাথর কাটিয়া ভাঙিয়া অশ্বাদি, গাড়ি ও (নিচেকা) মানুষের জন্য গভর্নমেন্ট যে অপেক্ষাকৃত সমতল কিন্তু ক্রমোচ্চ সুগম পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাকে স্থানীয় ভাষায় 'সরকারি সটক' বলে। ঐ সরকারি সটকগুলি অনেক দূর আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। সচরাচর গুর্খা ও ভুটিয়াগণ সরকারি ঘুরাও পথে না চলিয়া শর্টকাটে যাতায়াত করে। কারণ যেখানে শর্টকাটে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়, সেইখানে সরকারি সড়ক দিয়া গেলে প্রায় ২০-২৫ মিনিট লাগে এবং সাতবার ঘুরিতে হয়।

নূরজাহাঁ পুনরায় বলিলেন, 'এই অশিক্ষিত পাহাড়িদের শিভালরি অবশ্য অবশ্য প্রশংসনীয়।'

গও। উহাদের নিকট আমাদের ভদ্রতা শিক্ষা করা উচিত। আমরা বৃথা ভদ্রতা ও সভ্যতার বড়াই করি।

নূর। আর একটা বিষয় লক্ষ করিয়াছ, ভাই? পাহাড়ি বা ভুটিয়া স্ত্রী-পুরুষ—কেহই ভিক্ষা করে না।

জাফ। তাহাদের ভিক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। প্রয়োজন না-হওয়াও তো প্রশংসনীয়।

এইরূপ কথাবার্তায় তাঁহারা পথক্লান্তি ভুলিতেছিলেন। কারসিয়ঙ্গ স্টেশনের নিকটে আসিয়া কওসর বলিল,—'কি রাবু! ক্লান্ত নাকি?'

রাবু। না, মোটেই না।

জাফ। আরও এক মাইল যাইতে হইবে, জানিস?

ক্রমে তাঁহারা একটা বেঞ্চের নিকট আসিলেন। তথায় কয়েকজন গুর্খা বসিয়াছিল, তাহারা ইঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিল। নূরজাহাঁ বলিলেন, 'একটু বসা যাউক।'

জাফ। না, চল আর বেশি দূর নাই।

বদু। হাঁ মাম্মা! বসুন না! ঐ দেখুন আকাশে আগুন।

জাফর পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই আকাশে আগুন লাগিয়াছে। সবই যেন অগ্নিময়।

আখ। দেখ আপা! কাঞ্চনজঙ্ঘায়ও আগুন লাগিয়াছে।

জাফ। বাস্তবিক বড় চমৎকার দৃশ্য তো! এখান হইতেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দুই-তিনটি শৃঙ্গ দেখা যায়। অস্তমান রবির সোনালি কিরণে সত্যই সে কাঞ্চন কান্তি লাভ করিয়াছে। বোধ হয় যেন দিনমণি পশ্চিম গগনে আত্মগোপন করিতে যাইতেছে—আর সুকুমার মেঘগুলি তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে! প্রদোষে এমন শোভা হয়, পূর্বে লক্ষ করি নাই। ওদিকে অলকমালা রাঙ্গাকিরণে স্নান করিয়া স্বর্ণবর্ণ লাভ করিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ যেন তাহাদের সহিত লুকোচুরি খেলিবার ছলে মেঘমালাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

গও। সালাম ভাই! তুমিই তো বল কবিত্ব মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ!

জাফ। তুমি বলিয়াছ যে, এখানকার জলবায়ুতে ঐ রোগটা আছে। পূর্ববঙ্গের জলবায়ুতে ম্যালেরিয়া, হিমালয়ের জলবায়ুতে কবিত্ব।

গও। কেবল কবিত্ব নহে, বৈরাগ্য—যোগশিক্ষা ইত্যাদিও! এইখানে বসিয়া স্রষ্টার লীলাখেলা দেখ—তোমার সান্ধ্য-উপাসনার ফলপ্রাপ্ত হইবে। এখানে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

নূর। বলিতে কি, অভ্যাসমতো উপাসনায় এমন ভাবের আবেগ, ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকে না।

গও। আর আমরা যে সামাজিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীলোকদের এমন উপাসনা—অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কী উত্তর দিব? যে চক্ষুর কার্য দর্শন করা, তাহাকে চির অন্ধ করিয়া রাখি—ধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সভ্যতায়। ইনি নাকি এখানে আসিবার পূর্বে কখনও উষার প্রথম আলোক ও সূর্যোদয় দেখেন নাই।

জাফ। সম্ভবত আমিও দেখি নাই—সেজন্য আমি তো একবারও বিলাপ করি না।

গও। কিন্তু তুমি মাঠে বাহির হইলেই দেখিতে পাইতে; তোমার গতি তো অবারিত। আর মনে রাখিও, যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্মেরই এক অঙ্গ।

জাফ। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে লোক নাস্তিক হয়, এইজন্য কুলললনাবৃন্দকে জ্ঞান হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

গও। যত অভিশাপ কুলবালার উপর! ইহা তোমার বিষম ভ্রম। জ্ঞানের সহিত ধর্মের বিরোধ নাই। বরং জ্ঞান ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ।

আরও অনেক কথা হইল। এদিকে বালিকার দলও নীরব ছিল না। আখতর মৃদুস্বরে বলিল, 'দেখ আপা! ওদিকে দূরে উচ্চ গিরিচূড়ে চায়ের শ্যামল ক্ষেত্রগুলি সান্ধ্য রবিকিরণের তরল স্বর্ণবর্ণে স্নান করিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আবার কেমন ধীরে ধীরে ঈষৎ ধূমল বর্ণের বাষ্পরূপী ওড়নায় নিজ নিজ স্বর্ণকায় আবৃত করিতেছে।'

কও। ঠিক বলিয়াছ, বোন। আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বলিহারি যাই!

বদু। চল এখন বাসায় যাই!

আখ। যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন, দিদি?

বদু। আর এখানে থাকিয়া কী দেখিবে? ঐ দেখ ক্রমে সন্ধ্যাসমাগমে বুঝি শীতবোধ হওয়ায় চা-বাগানগুলি অন্ধকার লেপে শরীর ঢাকিতেছে। আর তো কিছুই দেখা যায় না।

কও। চা-বাগানের শীতবোধ হউক না হউক, বদুর শীতবোধ হইতেছে। কারণ বদু ভ্রমক্রমে শাল আনে নাই।

সকলে বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গওহর আলী দুহিতাদিগকে পাঠগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি অর্ধঘণ্টাকাল তাহাদের সহিত গল্প করেন। গল্পচ্ছলে তিনি তাহাদিগকে কখনো ঐতিহাসিক কখনো ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অদ্য তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সৌরজগৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশতরী। ভালো কথা, আব্বা। মাম্মা কেন আমাদিগকে সৌরচক্র বলেন? আমরাও কি আকাশে ঘুরি?

গও। তিনি বিদ্রূপ করিয়া আমাদের সৌরজগৎ বলেন। কিন্তু আইস আমরা ঐ বিদ্রূপ হইতে একটা ভালো অর্থ বাহির করিয়া লই।

কও। জানো না? আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার ভিতরও অনেক সময় মূল্যবান বস্তু লুক্কায়িত থাকে!

গও। হাঁ, অদ্য আমরা ঐ বিদ্রূপ-আবর্জনা হইতে একটা মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে চেষ্টা করি। কওসর, তুমি চেষ্টা করিবে, মা?

কও। আপনিই চেষ্টা করুন।

গওহর আরম্ভ করিলেন, 'বলিয়াছি তো প্রত্যেক গ্রহই নিয়মমতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহগণের কর্তব্য, তদ্রূপ তাহাদিগকে আলোক প্রদান ও তাহাদের প্রত্যেকটিকে যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা সূর্যের কর্তব্য। এই সৃষ্টিজগতে প্রত্যেকে আপন কর্তব্য পালন করিতেছে। কাহারও কর্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে সমষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

'মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়স্বজনেরা ঐ সৌরপরিবারের এক-একটি গ্রহ। গ্রহদের কর্তব্য গৃহস্থের অবস্থানুসারে তাহারই মনোনীত পথে চলা। এবং গৃহস্থেরও কর্তব্য পরিবারস্থ লোকদিগকে স্নেহরশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করা, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা—এমনকি (দারিদ্র্যবশত) খাদ্যের অপ্রতুলতা হইলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করাইয়া সর্বশেষে তাহার ভোজন করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া পরিবারটি নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিবে।

'যেমন কোনো গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করিয়া দূরে যায়, তবে সূর্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হইলে, সে অন্য কোনো গ্রহের সহিত টক্কর খাইয়া নিজে চূর্ণ হইবে এবং অপর গ্রহকেও বিপদগ্রস্ত করিবে। সুতরাং যাহার যে কক্ষ, তাহাকে সেই কক্ষে থাকিয়া স্বীয় কর্তব্যবর্ত্মে চলিতে হইবে।'

ঠিক এই সময় জাফর আসিয়া বলিলেন, 'সালাম ভাই। পথে আসিয়াছ। আমিও তো তাহাই বলি, যাহার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট আছে, সে তাহা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সমাজরূপ সৌরজগৎ স্ত্রীরূপে গ্রহদের জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে, সে সীমা উল্লঙ্ঘন করা স্ত্রীলোকদের উচিত নহে।'

গও। মাফ কর ভাই! আমাকে আগে আমার বক্তব্য বলিতে দাও। তুমি আসন গ্রহণ কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখতর। (জনান্তিকে কওসরকে) মাম্মা কথা বলিবার ভঙ্গিও জানেন না। 'সমাজরূপ সৌরজগৎ' আর 'স্ত্রীরূপ গ্রহ' বলা হইল।

কও। তাই তো! সমাজটা নিজে সৌরজগৎ হইলে গ্রহদের সীমা নির্দিষ্ট করিবার অধিকার কী? ঈশ্বর স্বয়ং সকলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। আচ্ছা এখন উঁহাদের কথা শুনি।

জাফর আসন গ্রহণ করিলে পর বালিকারাও আসন গ্রহণ করিল। জাফরকে দেখিয়া ইহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়াছিল।

গওহর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'কেবল অবলারা সীমা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই নহে, পুরুষেরাও স্বীয় কক্ষ লঙ্ঘন করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে।'

জাফ। পুরুষদের গন্তব্যপথ তো সীমাবদ্ধ নহে, তাহাদের আর কক্ষচ্যুত হওয়া কী?

গও। পুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহাদেরও কর্তব্য আছে। তুমি কি স্ত্রীপুত্রকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া কোথাও যাইতে পার?

জাফ। না।

গও। তবে কিরূপে বল, তোমার পথ সীমাবদ্ধ নহে?

জাফ। তবু আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

গও। কর্তব্যে অবহেলা করিবার ক্ষমতা নাই।

মুশ। আব্বা। আমরা তো সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যকার্য করি, কিন্তু নয়িমু ও মাসুমা তো কিছু করে না?

রাবু। তাহারা এত ছোট যে তাহাদের কর্তব্য কিছুই নাই।

গও। তাহাদেরও কর্তব্য আছে বইকি? নয়িমুর কর্তব্য যথানিয়মে আহার-নিদ্রা পালন করা ও খেলা করা। মাসুমার কর্তব্য খাওয়া, নিদ্রা যাওয়া, হাসা এবং দৌড়াইতে শিখা।

রাবু। ইশ! ভারি তো কর্তব্য! উহারাও কাজ না করিলে আমাদের এখানে এমন কী বিশৃঙ্খলা ঘটিবে?

কও। উহারা এখনও তোমাদের মতো দুষ্টামি শিখে নাই; তাই উহারা যথানিয়মে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করে। যদি মাসুমা না হাসে বা নয়িমা না খায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহাদের অসুখ হইয়াছে। তখন তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

গও। তাহাদের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকিলে আমাদের দৈনিক কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে কি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবু। হাঁ—বুঝিলাম।

গও। আর এক কথা মনোযোগের সহিত শুন। আমি বলিয়াছি, গ্রহমালা স্ব-স্ব কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণকার্যে গ্রহদের সাদৃশ্য ও একতা আছে অর্থাৎ সকলেই ঘুরে, এই হইল সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল গ্রহই একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে বসে, তাহা নহে! (জাফরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তাহাদের আবার 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা আছে। জাফর ভাই যে বলেন, সৌরপরিবারের অবলারূপ গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা নাই, ইহা তাঁহার ভ্রম।

জাফ। ভ্রম নহে—ঠিক কথা। অবলাকে কোনো প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। তুমি হয়তো মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হইতে এ-স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ যাহা বলেন, তোমার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

গও। আমি আজি পর্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খ্রিস্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই? আর আমি তো এই কারসিয়ঙ্গ শৈলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ি অনুসন্ধান কর গিয়া, যদি আমার বাড়িতে 'Christian Tract Society-র প্রকাশিত পুস্তিকা' একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার (১,০০০.০০) টাকা দিব!

জাফ। হাজার টাকার বাজি?

গও। হাঁ—লাগাও বাজি—এক হাজার নূতন টাকা। আর যদি পুস্তিকা না পাও, তবে তুমি দিবে ১,০০০.০০ টাকা!

জাফ। না, বাজি এইরূপ হউক যে, হারজিত, উভয় অবস্থাতেই তুমি টাকা দিবে? হা! হা-হা!

গও। ব্যস! ঐখানেই বীরত্বের অবসান।

এই সময় নূরজাহাঁ আসিয়া কওসরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বদর। আব্বা, গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা কেমন?

গও। যেমন সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে বুধের প্রায় ৩ মাস, শুক্রের ৮ মাস, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং শনির ৩০ বৎসর লাগে। ইহাই তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনিগ্রহকে কেহ আরক্তনেত্রে আদেশ করিতে পারে না যে, 'তোমাকেও বুধের মতো ৩ মাসেই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতে হইবে।' এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈষম্য আছে, তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না।

কও। আর অত কথা এককালে বলাও তো সম্ভব নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গও। হাঁ সম্ভবও নহে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারের ও পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি বৈসাদৃশ্যও আছে।

জাফ। যথা গওহর আলীর সহিত আমার চক্ষুকর্ণের similarity (সাদৃশ্য) আছে এবং মতামতের dissimilarity (বৈসাদৃশ্য) আছে। (সকলের হাস্য)।

কও। তরুলতার গঠনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা বৈষম্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি বিদ্যমান দেখিতে পাই।

বদু! সেদিন তোমাকে নানাজাতীয় fern-এর (ঢেঁকিগুল্মের) সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং পত্রগত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখাইয়াছিলাম, মনে আছে তো?

বদু। হাঁ, ঠিক একরকমের দুইটি পাতা বাহির করিতে পারি নাই।

গও। তাই তো। জাফর ভাই যেমন মনে করেন সংসারে তিনি ছাড়া আর কে—বিশেষত স্ত্রীলোক কথা কহিবে না, তিনি ব্যতীত আর কেহ স্কুলে পড়িবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে।

জাফ। আমি কি লোককে কথা বলিতেও নিষেধ করি?

গও। নিষেধ কর না বটে, কিন্তু তুমি এমনভাবে বলা আরম্ভ কর যে, আর কাহারও কথা কহিবার সুবিধা হয় না। ইনি তোমাকে তিনদিন কন্যাদের বালিকা স্কুলে পড়িবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তুমি একদিনও ধৈর্যের সহিত শুন নাই। তুমি যেভাবে মহিলাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের বাগ্মিতা প্রকাশ কর, তাহা তোমার ন্যায় বিলাত-ফেরতার পক্ষে কদাচ শোভনীয় নহে।

জাফ। আমি অধিক কথা বলি, তোমরাও বল না কেন?

গও। আমরা অত বকিতে পারি কই? আমি দুইশত টাকা পুরস্কার দিব, যদি কেহ তোমাকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে।

নূর। কেবল বাকযুদ্ধ নহে—বাগডাকাতিও বটে!

জাফ। নূরু! তুইও বিপক্ষে গেলি?

নূর। না, ভাই! ক্ষমা কর—আমি তো এমন কিছু বলি নাই!

গও। ঠিক,—বাগ্মিতা, বাকচাতুর্য, বাকচৌর্য, বাগডাকাতি এবং বাকযুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার জাফর দাদাকে পরাস্ত করিবে, সে ২০০.০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।

নূর। সভয়ে আর একটি কথা বলি—ভাই দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলেন, কিন্তু কী যে বলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য!

গও। কেবল বকেন—লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে—নানাস্থানে ঘুরেন। কিন্তু বকেন! অপরের বক্তব্য শুনেন না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল নিজে বকেন। যাহা হউক, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে। জাফর দিনকে রাত্রি বলিলে যে তাঁহার বাড়ির সকলকেই 'দিব্যজ্যোৎস্না' বলিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখানো বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।

জাফ। উঠ এখন; আজি যথেষ্ট বকিলে!

গও। আর দুই-এক কথা বলিতে দাও—তোমার কথা নহে। সৌরচক্রের গ্রহমালা যেমন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত যে সত্য—অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাসসহকারে নির্ভর করিয়া স্ব-স্ব কর্তব্যপথে চলি। যে-কোনো অবস্থায় সত্য ত্যাগ করা উচিত নহে—সত্যভ্রষ্ট হইলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কও। আমরা সকলেই সৌরপরিবারের এক-একটি ক্ষুদ্র তারা, পরমেশ্বর আমাদের সূর্য।

গও। ঠিক। এবং যাহারা উক্ত সৌরপরিবারের ন্যায় সুখে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

কও। পরস্পরে একতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

গও। হাঁ, কিন্তু এই ঐক্য যেন সত্যের উপর স্থাপিত হয়। একতার মূলে একটা মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক।

জাফ। আমি বলি, একতার ভিত্তি ন্যায় বা প্রেম হইলে আরও ভালো হয়।

গও। ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রেমও সদগুণ বটে, কিন্তু উহাদের মাত্রাধিক্যে আবার অনিষ্টের সম্ভাবনা। যেমন সময়-সময় কঠোর ন্যায় কোমল প্রেমের বিরোধী হয়; আবার প্রেমের আধিক্য ন্যায়কে দলিত করে। বিচারক অত্যন্ত দয়ালু হইলে চলে না, আবার ন্যায়বিচারে প্রকৃত প্রমাণ অভাবে অনেক সময় নির্দোষীর দণ্ড হয়। সত্যের কিন্তু অপর পৃষ্ঠা নাই—উহা স্বচ্ছ সুনির্মল। এই জন্য বলি—একতার ভিত্তি সত্য হউক।

জাফ। বেশ! নামাজের সময় হইল—চল এখন তোমার কক্ষে!

গও। চল! নামাজে কিন্তু তুমি ইমাম হইবে।

জাফ। না, তুমি তো আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর না—সুতরাং তুমি ইমাম হইবে।

গও। তবে মনে রাখিও—সকল বিষয়ে আমি নেতা, তুমি অনুবর্তী।

জাফ। না, তাহা হইবে না।

গও। তবে 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা অবলম্বন কর।

জাফ। তথাস্তু! তুমি তোমার কক্ষে উপাসনা কর—আমি আমার কক্ষে।

জাফর ও গওহর চলিয়া গেলে পর বদর বলিল, 'মাম্মা আমাদিগকে সৌরজগৎ বলিয়া বিদ্রূপ না করিলে এত কথা জানিতে পারিতাম না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখ। ঠিক! অদ্য আব্বা আমাদের জন্য কয়লা হইতে কোহেনুর বাহির করিয়াছেন।

কও। মনে রাখিও—আমরা সকলে সৌরপরিবারের তারা!

টীকা

১. বালিকাদের নাম ও বয়স জানিয়া রাখিলে পাঠিকার বেশ সুবিধা হইবে। কওসরের ১৮, আখতরের ১৬, বদরের ১৪, রাবেয়ার ১২, মুশতরীর ১০, জোহরার ৮, সুরেয়ার ৬, নয়িমার ৪ এবং মাসুমার বয়স ২ বৎসর।

২. পুরুষদের কথোপকথনে দুই-একটি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন। ব্রাকেটের ভিতর শব্দগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল।

৩. চিমনি সাইড, স্থান বিশেষ; তথায় চায়ের কারখানায় এক প্রকাণ্ড চিমনি নির্মিত হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস, সেই চিমনির নিকটবর্তী স্থানই কারসিয়ঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান।

৪. অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও কৃত্তিকা নক্ষত্র।

৫. তিন-চারি বৎসরের শিশুরা প্রায় ক-বর্গ স্থলে ত-বর্গ উচ্চারণ করে। গল্পের স্বাভাবিক ভাব রক্ষার্থে আমরাও নয়িমার ভাষায় ত-বর্গ ব্যবহার করিলাম।

৬. পাগলা ঝোরা কারসিয়ঙ্গের বৃহত্তম ঝরনা।

৭. ডান্ডি বাহন বিশেষ; ইহা শিবিকার ন্যায় মানুষের স্কন্ধে বাহিত হয়।

৮. অর্থাৎ 'ধরণী-কানন-ফল'—বাকি অংশ তো উচ্চারিতই হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানার স্বপ্ন[১]

একদা আমার শয়নকক্ষে আরামকেদারায় বসিয়া ভারত-ললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম—আমাদের দ্বারা কি দেশের কোনো ভালো কাজ হইতে পারে না? —এইসব ভাবিতেছিলাম। সে-সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভামান ছিল; কোটি লক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক-একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালি-সৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণকান্তি, সুমিষ্ট কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা, ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না—কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয় রমণীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কী প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা 'সুপ্রভাত' বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম—এমন শুভ্র জোছনাপ্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, 'সুপ্রভাত।' তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—

'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?'

আমি মুক্ত বাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা চন্দ্রের প্রতি চাহিলাম—ভাবিলাম, এ সময় যাইতে আপত্তি কী? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিক্যাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি, সে-সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবত আমাকে তদ্রূপ কোনো উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্তে আসিয়াছেন; আমি বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কী—এ তো সে জোছনাময়ী রজনী নহে!—এ যে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কী বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য বেচারি আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

'উহারা কী বলিতেছে?'

উত্তর পাইলাম—'উহারা বলে যে, আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।'

'পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কী?'

'ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে পুরুষের মতো ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়।'

'পুরুষের মতো লজ্জানম্র!' এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস তো কখনো শুনি নাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন—ইঁহাকে আর কখনো দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কিনা, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন—

'আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!'

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্তত করিয়া বলিলাম, 'আমার কেমন একটু সঙ্কোচবোধ হইতেছে; আমরা পরদানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।'

'আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোনো পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এদেশের নাম 'নারীস্থান'[২] এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।'

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলি দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্বে আর কখনো এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন হরিৎ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণকালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি—ভূমির দিকে দৃকপাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, 'আহা! কী সুন্দর!'

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এসব পছন্দ করেন কি?' (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

'হ্যাঁ, এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।'

'সেজন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ-ফুলের কোনো ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ একজাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।'

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমায় অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক-পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, 'সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জভবনের মতো দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতিরানির লীলাকানন! আপনাদের উদ্যান-রচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

'ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন।'

'তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উপবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।'

'ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কী বলিতে পারেন? জানেন তো অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!'

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল যে, দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুরুষেরা কোথায়?'

উত্তর পাইলাম, 'যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।'

ভাবিলাম, তাহাদের 'উপযুক্ত স্থান' আবার কোথায়—আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, 'মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালোমতো বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কী?

'ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়মআচার জ্ঞাত নহেন, এ-কথা আমার মনেই ছিল না। এদেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন নাকি?'

'হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।'

'বাহ্! কী আশ্চর্য ব্যাপার!' বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন। আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;—পৃথিবীতে অন্তত এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, 'ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত, স্বাধীনতা ভোগ করে। কী বলেন সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?'

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ-প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম—'অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবত দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।'

'হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন—যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে। তা কোনো বন্য জন্তু কোনো একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও তো সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?'

'তাহা ঠিক; হিংস্র জন্তুটা ধরা না-পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।'

'মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমনকি ভালো মানুষের প্রতিও নানাপ্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কী করিবে?'

'তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।'

'বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধহয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, না?'

'অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দি করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?'

'কিন্তু কার্যত আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা—যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামি করে, বা অন্তত করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে। অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি পুরুষেরা বিনাশৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?'

'জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোনো হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু—তাহারা সমুদয় সুখসুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কতশত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।'

'তাই তো! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?'

'না পরিয়া করি কী? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশি, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য।'

'কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলেবিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

'শুনন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কী করিবে?'

'তাহারা কিছুই করিবে না—তাহারা কোনো ভালো কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দি করিয়া রাখুন।'

'কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দি করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি—সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!'

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না, সম্ভবত আমার ন্যায় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন!

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়িখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কী চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন। বাড়ি বলিতে একটি টিনের বাঙ্গালা মাত্র; কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত। সাজসজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল; তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস।

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্চিপোশে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।'

'কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!' এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, 'পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই যে তাহারা ধৈর্যের সহিত ছুঁচে সুতা পরাইবে?'

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?' তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানাপ্রকার সলমা চুমকির কারুকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এ-সব আমারই স্বহস্তে প্রস্তুত।'

'আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে তো অফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?'

'হাঁ। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।'

'দুই ঘণ্টায়। আপনি এ কী বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ—যেমন মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রমুখ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।'

'আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন যে, তাঁহারা সাত-আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?'

'নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।'

'না, প্রিয় সুলতানা। ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ আবার অফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই-তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্যত তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন, তাহা এই যে, কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ। মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।'

তাই তো। অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না। ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনো মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম—নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন! তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রদীপ সবেমাত্র তৈল সলিতাযোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্তমানে) নির্বাপিত হইবে! যে নব কিশলয় সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল, তিনি বলিলেন, 'প্লেগ-টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশি—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশি হয় এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক তো দেখি!'

তাই তো, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিংবা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পরদা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! এ কি রন্ধনগৃহ, না নন্দনকানন? রন্ধনশালার চতুর্দিকে সবজিবাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারির লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোনো চিহ্ন নাই—মেজেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পাদামে সুসজ্জিত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও তো অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?'

তিনি বলিলেন, 'সূর্যোত্তাপে রান্না হয়।' অতঃপর কী প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে তিনি তৎক্ষণাৎ একপাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কী প্রকারে?'

ভগিনী বলিলেন, 'কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারানি সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামত রানি ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য-শাসন করিতেন।

'মহারানি বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানচর্চা করিতে ভালোবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল যে, তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হউক। মহারানির খেয়াল—সে-খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গভর্নমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল স্থাপিত হইল। এমনকি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয় স্রোত-প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোনো কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না—এই আইন হইল। আর এক-কথা—এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মতো কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।'

'এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!' এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

'কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান সেই প্রকারই আছে! কতদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।'

'আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারানি—আর কি কোনো অভাব থাকিতে পারে! অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা প্রিন্সিপ্যাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা গেল—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল—এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জলগ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপ্যাল প্রাকৃতিক ঝড়বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।'

'বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না।' কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব। তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোনো পুরুষে পরিচয় নাই। সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোনোমতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

'দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল—অতিহিংসায়[৩] তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল মনস্থ করিলেন যে, এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামতো যথাতথা বিতরণ করিতে পারেন।

'যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইলেন যে, জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জল গ্রহণ করিতে এবং সূর্যোতাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমনকি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্নকল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।'

আমি বলিলাম, 'আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কী প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দি করিলেন? কোনোরূপে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন নাকি?'

ভগিনী বলিলেন, 'না'।

'তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও তো সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দি হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনোরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।'

'হাঁ, তাই বটে'!

'কে প্রথমে পুরুষ-প্রবরদের পরাভূত করিল—সম্ভবত কতিপয় নারীযোদ্ধা?'

'না, এদেশের পুরুষদের বাহুবলে পরাস্ত করা হয় নাই।'

'হাঁ, ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে।'

তবে?

'মস্তিষ্ক-বলে।'

'তাহাদের মস্তিষ্কও তো রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কী বলেন?'

'মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কী? হস্তীর মস্তিষ্কও তো মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারি, তবু তো মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে।'

'ঠিক তো। কিন্তু কী প্রকারে কর্তারা বন্দি হইলেন, এ-কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন, আর বিলম্ব সহে না।'

'স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনাচিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্নকল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভারি আশ্চর্য!' আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, 'এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্নকল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন!'

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

'কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোনোপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি কেবল স্বামিত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারানিকে ঐ আসামি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারানি তো দয়াপ্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

'আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল, রক্তগঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

'কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈ শনৈ পশ্চাদবর্তী হইতে লাগিল এবং শত্রুগণ ক্রমশ অগ্রসর হইল।

'কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর-ভদ্র—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমনকি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর দুই-চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাঁহারা রাজধানী আক্রমণ করিবেন।

'এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কী করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমতো যুদ্ধ করিতে করিতে যাইবেন, অন্যদল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—কারণ একে তো অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন যে, যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

মহারানি বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশরক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্কবলে দেশরক্ষার চেষ্টা করুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে নিরুত্তর, সভাস্থল নীরব। মহারানি মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।'

'এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশাভরসা তো নাই—শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে তো সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রুজয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি এই উপায়ে কৃতকার্য হওয়া না যায়, তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারানির সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিতে পুনঃপুন প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, 'আত্মহত্যা করিব!' সে যেন ততোধিক তোজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না।'

সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং লেডি প্রিন্সিপ্যালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেডি প্রিন্সিপ্যাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পরদার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।' মহারানি উত্তর করিলেন, 'অবশ্য! তাহা তো হইবেই।'

'পরদিন মহারানির আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল যে অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেজন্য সমস্ত নগরে পরদা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

'অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরে ভাবিলেন, মন্দ কী? তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারানির এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত শুভআশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারানিকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনাবাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোনো আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাহাদের এই অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কী হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।'

'অতঃপর লেডি প্রিন্সিপ্যাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমরপ্রাঙ্গণাভিমুখে যাত্রা করিলেন—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'দেশের পুরুষদিগকে তো পরদার অনুরোধে জেনানায় বন্দি করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পরদার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না ভাই! বন্দুক-গুলি তো নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না—অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পরদার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষত তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।'

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম—'হয়তো রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভাদর্শনে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—'।

'তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়—স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে।'

'বটে! কী প্রকারে? আর আপনারা বিনাঅস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?'

'যোদ্ধার সঙ্গে সেই সূর্যোত্তাপ সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনো স্টিমারের সার্চলাইট (Search light) দেখিয়াছেন কি?'

'দেখিয়াছি।'

'তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বি-সহস্র সার্চলাইট ছিল—অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মতো নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। স্টিমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপরশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন—তখন তাহারা হয়তো ভাবিয়াছিল, এ কি ব্যাপার! শত-সহস্র সূর্য মর্ত্যে অবতীর্ণ। সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।'

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, 'যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোনো অনিষ্ট হইত!'

'আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল। তদবধি আর কোনো প্রতিবেশী রাজা-মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।'

'তারপর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?'

'হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে মহারানি সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়ার দোষে সমর বিভাগের কর্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা তো কদাচ কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুরে কারাগারে বন্দি থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় স্ব-স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।'

'মহারানি তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি আবার কখনো রাজকার্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।'

'আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দানা' বলি।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো। কিন্তু এক-কথা—পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি তো 'মর্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার অনাচারের বিচার করে কে?'

'যদবধি 'মর্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোনোপ্রকার পাপ কিংবা অপরাধ হয় নাই, সেইজন্য আসামি গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না—ফৌজদারির মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।'

'তাই তো আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই[৪] শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানি[৫] থাকিবে কিরূপে। যদি কোনো স্ত্রীলোক কখনো কোনো বেআইনি কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করিতে পারেন—অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?'

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রিয় সুলতানা! আপনি এখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?'

আমি সহাস্যে বলিলাম, 'আপনার রান্নাঘরটি রানির বসিবার ঘর অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু কর্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয়তো তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন।'

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্তত উদ্যানের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম—'আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারি আশ্চর্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব—নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন, এক-কথায় যাবতীয় গৃহকার্য করেন। আর রন্ধনপ্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার যে, রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার। ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড়ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধনকার্যে আপত্তি করিতেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ একখণ্ড কাচ (convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচবিশিষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।'

'জানেন ভগিনী সারা। ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না—জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালি লাভে। কোনো দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই—কিংবা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই।'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না।'

'তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন—প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটা সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা—বরং ক্রমশ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি।'

'পুরুষের কার্যে ও রমণীর কার্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম পুরুষেরা কোনো ভালো কাজ সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধহয় এতক্ষণে সে-কথাটা বুঝিতে পারিলেন।'

'হাঁ এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম। আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য করেন কিরূপে?'

'আমরা বিদ্যুৎসাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়—ভারি বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ুশকটও তদ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধ সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।'

'সেইজন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে শকটচক্রে পেষিত হয় না। যে-সব পথ আছে, তাহা তো কুসুমশয্যা বিশেষ। বলি, আপনারা কখনো কখনো অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?'

'দশ-এগারো বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন—উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যকমতো সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। আবার জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বর কৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তবে তো এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়াকলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে সর্বস্বান্ত হয় কি?'

'না ভগিনী। আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারানির সাধ—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন।'

'রানীর এ-আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার। আপনাদের প্রধান খাদ্য কী?'

'ফল।'

'ভালো কথা, আপনারাই তো সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কী করেন?'

'বড় বড় কল কারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন, খাতাপত্র রাখেন—এক-কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে-কার্যে কায়িকবলের প্রয়োজন সেইসব কার্য করেন।'

'আমি হাসিয়া বলিলাম—'ওহ্। তাঁহারা কেরানি মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন।'

'কিন্তু কেরানি ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি। আমরা যে-সকল যন্ত্রের উদ্ভাবন বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ—পুরুষ শরীর, রমণী মন।'

'তা বেশ। কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা এ-কথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র—'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই। আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙাকুলা' মাত্র। আপনাকে আর-একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়িঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা তো বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয় ধারা মনে করি।'

'আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না, এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।'

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ-কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মতো। ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামতো বৃষ্টিজলে স্নান করা যায়। প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গণে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে—আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, 'আপনারা ধন্য। স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী, আর কী চাই! পার্থিব সম্পদে তো আপনারা অতিশয় ধনী, আপনাদের ধর্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

'আমাদের ধর্ম—প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিতে ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্যত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালেভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে...'

'তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?'

'না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীবহত্যায়, বিশেষত মানবহত্যায় আমোদবোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কী অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয় এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।'

'কোনো মিথ্যাবাদীকে কখনো ক্ষমা করা হয় না কি?'

'যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।'

'এ-নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্মই রাজত্ব করিতেছে। ভালো, একবার মহারানিকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।'

'বেশ চলুন। এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একখণ্ড তক্তায় দুখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল। পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন। গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল, কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রৌপ্য-নির্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কোনোদিন ওজন হই নাই, কাজেই নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না, ভগিনী বলিলেন—'আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।'

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি একমণ ষোলো সের হইলাম। শুনিলাম, তিনি আটত্রিশ সের মাত্র। তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোনো গুণে না হউক আমি গুরুত্বে বেশি তো।

তারপর দেখিলাম, ঐ চকচকে গোলার ছোটবড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে-গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোটবড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এইজন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটি পাখার মতো ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ'খানি[৬] ধীরে ধীরে ৭/৮ হাত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল, তারপর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানেবিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেইসঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না—সবে তখতে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলাগতিতে রাজধানীতে উপনীত। সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারানি তাঁহার চারি বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ। তাহার সৌন্দর্যের তুলনা এ-জগতে নাই।

মহারানি দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, 'বা! আপনি এখানে।' ভগিনী সারা রানিকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখতে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারানির সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কী যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, "অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু যে-সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে-সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে, দেশের কোনো কাজ করে না, তাহার বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজকর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোনোপ্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমিজমার প্রতি লোভ করিয়া দুই-দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না, অথবা একখণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না—যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হয়, কিংবা কাহারও ময়ূরসিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

মহারানির নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু সেই আমাদের তখতে রওয়াঁখানি ঈষৎ হেলিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, আমি কী জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনো সেই আরামকেদারায় উপবিষ্ট—!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. বর্তমান লেখিকার Sultana's Dream গত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে Indian Ladies Magazine-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

২. "পরীস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরেজিতে "লেডি ল্যান্ড" বলা গিয়াছে।

৩. হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষণীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই তো মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেঙে ঈর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে-কোনো মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

৪. পুরুষ জাতিকে

৫. পাপ

৬. ইংরেজিতে 'Travelling throne' বলা যাইতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেলিশিয়া-হত্যা[১]

'হত্যা' শব্দ শুনিয়া পাঠিকা ভগিনী ভয় পাইবেন না যে ইহা সত্যই ছোরা তরবারি বা বন্দুক পিস্তল দ্বারা রক্তারক্তিবিশিষ্ট হত্যাকাণ্ড! প্রসিদ্ধা গ্রন্থকর্ত্রী মিস মেরি করেলি 'ডেলিশিয়া হত্যা' নামক এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ডেলিশিয়া কাহিনীর সহিত আমাদের নারীসমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে, গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা
জানিল কী ছলে মেরি করেলি।

অদ্য আমরা ইংল্যান্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন্ সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা—তাঁহাদের আরও কত কী সুখ-সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধকাব্য' নিত্য অভিনীত হয়। রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা!!

সংবাদপত্রসমূহে কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরাজ-দম্পতির প্রতিকৃতি দেখিলে আমাদের মনে হয়—লর্ড অমুক তো বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁধা লাগান, কিন্তু লেডি অমুকের বুকখানি চিরিয়া দেখিলে জানিতে পারিতাম তাহাতে সুখ কতখানি!

গ্রন্থকর্ত্রী মেরি করেলি স্বয়ং অবলা, তাই ডেলিশিয়ার মর্মবেদনা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এবং অবলা পাঠিকারাই সম্যকরূপে 'ডেলিশিয়া বধের' মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই চমৎকার উপন্যাসের অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, তবু উহার গল্পাংশের অনুবাদ পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থকর্ত্রী উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, সামাজিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি 'ডেলিশিয়া' চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সত্য ঘটনা আমাদেরও জানা আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ভারতের সেই প্রপীড়িতা অবলাদের একটি নমুনা (representative) চরিত্রের নাম রাখিলাম 'মজলুমা'। 'ডেলিশিয়া'র প্রতিচ্ছত্রে প্রতিবর্ণে যেন 'মজলুমা'রই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'মজলুমা' চিত্রটি ডেলিশিয়া চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইব—ইংল্যান্ডের নারী-সমাজের সহিত ভারত-ললনা সমাজের কী চমৎকার সাদৃশ্য। আর কোথায় কী প্রকার পার্থক্য আছে, তাহাও দেখা যাইবে।

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুরবন্দিনী নহেন; আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অপরাধে বন্দিনী। কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা। কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারি পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবনসমরপ্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্তঘাতকের করাঘাতে নিহত হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তলহস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, 'তুমি আমার নিকট আর একপদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলি করিব।' অভাগিনী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক—তিনি বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুকাইয়া নাকি কান্না ধরিবেন—বলিলেন, 'প্রভো। দাসীর কী অপরাধ হইয়াছে?' অথবা 'দাসীর প্রতি সদয় হও।' শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণযুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃপুন পদাঘাত লাভ করিবেন—ডেলিশিয়া ও মজলুমায় এই প্রভেদ।

ডেলিশিয়ার আত্মমর্যাদাজ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিতা প্রপীড়িতা হইলেও ডেলিশিয়ার কেমন একপ্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে, অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এদেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, 'তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।' সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারংবার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদলেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ার ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

এদেশের গ্রন্থকারেরা নারীচরিত্রকে নানা গুণভূষায় সজ্জিত করেন বটে; বেশিরভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ-প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!) কিন্তু এসব পুস্তকে নায়িকার আত্মগরিমার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

এখন ডেলিশিয়া কাহিনীর গল্পাংশ অনুবাদ করা যাউক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেলিশিয়া বাল্যকাল হইতে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। যখন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলি পাঠকসমাজে যথেষ্ট আদৃত হইত। এইরূপে প্রতিভাশালিনী ডেলিশিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলেন এবং পুস্তক বিক্রয়ের ফলে যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইসঙ্গে তাঁহার অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হইল। দেশের অপর লেখকবৃন্দ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে পুস্তক রচনা কেবল পুরুষের কার্য। রমণীগণ কেবল নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বিলাসপঙ্কে নিমজ্জিতা থাকিবে। আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে যে-নারীর বয়স নাই, রূপ নাই, যে অতি বিশ্রী কদাকার কুৎসিতা সেই লেখনী ধারণ করুক। ডেলিশিয়ার ন্যায় নিরুপমা রূপসী কিশোরী তাঁহাদের যশোপ্রভা ম্লান করিবে, ইহা যে একেবারে অসহ্য!

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডেলিশিয়ার বিবাহ হয়। এ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিভাশালিনী, অর্থশালিনী, সৌন্দর্যের রানি, ডেলিশিয়া যে অবিবাহিতা ছিলেন, তাহার কারণ প্রধানত এই যে, সাধারণ পুরুষ-সমাজ তাঁহাকে কেমন একপ্রকার ভয়ভক্তি ও স্থলবিশেষে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নিজের বেশভূষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসিনী, সতত পুস্তক রচনায় নিযুক্তা রমণীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্যজীবনে সুখী হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা হয়তো কেহ করিতে পারেন নাই। (আমাদের দেশে তো 'পুস্তক লেখিকা' নাই বলিলেই হয়, তবু 'পুস্তক পাঠিকা'কেও 'নভেল পাণি' জ্ঞানে অনেকে বিবাহ করিতে সংকুচিত হন!)

মিস্টার উইলফ্রেড কারলিঅন উচ্চবংশজাত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। 'ছিল' বলিতে মি. কারলিঅনের ছিল ছয় ফুট দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্তি আর বুনিয়াদি বংশমর্যাদা। আয় এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে। মি. কারলিঅন দেখিলেন, ডেলিশিয়া-শিকার মন্দ নহে। একে তো তিনি আভরণহীনা গোলাপ-মুকুল; দ্বিতীয়ত বিপুল অর্থশালিনী। অবশেষে একদিন ডেলিশিয়ার জন্য সেই শুভমুহূর্ত আসিল—যে মুহূর্ত মানবজীবনে (? না, নারীজীবনে) মাত্র একবার আইসে; যাহা ভগ্ন তরঙ্গের বাষ্পকণার মতো ক্ষণস্থায়ী—যাহা আকাশে উল্কার ন্যায় প্রতিভাত হয়, চাহিয়া দেখিতে-না-দেখিতে চির অন্তর্হিত হয়! ডেলিশিয়ার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আসিল। সেদিন ডেলিশিয়া কোনো বড়লোকের গৃহে নৈশভোজে অতিথি ছিলেন; মি. কারলিঅনও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

'ডেলিশিয়া!' মি. কারলিঅন ডেলিশিয়ার হস্তধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ডেলিশিয়া, আমি তোমায় ভালোবাসি!'

* * *

ডেলিশিয়ার বিবাহের দিন গির্জার বাহিরে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল—একপক্ষে যুদ্ধদেবতা অপরপক্ষে সাহিত্যের দেবী—এ বিবাহকে কার্তিক এবং সরস্বতীর মিলন বলা যাইতে পারে—এ নবদম্পতিকে দেখাই চাই। জনতার অনেকে যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ডেলিশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচরাচর বলা হয় 'বর কন্যাকে বিবাহ করিল.' কিন্তু এক্ষেত্রে বলিতে হইবে—কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কারণ ডেলিশিয়াই মি. কারলিঅনের অন্নবস্ত্র ইত্যাদি জোগাইবার ভার লইলেন! মজলুমার বেলায় আবার এরূপ বলা খাটে না, সে স্থলে বলিতে হইবে—জমিদারি ধনদৌলতসহ দাসী স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন! ফল কথা, ডেলিশিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার স্বামী নিষ্কর্মা (drone) মক্ষীর ন্যায় মধু ভোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন অলঙ্কার বলিতে ডেলিশিয়া একগুচ্ছ সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্পমাত্র পরিয়াছিলেন। উহাতে রমণীমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। নবপরিণীতা ডেলিশিয়ার গায় গহনা নাই। কী আশ্চর্য! ওমা! ঠিক যেন আমাদের নারীসমাজ! ৫/৭ জন প্রবীণা নবীনা একত্র হইলে, তাঁহারা কেবল অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচার করেন। সেই কোনো নববধূতা নববধূ আইসে, উপস্থিত রমণীবৃন্দ অমনি তাহার নাক কান ও গলদেশের খানাতল্লাশি আরম্ভ করে—কোথায় কী গহনা আছে। কর্ণাভরণ দেখিবার জন্য বেচারির কান লইয়া যত টানাটানি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ভারত-বধূর ন্যায় ডেলিশিয়ার কান ধরিয়া টানাটানি হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণকুহর (শ্রবণশক্তি) লইয়া মুখরাগণ যথেষ্ট টানাটানির প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রৌঢ়া মহিলাসমাজ আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, বেচারা কারলিঅন এমন সুশ্রী সুপুরুষ—তিনি বিবাহ করিলেন একটা 'স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রী'কে (female authoress)!

পক্ষান্তরে মি. কারলিঅন বন্ধুমহলে ডেলিশিয়া সম্বন্ধে বলিতেন, 'তিনি স্বাভাবিক গোলাপফুল—কৃত্রিম রঙ, কলপ, পরচুলা (যাহা স্ত্রী-কয়েদিদের মাথা হইতে কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়), এসেন্স পাউডার—এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।'

তচ্ছবনে জনৈক বন্ধু বলিলেন, 'ভাগ্যবান কুকুর (lucky dog)! তুমি এমন পুরস্কারের যোগ্য নহ।'

'সম্ভবত নহি; কিন্তু—' বলিয়া মি. কারলিঅন বন্ধুর দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই চাহনিতেই তাঁহার কথার বাকি অংশ সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ঐ সুন্দর কটাক্ষ-বাণেই তো ডেলিশিয়াকে বিদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুগণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে 'বিউটি কারলিঅন' (Beauty Carlyon) বলিয়া ডাকিতেন।

ডেলিশিয়ার বিবাহ-জীবনের প্রায় তিন বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তিনি সামাজিক আমোদ-উৎসবে বড় একটা যোগদান করিতেন না; অধিকাংশ সময় সাহিত্য-সেবায় যাপন করিতেন। লেখকরা নির্জনতাই ভালোবাসে। যে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বহির্জগতের অন্তঃসারহীন আমোদ-আহ্লাদে বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহে না। উইলফ্রেড কারলিঅন কিন্তু 'বল'নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অসার আমোদ বড় ভালোবাসিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই দুই-তিনটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় ডেলিশিয়ার সুখের বাসায় এক স্ফুলিঙ্গ-অগ্নি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। অগ্নিকণা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দাহক্রিয়া আরম্ভ করিল।

দুই-একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে ঐ অগ্নির বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিলেন, ডেলিশিয়া তাহা শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'লোকগুলো অনর্থক আমাদের দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আনিতে চায়। পরনিন্দা করিয়া উহারা কী সুখ পায়?' তিনি সময়ে সাবধান হইলে হয়তো অভিনয় এতদূর গড়াইত না। স্বামীকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্ধ অনুরাগবশত তিনি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

মি. কারলিঅন একদিন বলিলেন, 'সাহিত্য-সেবিকা মহিলারা কোনোরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বড় অন্যায় এবং দুঃখের বিষয়। যাহা হউক ডেলিশিয়া, আমি তোমাকে একটি উপাধি দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এখন আমি পৈতৃক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।'

ডেলিশিয়া ফাঁকা উপাধি প্রাপ্তিতে হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন :

'প্রভো আমি আপনার দীনতমা সেবিকা।'

লেডি শব্দ কি ডেলিশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করিবে? তিনি লেখিকারূপে যে যশোলাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ লেডি পদবি কী? অমন কত লেডি জগতে অপরিচিত অবস্থায় মরে বাঁচে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু 'গ্রন্থকর্ত্রী ডেলিশিয়া' নামটি অমর থাকিবে।

আর একদিন লর্ড কারলিঅন বলিলেন, 'আমি মনে করি, সেই প্রাচীনকাল ভালো ছিল।'

'বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিত—যেমন গবাদিপশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়'[২]—এবং তাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত—আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত? হইতে পারে, সে-কাল সুখের ছিল, কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই—আমি চাই সভ্যতা—যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।'

* * *

কারলিঅন বলিলেন, 'আমার মতে উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহার গতি মন্দ হওয়ার পক্ষে ভোট দিতে চাই।'[৩]

পরশ্রীকাতর লোকেরা কাহারও সুখ-সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারে না। ডেলিশিয়ার দাম্পত্যজীবন মোটের উপর অত্যন্ত সুখের ছিল—তিনি কেবল একবার একটি শিশুর মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন, এ শোক তো পাবক—ইহাতে হৃদয় পবিত্র হয়। জননীহৃদয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ জ্বালাটুকু ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোনো অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। সাহিত্যজগতেও তিনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এতখানি সুখ হিংসুকের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ছিল। ডেলিশিয়া সংসার চিনিতেন, তাই সতর্কতাবশত লোকনিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি নিন্দুকের মিথ্যানিন্দা এড়াইতে গিয়া বন্ধুর কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ন্যায় সতীলক্ষ্মীর স্বামী পথভ্রষ্ট হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। আহা! তাঁহার কী সরল বিশ্বাস ছিল!

তাঁহার জনৈক বন্ধু মি. পল ভালডিস নানা ইঙ্গিতে ডেলিশিয়াকে সতর্ক করিতে চাহিলেন, তাহাতে ডেলিশিয়া চটিলেন! মি. ভালডিস ডেলিশিয়ার প্রিয় কুকুর স্পার্টানের গায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'লেডি কারলিঅন, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু বলিতে এখন কেবল একজন আছে।'

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনি স্পার্টানের কথা বলেন, না আপনার নিজের?'

ভালডিস বলিলেন, 'স্পার্টানের কথা বলি!'

ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে যখন মি. ভালডিস বলিলেন, লর্ড কারলিঅন নগণ্য—কিছুই নহেন, তখন ডেলিশিয়া বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মি. ভালডিসকে বিদায় দিলেন। তাই তো, পতিপ্রাণা সত্যি কি পতিনিন্দা সহিতে পারেন?

ডেলিশিয়ার ব্যবহারটা যেন স্পার্টানের পছন্দ হইল না—সে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই—'তুমি মি. ভালডিসকে তাড়াইয়া দিলে কেন? তিনি আমার পরম বন্ধু।' ডেলিশিয়া কুকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'স্পার্টান! তিনি আমাদের প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন যে। তাঁহাকে আর আমরা নিকটে আসিতে দিব না।' স্পার্টান কিন্তু কর্ত্রীর এ-কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না।

যাহাদের কবিতা, রচনা প্রভৃতি ডেলিশিয়ার গ্রন্থের ন্যায় আদৃত হইত না, তাহারা হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল। 'বোহেমিয়ান' ক্লাবে ৮/১০ জন ভদ্রলোক। একত্র হইলে তাহাদের অধিকাংশ লোক ডেলিশিয়ানিন্দা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতেন। একজন কবি বলিলেন, 'স্ত্রীলোক এমন লিখিতে পারিবে কেন, অধিকাংশ পুস্তক তাঁহার স্বামী লিখিয়া দেন।' মি. ভালডিস বলিলেন, 'মিথ্যা কথা! তাঁহার স্বামী আপনারই মতো মস্ত গাধা!'

'আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিস্টার ভালডিস! আর আমাকে গাধা বলিতেও ছাড়েন নাই!'

ভালডিস বলিলেন, 'হাঁ! আমি লর্ড কারলিঅনের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দেখিয়াছি; তিনি প্রতি শব্দে বানান ভুল করেন, প্রতিছত্রে ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেন। আপনি যদি মনে করেন যে, এই বিদ্যা লইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর পুস্তক লেখেন, তবে আপনি অবশ্যই গাধা! কিন্তু আপনি বাস্তবিক তাহা মনে করেন না, কেবল একজন মহিলার যশোপ্রভা দর্শনে হিংসাদগ্ধ হইয়া এমন কথা বলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর কবি বলিলেন, 'জানেন মিঃ ভালডিস, লেখনীর ধার অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ!'

ভালডিস তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'ওহো! বুঝিলাম আপনি অর্ধপেনি মূল্যের সংবাদপত্রে আমাকে গালি দিবেন।'

* * *

একদা ডেলিশিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য অনেকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে দোকানে গিয়াছেন। লর্ডের ফরমাইশ ছাড়া আরও বিশেষ কোনো বস্তু ক্রয় করিবারও ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই শুভদিনে তিনি লর্ড কারলিঅনকে কিছু উপহার দিবেন। প্রেম তো অশরীরী, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য জড়বস্তুর অবলম্বনই চাই। পতিব্রতা সতী তাঁহার অকৃত্রিম পতিভক্তি একটি অঙ্গুরীয় বা একসেট বোতামের আকারে স্বামীকে উপহার দিবেন। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিয়া একস্থানে জানালার বাহির হইতে একজোড়া বোতাম দেখিয়া ডেলিশিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বোতাম ক্রয়ের নিমিত্ত ডেলিশিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। মণিকার তাঁহাকে ধনবতী ভাবিয়া সযত্নে অনেক মণিমুক্তার অলঙ্কার দেখাইতে আরম্ভ করিল। ডেলিশিয়া মাত্র সেই বোতাম পছন্দ করিলেন, আর কিছু ক্রয় করিলেন না।

এত অল্প বিক্রয়ের পর জহুরি ক্রেতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সে বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। তন্মধ্যে হীরকখচিত একটি কপোতাকৃতি 'যুগনু'[৫] বড় সুন্দর ছিল। কপোতের চঞ্চুপটে একটি স্বর্ণলিপি এবং সেই স্বর্ণপত্রে একটি শ্লোক (মটো) পদ্মরাগে খচিত ছিল। ডেলিশিয়া সেইটি হাতে লইয়া বলিলেন, 'এ যুগনুটি তো বড় চমৎকার! ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প নৈপণ্য দুই-ই আছে।'

'হাঁ, কিন্তু এটি বিক্রয় হইবে না। ইহা লর্ড কারলিঅনের বিশেষ ফরমাইশ অনুসারে নির্মিত হইয়াছে।'

ডেলিশিয়া ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এবার হয়তো বিবাহের বার্ষিক উৎসবের দিন লর্ড কারলিঅন ডেলিশিয়াকে এই যুগনু উপহার দিবেন; তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই মণিকার যুগনুটি ডিবে হইতে বাহির করিয়া সূর্যকিরণে ধরিল—যাহাতে মণিগুলি বেশ ঝলমল করে! সে ডেলিশিয়াকে চিনিত না। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—

'এ কপোতের জন্য লর্ড কারলিঅনকে পাঁচশত পাউন্ডের কিছু বেশি (প্রায় ৮,০০০ টাকা) দিতে হইবে। তা ভদ্রলোকে যখন কোনো মহিলা-বিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন এরূপ ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে সে মহিলাটি যে কারলিঅনের পত্নী নহেন, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারেন।'

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'আমি সেরূপ কিছু মনে করিব কেন? আমি তো বুঝি ইহাই স্বাভাবিক যে, কোনো ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্মিণীকে উপহার দিবার জন্য এরূপ যুগনু নির্মাণ করাইবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহুরি বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বটে? কিন্তু ফলত আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, যখনই কোনো ভদ্রলোক কোনো বিশেষ ফরমাইশ দেন, সে বস্তু কখনোই তাঁহার ধর্মপত্নীর হাতে পড়ে না। আমরা সর্বদাই ইহাতে দুঃখিত হই যে, আমাদের অতিযত্নে প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ মহিলারা প্রাপ্ত হন না।...নচেৎ এই বহুমূল্য হীরক-কপোতটি কেন লেডি কারলিঅনের নিকট না যাইয়া নর্তকী লা-মেরিনার নিকট যাইতেছে?'

অ্যাঁ। মণিকার এ কী বলিল? ডেলিশিয়ার মাথা ঘুরিয়া গেল!

* * *

শেষে জহুরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি লেডি কারলিঅনের গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়াছেন কি? তিনি সাহিত্যজগতে 'ডেলিশিয়া ভাহান' নামে পরিচিতা।'

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'হাঁ—মনে হয়, পড়িয়াছি।'

জহুরী। তা বেশ। তিনি বাস্তবিক অতি যশস্বিনী রমণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বামী তাঁহার বিষয় একটুও ভাবেন না। ...শুনিতে পাই লর্ড কারলিঅন যে টাকার এমন অপব্যয় করেন, তাহা তাঁহার পত্নীর; তাঁহার নিজের এক পয়সাও নাই। যদি এ-কথা সত্য হয় তবে কী লজ্জাকর বিষয়! অবশ্য লেডি কারলিঅন না-জানিয়াই মেরিনার অলঙ্কারের মূল্য দিয়া থাকেন! ...তবে আপনি এই বোতামজোড়া লইবেন তো?

ডেলিশিয়া। হাঁ, ধন্যবাদ। এগুলি ভদ্রলোককে উপহার দিবার উপযুক্ত।

জহুরী। ঠিক। ইহার কারুকার্যে প্রগলভতা মোটেই নাই, অথচ সৌন্দর্য আছে। ইহা ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু (ঈষৎ হাস্য) 'ভদ্রলোক' ক্রমেই বিরক্ত হইতেছেন।

ডেলিশিয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণিকারের প্রমুখাৎ অনেক কথাই শুনিলেন। যে-কথা তিনি বন্ধুবান্ধবকে বলিতে দিতেন না,—মণিকার সেই-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল!

এই চিত্র বঙ্গললনার কেমন বোধ হয়? ইহা কি দর্পণের ন্যায় মজলুমার মূর্তি প্রতিবিম্বিত করে না? মজলুমার কণ্ঠ হইতে কণ্ঠহার মোচন করিয়া কোনো বিলাসিনীকে না পরাইলে আর পুরুষপ্রবরের বাহাদুরি কী?

বাড়ি ফিরিয়া ডেলিশিয়া তাঁহার স্বামীর টেলিগ্রাম পাইলেন—'ডিনারের সময় ফিরিব না; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।'

ক্রোধে-ক্ষোভে জর্জরিতা ডেলিশিয়া স্বীয় পাঠাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন; সঙ্গে কেবল স্পার্টান ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্পার্টান, মনে হয় আমি যেন বিষ খাইয়াছি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পার্টান সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল,—তাঁহার সেই নির্বাক দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, 'তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর কেন? কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য!'

স্পার্টান ডেলিশিয়ার ভালোবাসার যতখানি প্রতিদান দিতেছিল, লর্ড কারলিঅন ততটুকুও দিতে পারিলেন না! ডেলিশিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন,—তাঁহার কঠোর শ্রমার্জিত টাকাগুলি লা-মেরিনাকে অলঙ্কার পরাইতে ব্যয়িত হইবে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

ডেলিশিয়ার টাকায় ও মজলুমার টাকায় প্রভেদ আছে। মজলুমার যে টাকা অত্যাচারী কর্তৃক অপব্যবহৃত হয়, সে টাকা মজলুমার স্বউপার্জিত নহে,—তাহা তাঁহার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত, অর্থাৎ পুরুষেরই উপার্জিত। একজন পুরুষেরই সঞ্চিত ধন অপর পুরুষে ধ্বংস করে, ইহা বরং সহ্য হয়। কিন্তু ডেলিশিয়ার স্বউপার্জিত টাকায় অপব্যবহার অসহ্য—এরূপ কাপুরুষতা ক্ষমাযোগ্য নহে। এ-বিষয়ে মজলুমার তুলনায় ডেলিশিয়ার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অথচ ইংরাজ সমাজ সভ্যতার দাবি করে! ইহাই কি সভ্যতা? ইহাই কি শিভালরি?

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'আমার একটি প্রতিমা স্বর্ণবেদিতে স্থাপিত ছিল, অদ্য তাহা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছে; মূর্তিটা এখনো ভাঙিয়া যায় নাই, কেবল ভূমিতলে পড়িয়া আছে।'

মূর্তির পতনের সহিত ডেলিশিয়ার প্রেমের মৃত্যু হইল। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস,—ভাবিতে হৃদয় দ্বিধা হয়—কোথায় সে বিবাহের সম্বৎসরিক উৎসব, কোথায় এ প্রেমের সমাধি!

লর্ড কারলিঅন প্রায় ১টায় রাত্রিতে বাড়ি ফিরিলেন। প্রায় সব কক্ষই অন্ধকার দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইলেন। ডেলিশিয়ার অত্যধিক আদরযত্নে তিনি 'আদুরে' হইয়া উঠিয়াছিলেন! এ সামান্য অবহেলায় তাঁহার মানহানি হইল যে! প্রতি রাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া রাখা হইত, অদ্য অন্ধকার কেন? তিনি নিজেই টেলিগ্রামে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে-কথা ভুলিয়া গেলেন! না, তাঁহার ভাবটা এই—'আমি নিষেধ করিলেও ডেলিশিয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

তিনি ডেলিশিয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া সাড়াশব্দ না পাওয়ায়ও বিরক্ত হইলেন। এত শীঘ্র ডেলিশিয়া ঘুমাইয়াছেন? তিনি সর্বদাই প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন, অদ্য এ অনাদর কেন?

তিনি অধীরভাবে পুনঃপুন দ্বারে আঘাত করায় স্পার্টান বিরক্তির সহিত উঠিয়া বলিল, 'গোঁ—!' সে কর্ত্রীর শয়নকক্ষের বহির্দ্বারে শয়ন করিয়াছিল। তাহার বাকশক্তি থাকিলে বোধহয় সে স্পষ্টই বলিত, 'পাজি! তুমি এখানে কেন? কর্ত্রী ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাও তুমি জাহান্নামে!' স্পার্টানের সেই অব্যক্ত গোঙানিতে সত্যই কারলিঅন যেন অপমান বোধ করিলেন! তিনি কুকুরকে ধমক দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্য তাঁহার মনটা খারাপ ছিল,—তিনি জুয়াখেলায় অনেক টাকা (ডেলিশিয়ার টাকা) হারিয়াছেন; লা-মেরিনাও ভালো ব্যবহার করে নাই।[৪] এখন ডেলিশিয়ার দুটি মধুমাখা কথা শুনিলে প্রাণটা শীতল হইত; তা ডেলিশিয়ার যে গাঢ় নিদ্রা—!

পরদিন প্রভাতে ডেলিশিয়া অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, লর্ড তখনো নিদ্রিত। প্রাতঃকালীন মুক্ত বায়ুসেবনে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল; এখন মনে হইল, বন্ডস্ট্রিটে মণিকারের নিকট যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা দুঃস্বপ্ন মাত্র! প্রিয়জনের বিরুদ্ধে কোনো অপ্রিয় কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছে হয় না—লোকে যথাসাধ্য আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া সুখী থাকে! ডেলিশিয়া রমণী বই তো নহেন!

লর্ড সম্মুখে আসিবামাত্র ডেলিশিয়া সুস্মিতবদনে অভিবাদন করিলেন, 'উইল! তুমি এতক্ষণে উঠিলে? গতরাত্রে অনেক বিলম্বে আসিয়াছিলে, না?'

লর্ড কিন্তু এ-কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল অদ্য ডেলিশিয়ার কী যেন নাই! কেন? লর্ড সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কেন? ডেলিশিয়া অতি সাবধানে দূরে দূরে থাকিতেছেন, কেন? ডেলিশিয়ার মৃদুহাস্যটুকুতে যেন প্রাণ নাই! যদিও তাঁহার ব্যবহারের কোনো ত্রুটি ধরা যাইতে পারে না, তবু ডেলিশিয়ার ভাবটা যেন প্রাণহীন বোধহয়।...

লর্ড বলিলেন, 'ডেলিশিয়া! তোমার নূতন পুস্তকের কোনো কোনো অংশ বড়ই আপত্তিজনক হইয়াছে। গতরাত্রিতে একজন আমাকে এই কথা বলিতেছিল!'...

ডেলিশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে সে? আমার রচনার অংশবিশেষ হয়তো তাহার কোনো ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়াছে!'

কারলিঅন। তিনি ফিটজহাফ। তাঁহাকে তুমি জানো। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ভগিনীদিগকে কিছুতেই তোমার পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন না। তাঁহার কথা আমার বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

মি. কারলিঅন কথিত ফিটজহাফ-এর কথাগুলি কি আমাদের সমাজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি নহে? যে-সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সে-সব কাগজ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিমদেশেরও কোনো পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই মহিলা রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না! ক্ষমতা পুরুষের হাতে কিনা! ডেলিশিয়া উত্তরে কী বলিতেছেন, তাহাও মনোযোগপূর্বক শুনুন—

'তুমি তো আমার পুস্তক পাঠ করিয়াছ; কাপ্তেন ফিটজহাফ যে-বিষয়ে আপত্তি করেন, সেরূপ কোনো কথা কি তুমি সে পুস্তকে দেখিয়াছ?'

লর্ড। এখন আমার ঠিক মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাপ্তেন ফিটজহাফ অনেক দিন সমাজের প্রকাশ্য নিন্দাপাত্র ছিলেন; তাঁহার কলঙ্কের কথা ডেলিশিয়া তুলিলেন! এবং তাঁহার ভগিনীরাও সাধ্বী নহেন। এই কাপ্তেন আবার ডেলিশিয়ার গ্রন্থের নিন্দা করেন! 'যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!'

* * *

ডেলিশিয়ার নূতন পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ ৮০০০ পাউন্ডের অর্ধেক লর্ডের নামে জমা করাহইয়াছে। ডেলিশিয়া যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্ধেক স্বামীকে দিতেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে মিসেস ক্যাবেনডিশ ডেলিশিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে নৈশভোজনের এবং ভোজনান্তে সঙ্গীতালয়ে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইনি ডেলিশিয়াকে বাল্যকাল হইতে জানেন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। ডেলিশিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন—যেহেতু ব্যথিতহৃদয়ে নির্জনে দুশ্চিন্তার ভারবহন করা নিতান্ত অসহ্য। ভাবিলেন, এই ছলে কতক্ষণ স্নেহময় বন্ধুদের সংস্রবে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকা যাইবে।

অদ্য শহরে বিজ্ঞাপনের ভারি ধুমধাম,—'প্রজাপতির জন্ম—লা-মেরিনা (অভিনেত্রী)!' লা-মেরিনাকে দেখিবার জন্য হয়তো ডেলিশিয়ার একটু কৌতূহলও ছিল—যাহার জন্য তাঁহার সুখগৃহ দগ্ধ হইতে চলিল—যে তাঁহার ধ্বংসের কারণ তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

যথাসময় ডেলিশিয়া মিস্টার ও মিসেস কাবেনডিশ-এর সহিত সঙ্গীতালয়ে (অপেরা হাউসে) উপস্থিত হইলেন। 'এম্পায়ার' অদ্য লোকে লোকারণ্য। লর্ড কারলিঅনও আসিয়াছেন।

প্রজাপতির জন্ম হইল—এখন লা-মেরিনা প্রজাপতিরূপে নৃত্য করিতেছিল। ডেলিশিয়া দেখিলেন, লা-মেরিনার বক্ষস্থলে কপোত—যাহা তিনি পূর্বদিন বন্ডস্ট্রিটে মণিকারের দোকানে দেখিয়াছিলেন। সেই হীরক-কপোত—কপোতের চঞ্চুপটে সেই পদ্মরাগে লিখিত শ্লোক সুবর্ণলিপি! আর সন্দেহের স্থল কই। আর মণিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় কিরূপে? সেই আলোকমালা পরিশোভিত-রঙ্গালয় সহসা ডেলিশিয়ার চক্ষে ঘোর অন্ধকার বোধ হইল। অকস্মাৎ দারুণ শীতে যেন তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইল!

ডেলিশিয়াকে বিবর্ণা দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা মিসেস ক্যাবেনডিশ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—

'একি ডেলিশিয়া। তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মি. ক্যাবেনডিশের প্রতি) রবার্ট! তুমি ইহাকে একটু বাতাসে লইয়া যাও—ইনি যেন মূর্ছা যাইবেন।'

মর্মাহত ডেলিশিয়া! আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনই ভালো হইব—চিন্তা নাই। বোধহয় এ কামরার গরম আমার সহ্য হইতেছে না। আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায় ডেলিশিয়া। তুমি কক্ষের উষ্ণতায় বিচলিত হইতেছ, না অন্তর্দাহের উত্তাপে?

'এম্পায়ার' হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডেলিশিয়া লর্ড কারলিঅনকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি ভৃত্য রবসনকে দিয়া বলিলেন, 'যেন লর্ড বাড়ি আসিবামাত্রই তাঁহাকে পত্রখানি দেওয়া হয়।'

অতঃপর শয়নকক্ষে গিয়া ডেলিশিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এমিলি, আমি সমুদ্রতীরে যাইব। জিনিসপত্র ঠিক কর যেন আমরা আগামীকল্য দশটার সময় ব্রোডস্টেয়ার্স যাইতে পারি। স্পার্টানকে সঙ্গে লইব।'

এমিলি তাঁহার চুলের বেনি খুলিতেছিল—তিনি (আন্তরিক ব্যাকুলতায় অস্থিরভাবে) হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমিলি সবিস্ময়ে বলিল, 'ও লেডি, আপনার কী হইল?'

'না কিছু নয়' বলিয়া ডেলিশিয়া মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।...

'না এমিলি! ভয় নাই; আমি অসুস্থ নই—কেবল শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি যাও, আমি একা থাকিলে ভালো হইব। দেখিও, তুমি সমুদ্রউপকূলে যাত্রার জন্য সময়ে প্রস্তুত হইবে।'

ডেলিশিয়া 'এম্পায়ারে' যে-দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজে পরিপাক করা মজলুমার সাধ্যাতীত—যদিও ভারত রমণী ধৈর্যগুণে অতুলনীয়া। আর স্বাধীন ডেলিশিয়ার পক্ষে তো ইহা বজ্রাঘাত তুল্য।

ডেলিশিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।—নতজানু হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'ও প্রভো। এতদিনে বুঝিলাম আমি কী হারাইয়াছি। প্রেম আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল—চির অন্তর্হিত হইল! আহা! 'আছে' বলিতে রহিল কেবল যশোরূপ কণ্টক-মুকুট!'

হায়! মজলুমার ন্যায় ডেলিশিয়াও নির্জনে রোদন করিলেন। ইহা অশ্রু, না ভগ্নহৃদয়ের শোণিত ধারা?

'আমি তাঁহাকে বড় ভালোবাসিতাম—তাঁহাকে উপাস্য মূর্তি মনে করিতাম। আমার পাপের (পৌত্তলিকতার) যথেষ্ট শাস্তি হইল।'

আহা প্রেম!—প্রেম কী কোমল আহা! কঠোরস্পর্শে ইহা চিরতরে চূর্ণ হয়! উচ্চ আকাঙ্ক্ষা একবার নষ্ট হইলে আবার জাগিয়া ওঠে—কিন্তু প্রেম—ইহা 'এলো' ফুলের মতো—শত বৎসরে একবার মুকুলিত হয়। এ জীবন লইয়া এখন আমি কী করি?

কী আর করিবে?—মৃত্যু-সাগরে বিসর্জন দাও। তুমি নিজের প্রেমজ্যোতিতে তোমার লর্ডকে জ্যোতির্ময় দেখিতে। কারলিঅন বাস্তবিক জ্যোতির্ময় ছিলেন না। যে নিজে আলোকে থাকে, সে অন্ধকারের কিছু দেখিতে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা! ডেলিশিয়া কী ভুল করিয়াছেন। তিনি স্বামীকে কেমন অনিন্দ্য দেবতা মনে করিতেন। তাঁহাকে কেমন অকপট বিশ্বাস করিতেন। যে মোহিনী-মূর্তিটিকে ডেলিশিয়া অমূল্য ভক্তিরত্নখচিত হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর তাঁহারই নয়নসমক্ষে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! ডেলিশিয়া! তুমি সে পুতুলের ভগ্ন খণ্ডগুলি কুড়াইয়া তুলিও না।...

পৌত্তলিকেরা যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজা করে, তখন তাহাদের বিশ্বাস থাকে যে ইহাতে দেবতা অবতীর্ণা আছেন—পূজা শেষে যখন মনে করে, দেবতা স্ব-স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিমাটি বিসর্জন দেয়। কেবল মাটিজ্ঞানে কে পুতুল পূজা করে? ভক্ত যদি জানিতে পায় সে প্রতিমায় দেবতার পরিবর্তে ভূত-পিশাচ আবির্ভূত ছিল, তবে? তবে আর কি পূজা করিতে পারে? কেবল তাহাই নহে, দেবতা ভ্রমে পিশাচের পূজা করা হইয়াছে, এ চিন্তা—এ লজ্জা অসহ্য!

ডেলিশিয়া কী ভয়ানক প্রতারিতা হইয়াছেন—প্রেমিক স্বামীজ্ঞানে বিশ্বাসঘাতক পিশাচের পূজা করিয়াছেন! কাঞ্চন ভ্রমে কর্দমের আদর করিয়াছেন! এতদিন ভ্রমবশত ডেলিশিয়া শূন্যে যে সুখের অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, অদ্য সে প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে; মর্মাহত ডেলিশিয়া সেই চূর্ণ প্রাসাদের আবর্জনা ও ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা!

ভক্তিভাজন ভক্তির উপযুক্ত নহেন: নরাকারে পিশাচ—এই আবিষ্কারে ভক্তহৃদয়ে যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা ভুক্তভোগী হতাশ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সেরূপ হতাশের বৃশ্চিক দংশন যে সশরীরে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে সে জ্বালা কেমন তীব্র! স্বপ্নরাজ্যে কল্পিত লতাপত্র পুষ্পাবৃত পথে অন্ধভক্ত নিশ্চিন্তমনে চলিতেছিল, সহসা কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া বলিয়া দিল,—ঐ কুসুমাবৃত স্থানে গভীর গর্ত আছে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! সে জাগরণ কী কষ্টকর! জাগিবার পূর্বেই ভক্ত মরিল না কেন? হায় সত্য! এমন সত্য কে জানিতে চাহিয়াছিল? এ-সত্য জানিবার পূর্বে মৃত্যু হইল না কেন? যাঁহাকে ষোলোআনা বিশ্বাস করা গিয়াছিল, তিনি এককড়া বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নহেন, নরদেবতাজ্ঞানে যাঁহার চরণে এতদিন ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দান করা গিয়াছিল, তিনি নরপশু—এ আবিষ্কার ভক্তের অসহ্য।

হায়? এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিতা হওয়া গিয়াছিল! ঈশ! কী যন্ত্রণা! ডেলিশিয়া, তুমি যে-দেবতার আরাধনা করিতে, তিনি সৈনিক বিভাগের 'গার্ডস অফিসার ও ভদ্রলোক' মাত্র—আর কিছুই নহেন!

অবিশ্বাসীকে পশু বলিলেও ঠিক হয় না। কোন্ পশু তেমন নীচ? সিংহ শার্দূল বলিলে 'বীর' বলিয়া প্রশংসা করা হয়; কুকুর বলিলে অতি কৃতজ্ঞ অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয়; অশ্ব? সেও অপেক্ষাকৃত ভালো; গর্দভ? সে বোকা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়; মহিষ, গণ্ডার, শূকর—না, মানুষের তুলনায় কোনো জন্তুই নিকৃষ্ট নয়! কোনো পশুই ভক্তহৃদয় পদদলিত করে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য অবলাহৃদয় দগ্ধ হইল বা চূর্ণ হইল, তাহাতে কর্তাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; প্রপীড়িতার নীরব যন্ত্রণার তপ্তদীর্ঘনিশ্বাসে ক্ষমতাশালী পুরুষের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু বলি, অকপট ভক্তির কি কিছু মূল্য নাই? সেই অমরবাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তি হারাইয়া—বেদিভ্রষ্ট হইয়া প্রভুরা কি বড় সুখে থাকেন? মজলুমা অত্যাচারীর অন্ন-বস্ত্র বন্ধ করিতে পারে না সত্য; অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ধভক্তি ফিরাইয়া লইতে পারে তো? মানসদেবতাকে ঘৃণা না করিলেও দয়ার পাত্রজ্ঞান করিতে পারে তো? অবলার কৃপাপাত্র হওয়া কি সবলের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়?

ডেলিশিয়া অব্যক্ত যাতনায় পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিতে ছিলেন! তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যেন উচ্চারিত হইতেছিল—

বড় ভালো বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম
ভালো প্রতিদান নাথ! পাইলাম তার!

আবেগের উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রোরুদ্যমানা ডেলিশিয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলেন।

মজলুমা! ডেলিশিয়ার বিলাপ কি আপনারই হৃদয়বিদারী বিলাপের প্রতিধ্বনি নয়? ডেলিশিয়ার দগ্ধ প্রাণের হা-হুতাশ কি আপনারই হতাশ প্রাণের হা-হুতাশের অনুরূপ নয়? প্রভেদ এই যে, ডেলিশিয়ার স্বামীর অত্যাচারকে চুরি বলা যাইতে পারে, আর মজলুমার স্বামীর অত্যাচার ডাকাতি!

লর্ড কারলিঅন আইনের বিষয় অবগত ছিলেন—তিনি জানিতেন, আইন তাঁহারই অনুকূলে!—নারীহন্তা ভদ্রলোকের জন্য কোনো দণ্ড নাই। ডেলিশিয়া যদি 'তালাকপ্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন?—তিনি কি 'তালাক' পাইবেন? না। কারণ তিনি লর্ডের নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করিতে পারেন না; এমন একটা কেন, এক ডজন মেরিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আইনের চক্ষে অত্যাচার নয়। সহধর্মিণীর অর্জিত টাকা মেরিনার জন্য অপরিহার্য করাও আইনমতে দোষ নয়! তালাক লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণ করিতে হইবে—স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিককাল হইতে তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন; ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন না। 'ডেলিশিয়া আমা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না'—এ কথা (আইনের এই ধারা) স্মরণ করিয়া কারলিঅন অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। হায়রে আইন! পুরুষরচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি! অবলাহৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটি করা—তাহাকে জীবন্তে হত্যা করা আইনানুসারে অত্যাচার নয়!

ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আসিয়া ডেলিশিয়াও সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। কাহাকে শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন-জখম করিলে, অপরাধীর শাস্তি আছে; কিন্তু রমণীহৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে রমণীপ্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে কোনো দণ্ড নাই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই বলি', ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'তিনি যদি আমাকে প্রহার করেন কিংবা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছোড়েন—তবেই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি–নচেৎ না।'

অপরাহ্ণে সমুদ্রতীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ডেলিশিয়া তাঁহার ভগ্ন পুতুলের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিমা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বেদিতে তাঁহার স্থিতিচিহ্ন এখনো বর্তমান! ফুল ঝরিয়া যায় কিন্তু বৃন্তস্থলে তাহার অবস্থিতির চিহ্ন বিদ্যমান থাকে! সব যায়—কেবল স্মৃতিযন্ত্রণা থাকে। অনিবার অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না—ডেলিশিয়ার নয়নদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—গগন, সৈকত, সাগরের বীচিমালা—এসব কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমন সময় স্পার্টান সানন্দে ডাকিয়া উঠিল এবং কে একজন বলিল—

'লেডি কারলিঅন, আপনার সঙ্গে দুই-চারিটি কথা বলিতে পারি কি?'

ডেলিশিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মি. পল ভালডিস।

যেদিন ডেলিশিয়া ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আইসেন, তাহার পূর্বদিন 'অনেসটি' নামক সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি ডেলিশিয়ার অতি জঘন্য মিথ্যানিন্দা লিখিয়াছিল। পল ভালডিস সে লেখককে যথেষ্ট কশাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি ডেলিশিয়াকে এই শুভসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছেন!

অন্যমনস্ক থাকাবশত ডেলিশিয়া প্রথমে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরে সহাস্যে বলিলেন, 'সংবাদপত্রের মতে যিনি একাধারে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার ও মিল্টন—ওহো! সেই ব্যক্তিকে আপনি প্রহার করিয়াছেন!'

ভালডিস বলিলেন, 'লেডি কারলিঅন, আপনাকে বড়ই বিমর্ষ দেখায়।'

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। আমি বড়ই বিষণ্ন—আমি আমার স্বামীর প্রেম হারাইয়াছি।'

'তবে আপনি সবই শুনিয়াছেন।'

'কী! কেবল আমি ব্যতীত শহরের সকলেই এ-কথা জানে নাকি?'

'বলুন তো ইহা কি সম্ভব যে লর্ড কারলিঅন এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্যে লা-মেরিনার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত নহেন; এইরূপে তাঁহার পত্নীকে সমাজের বিদ্রূপ ও দয়ার পাত্রী করিয়াছেন?'

এ-দেশে তো স্বামীর অধঃপতনের জন্য স্ত্রীকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না বরং স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে স্বামীর লজ্জা হয়। ইংল্যান্ডে স্বামীর পতনে স্ত্রীও অপমান বোধ করেন। এ-দেশে ও সে-দেশে এ-এক প্রভেদ।

ভালডিস উত্তর করিলেন, 'লেডি কারলিঅন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যখন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম যে আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, সেদিন আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সেরূপ করা আপনার অন্যায় হইয়াছিল আমি এরূপ বলি না। আপনি পতিপ্রাণা সতীর উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। এখন আপনি সবই জানিতে পারিয়াছেন—'

'এখন আমি জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিয়া ফল কি, আমি কী করিতে পারি? স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অবলার কোনো উপায় নাই। আমি প্রহারচিহ্ন দেখাইতে পারি না—তাঁহার কোনো দুর্ব্যবহার প্রমাণিত করিতে পারি না! আইন বলিবে, ফিরে যাও বোকা মেয়ে! তোমার স্বামী যাহাই করুন না কেন, তিনি যদি তোমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করেন, তবে তুমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পার না! ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এ উক্তি ইংরাজ ললনার।—কী বুকভাঙা কথা! যে অনলে মজলুমা দগ্ধ হন, সেই অনল ডেলিশিয়াকেও দগ্ধ করে!

ডেলিশিয়া আবেগভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'পল ভালডিস! আপনি থিয়েটারে আবেগের অভিনয় করিতে পারেন, *দুঃখের স্বরূপ অনুকরণ করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কোনোকালে অবলার ভগ্ন হৃদয়ের অসহ্য মূক যন্ত্রণার ভয়াবহ গভীরতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? না আমার বিশ্বাস, আপনার অতি সুন্দর কল্পনাশক্তিও ততদূর পৌঁছিতে পারে না! আপনি জানেন, আমি কেন সহসা এখানে—এই সাগর তীরে আসিয়াছি? আমি জানি, আমার যন্ত্রণা দুর্বহ হইলে এই শান্তশিষ্ট সমুদ্র আমাকে তাহার অতলবক্ষে স্থান দিতে আপত্তি করিবে না! কিন্তু না, আমি ডুবিব না! কিন্তু আপনি জানেন? আপনি অনুমান করিতে পারেন, কেন আমি অদ্য আমার স্বামীর সহিত দেখা না করিবার অভিপ্রায়ে এখানে চলিয়া আসিয়াছি?...আমার আশঙ্কা ছিল, দেখা হইলে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম!

* * *

ডেলিশিয়া নিভৃতে চিন্তা করিতেছেন, এখন কী করা কর্তব্য? পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া নিত্যনূতন জ্ঞানার্জন করিবেন; অথবা অবিশ্রান্ত ভ্রমণে যদি শরীর অবসন্ন হয়, তবে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডস্থিত নির্জন প্রদেশে অথবা আয়ারল্যান্ডের মনোরম উপত্যকায় একটি বাড়িতে থাকিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিবেন।

তাহাতে সমাজ ভালোমন্দ বলিবে—'লেডি কারলিঅনের নির্জনবাসের কারণ কী? হয় তো তাঁহাদের কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে।'

তাই তো! যতদিন আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাদের পদলেহন করিতে পার, ততদিন তুমি ভালো। যদি তুমি আত্মগরিমা প্রকাশ কর, আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া উকিল-মোক্তারের সহিত পরামর্শ কর, স্বাধীনতার ভাব দেখাও, আত্মীয়দের সহিত বনে না বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকো—তবে কি আর রক্ষা? তবে সমাজের মতে তুমি অধঃপাতে গিয়াছ! ডেলিশিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, 'এ জীবন লইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমি কী করি?' বিধবা হইলে সমাজে গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্বে ভারতললনা মৃতস্বামীর চিতায় প্রবেশ করিয়া আত্মঘাতিনী হইত। ডেলিশিয়াকেও জীবনভার লইয়া বেশিদিন ভাবিতে হয় নাই, তিনি শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন!

যে-দিন 'এম্পায়ারে' লা-মেরিনার বক্ষে কারলিঅন প্রদত্ত প্রেমচিহ্ন দেখিয়া আসিলেন, সেইদিনই ডেলিশিয়ার প্রকৃত মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু ও প্রেমের মৃত্যু একই কথা। জীবন্মৃতা ডেলিশিয়া তবু-যে দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা কেবল জীবনের এক গুরুতর কর্তব্যপালন বাকি আছে বলিয়া।

ডেলিশিয়া ১৫ দিন পরে ব্রোডস্টেয়ার্স হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্য রবসনের প্রমুখাৎ স্বামীর অনেক কলঙ্ক-কথাই শুনিলেন। ক্রোধে-লজ্জায় ডেলিশিয়ার দেহলতা কম্পিত হইল—তাঁহার নিজের মৃত্যুও তাঁহাকে দয়ার পাত্রী ভাবিল। রবসনের কথার ভাবে করুণা ছিল! সমবেদনা ছিল!!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য ডেলিশিয়া শয়নকক্ষে গেলেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপাধানের প্রতি চাহিয়া ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'আমার এই উপাধানে লা-মেরিনার মস্তক ন্যস্ত হইয়াছিল?' শয্যার নিকট যাইতে তাঁহার মনে হইল যেন একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সেই যন্ত্রণায় ডেলিশিয়া মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তাঁহার পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া এমিলি দৌড়িয়া আসিল।[৫] ডেলিশিয়া চক্ষু মেলিলে দেখিলেন, এমিলি তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত।[৬]

গৃহে লর্ডের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই ডেলিশিয়াকে সন্ধ্যায় লেডি ডেক্সটারের নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। তথায় স্বকর্ণে স্বামীর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাইলেন। অবশ্য ডেলিশিয়াকে না দেখিয়াই তিনি নিন্দা করিতেছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে ডেলিশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কঠোর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন! মুহূর্ত পরে তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। লেডি ব্রানসুইথ (ইঁহারই সঙ্গে কারলিঅন আলাপ করিতেছিলেন) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনি কে?'

কারলিঅন কিঞ্চিৎ ভীতভাবে বলিলেন, 'উনি ডেলিশিয়া—আমার স্ত্রী।' লেডি ব্রানসুইথ বলিয়া উঠিলেন, 'তিনি! সেই সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা! আমার ধারণা ছিল না যে তিনি এমন সুন্দরী। তিনি সে-সব কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন।'

* * *

সে রাত্রি লর্ড কারলিঅন গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র রবসন তাঁহাকে জানাইল যে, কর্ত্রী তাঁহার জন্য পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

ডেলিশিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে লর্ডের যেন হৃৎকম্প হইল। দ্বারের পরদার নিকট দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন! (যেন রানির সম্মুখে খুনি আসামি—বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড আরম্ভ করিলেন, 'ডেলিশিয়া, আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি—'

ক্রোধে ডেলিশিয়ার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'থামো, আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই! এখন আমি তোমার নিজ মূর্তি দেখিয়াছি—তোমার সে মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে; মুখোশটা আর তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা!'

প্রভু স্তম্ভিত হইলেন, একটু হাসিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

ডেলিশিয়া তাঁহার নিকট স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'আজি রাত্রে তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ।[৭]'

'আমি তোমাকে বলি নাই' লর্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, 'আমি বলিয়াছি, প্রায় সকল বিদুষী নারীই রমণীসুলভ কোমলভাব হারাইয়া থাকে।'

'ক্ষমা কর,' ডেলিশিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, 'তুমি বলিয়াছ, স্ত্রীলোকেরা যাঁহারা পুস্তক লিখেন, যেমন আমার স্ত্রী'; ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছ।[৮] যৎকালে আমি পরম আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপাসনা করিতেছিলাম, তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছিলে! তুমি এইরূপে আমাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিলে!'

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার বক্তব্য এই—এখন হইতে আমরা স্বতন্ত্র থাকিব। কারণ আমি অভিনেত্রীদের অলঙ্কারের ব্যয়ভার বহন করিতে চাই না। আর তোমার বদান্যতা—অর্থাৎ লেডি ব্রানসুইথের 'বিল' শোধ করার ইচ্ছাও আমি অনুমোদন করি না।"

* * *

শেষে কারলিঅন বলিলেন, 'ডেলিশিয়া তুমি কী প্রলাপ বকিতেছ! তুমি বাস্তবিক স্বতন্ত্রবাসের ইচ্ছা কর না? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কী করিবে?

'আমি জীবিত থাকিব, অথবা মরিব, সেজন্য ভাবি না।'

লর্ড ভাবিলেন, এখন বোধহয় ডেলিশিয়ার রাগ কম হইয়াছে। তাই তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

ডেলিশিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, 'সাবধান। আমার নিকট আসিও না—'

লর্ড একটু হাসিলেন, 'তুমি পাগল হইয়াছ ডেলিশিয়া? পিস্তলটা রাখো; বোধহয় ওটা ভরা নয়। তবু তোমার হাতে পিস্তল ভালো দেখায় না।'

'না, ভালো তো দেখায় না; কিন্তু পিস্তলটা ভরা! তোমার আসিবার পূর্বেই আমি এটা ভরিয়া রাখিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আর একপদ অগ্রসর হও—আমি তোমাকে গুলি করিব!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেলিশিয়া শেষ বিদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, 'বিদায় উইল! আমি তোমাকে বড় ভালোবাসিতাম। কিছুদিন পূর্বে তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব ছিলে;— সেই প্রেম, যাহা অকস্মাৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে—মরিয়া গিয়াছে, তাহারই খাতিরে এখন আমরা শান্তির সহিত বিদায় লই।'

কিন্তু লর্ড ডেলিশিয়ার হস্তস্পর্শ করিলেন না; তিনি এত শীঘ্র বিদায় লইবেন না। তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন!

ডেলিশিয়া আর কিছু না বলিয়া লিখিতে বসিলেন।

'তুমি শুনিতেছ?' লর্ড পুনরায় বলিলেন, 'আমি বিদায় গ্রহণ করিব না।'

ডেলিশিয়া নিরুত্তর। তিনি নিজে স্থির ছিলেন, কেবল তাঁহার লেখনী নড়িতেছিল।

লর্ড কারলিঅন বলিলেন, 'গভর্নমেন্ট স্ত্রীলোকের বেশি স্বাধীনতায় বাধা দিয়া ভালোই করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছামতো সব অধিকার তোমরা পাইতে, তবে তোমাদের অত্যাচারের সীমা থাকিত না। রমণীর উচিত নম্র শান্ত হওয়া; যদি সৌভাগ্যবশত তাহারা ধনবতী হয়, তবে সে টাকা তাহাদের স্বামীদের উপকারের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাই সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক নিয়ম—রমণী পুরুষের সেবিকারূপে সৃষ্ট হইয়াছে—যখন সে তাহা (দাসী) হইতে চায় না, তখনই গোলমাল হয়।'

বাহবা! যদি ইংল্যান্ড-নিবাসীর এই উক্তি, তবে আর আমরা গোটাকতক ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত লোকের সংকীর্ণচিত্ততা দেখিয়া আশ্চর্য হই কেন? যাহারা বিলাতি বিদ্যালাভের নিমিত্ত সে দেশে যান, তাঁহারা দুই-চারিটা 'কারলিঅন'-এর সংস্রবে পড়িয়া বিষাক্ত হন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই তো গভর্নমেন্ট কেন স্ত্রীলোকগুলিকে কামানে উড়াইয়া দেন না? অতগুলি গোলাগুলি কামান-বন্দক আছে কিসের জন্য? অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় অবলাকে একটা বারুদের ঘরে বন্ধ করিয়া বারুদে আগুন দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়! তাহা হইলে আর 'ডেলিশিয়া ট্রাজেডি' বা 'মজলুমা-বধ-কাহিনী' লিখিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না!![৮]

সুখের বিষয়, ইংল্যান্ডে 'কারলিঅন'-এর সংখ্যা (দুই-এক শতের) অধিক নহে। যেখানে কারলিঅন হেন নীচাশার কাপুরুষ আছেন, সেখানে মি. ক্যাবেনডিশ ও পল ভাল্‌ডিসের ন্যায় মহানুভব লোকও আছেন। মোটের উপর সহৃদয় পুরুষই বেশি। এবং আমাদের দেশেও (অধিক না হইলেও) অল্পসংখ্যক মহাশয় পুরুষ আছেন। বিশাল কণ্টক-অরণ্যে যে মুষ্টিমেয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।'

ডেলিশিয়া তবু কিছু না বলিয়া পূর্ববৎ লিখিতে থাকিলেন।

পরিশেষে লর্ড বলিলেন, 'আমি এখন শয়ন করিতে যাই; শুভরাত্রি, ডেলিশিয়া!'

এবার ডেলিশিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শুভরাত্রি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তাঁহাদের শেষ বিদায়! এই শেষ দেখা! কারলিঅন চলিয়া যাইবামাত্র ডেলিশিয়া উঠিয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ জ্বরের উত্তেজনায় রোগী একরূপ সবল থাকে; যেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, সেদিন রোগী হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ লর্ড কারলিঅন উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধ-খেদের উত্তেজনা ছিল, ততক্ষণ ডেলিশিয়ার হৃদয় সবল ছিল; কারলিঅন চলিয়া গেলে পর ডেলিশিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িলেন—ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তিনি মূর্ছিত হইলেন।

পরদিন ডেলিশিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি ভগ্নহৃদয়, ভগ্নশরীর লইয়া সমস্ত দিন শয়নকক্ষেই থাকিলেন। সেইদিন প্রাতে কারলিঅন প্যারিস যাত্রা করিলেন। তিনি যাত্রাকালে ডেলিশিয়াকে ছোট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন-ডাকে একরাশি পত্র আসিয়াছিল, সে-পত্রগুলি পাঠকালে ডেলিশিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

'তাহারা (পত্র লেখকেরা) জানে না যে আমি মরিয়াছি!'

ডেলিশিয়া চরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই—সমাজ এবং আইন তাঁহার প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার পবিত্র হৃদয় কত উচ্চ। —তাঁহার মনোভাব যে কী মহান—যে ব্যক্তি লা-মেরিনাকে ভালোবাসেন, তাঁহার ভালোবাসায় ডেলিশিয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বামীকে এ-কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন—'তোমার যে হস্ত লা-মেরিনাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে কলুষিত হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।'

কেহ বলিতে পারেন যে, ডেলিশিয়ার অর্থবল ছিল বলিয়া তিনি স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিলেন; স্বামীর অন্নাশ্রিতা হইলে ওরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা তেজস্বিনী ডেলিশিয়ার যে আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হইলেও পৃথক হইতেন। তিনি লর্ড কারলিঅন-এর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোনো স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতেন; কিংবা কাহারও বাড়িতে গবর্নেস হইতেন অথবা কোনো আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন। স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, জীবনের যে কয়টা দিন যাপনের জন্য ডেলিশিয়া উপার্জনের কোনো পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া লইতেন। ইচ্ছা অতিপ্রবল থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

ডেলিশিয়ার এই ভাব—এই মৃত্যু সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় সমরশায়িনী হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ জগতে কখন কোন্ ভালো কাজটি হইয়াছে।[৯]

ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচি লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মতো বীর নারী হইতে পারিবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর পূর্বে ডেলিশিয়া উইল করিলেন, যেন তাঁহার স্বামী আজীবন মাসিক তিনশত টাকা (বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড) বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ছয় লক্ষ (৬,০০,০০০) টাকা দীনদুঃখীদের দান করা হইল এবং ভবিষ্যতে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের টাকাও অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইবে।

লর্ড কারলিঅন প্যারিসে থাকিতেই ডেলিশিয়ার মৃত্যু হইল। তিনি হৃদরোগে (হৃৎপিণ্ড সহসা স্তম্ভিত হওয়ায়) মারা গিয়াছেন।

ডেলিশিয়া-হত্যা কাহিনীর এই শেষ কী দারুণ নৈরাশ্য! হতাশপীড়নেই ডেলিশিয়ার জীবনরবি মধ্যাহ্নে অস্ত গেল—পূর্ণ বিকাশের সময় কুসুম শুকাইয়া গেল!

এইরূপ কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃতকোণে নিহতা হন, কে তাঁহার সন্ধান লয়? সে তাপদগ্ধা অভাগিনীদের উদয়বিলয় কোনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না।

দাম্পত্যজীবনের অবস্থা যাহাই হউক, ডেলিশিয়া সামাজিক জীবনেও সুখী ছিলেন না। ডেলিশিয়া সমাজে যথেষ্ট আদরপ্রাপ্তা হন নাই কেন? যেহেতু তিনি নিজে ভালো লোক ছিলেন! যেহেতু তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা ছিলেন! সাহিত্যক্ষেত্রে যশোবিজয়ে লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকের এতটা আকাঙ্ক্ষা—ইহা সমাজের অসহ্য। শেষে সান্ত্বনালাভের জন্য সমাজ বলিত, 'অধিকাংশ রচনা কারলিঅন লিখেন।' লেখার সুখ্যাতিটা নিতান্ত না দিলে নয়—তবে তাহা ডেলিশিয়াকে না দিয়া কারলিঅনকে দেওয়া যাউক!

ডেলিশিয়ার জন্য অকপট হৃদয়ে শোক করিল কে?–স্পার্টন। কুকুর স্পার্টানের বাকশক্তি থাকিলে সে বলিত–'যদি সত্য, বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধভক্তি সদগুণ হয়, তবে কুকুর পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ!'

এ-কথার উত্তরে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃসমাজ কী বলিতে চান? এ উক্তি একজন ইংরাজ মহিলার। তাঁহাকে কিছু বলা এ-দেশীয় কর্তাদের ক্ষমতাতীত! কিছু বলিলেও ইহাদের কণ্ঠস্বর সাত সমুদ্র পার হইয়া লেখিকার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে না। তবে আর কী করিবেন ভ্রাতৃগণ! নীরবে রোদন করুন!

পাঠিকা! এ দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন জানি, কিন্তু তবু আপনাকে 'ডেলিশিয়া-হত্যা'র শেষ উক্তিটি না-শুনাইয়া ছুটি দিতে পারি না! শেষ কথার ভাবার্থ এই—

পৃথিবীর রাজা-মহারাজার নিকট ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে একদিন স্বয়ং সর্বশক্তিমান বিশ্বপতি সুবিচার করিবেন—তখন তিনি সতীসাধ্বী অবলার প্রতিবিন্দু অশ্রুর জন্য, রমণীর নীরব যন্ত্রণার প্রত্যেকটি দীর্ঘনিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীকে শাস্তি দিবেন। আমাদের এই একমাত্র ভরসা, এই আশায় বিশ্বাস করিয়া আমরা ধৈর্যধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিব—নতুবা (যদি ঐ বিচারের আশা না থাকে) মনে করিতে হয়, ঈশ্বর নিজেই এবং জগৎ তাঁহার নরক![১০]

কথা কয়টি বড় নৈরাশ্যে বুক ভাঙিয়া উচ্চারিত হইয়াছে! আহা!

টীকা

১. প্রকৃত উচ্চারণ 'ডিলিশিয়া', কিন্তু বঙ্গভাষায় 'ডেলিশিয়া' শ্রুতিমধুর বোধহয় বলিয়া আমরা 'ডেলিশিয়া' লিখিলাম।

২. মিস করেলি সম্ভবত কখনো ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তাই তিনি চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রমণীদের অবস্থাকে 'অতীতকালের' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আমরা অন্তঃপুরকে 'খোঁয়াড়' বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়—Fact is Fact!

৩. সময়ের প্রতি যে কাহারও ভোটের অপেক্ষা করে না, তাই রক্ষা। ইংলিশম্যানের যখন এইমত, তবে আর ভারতবাসীর নিকট কী আশা করিব?

৪. আমাদের দেশে পাচনরি বা সাতনরি মুক্তামালার মধ্যস্থলে যে জড়াও 'ধুকধুকি' থাকে তাহাকে Pendant বলা যাইতে পারে, কিন্তু Pendant বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে বেহার অঞ্চলে 'যুগনু' বলে। বঙ্গদেশে কেবল 'ধুকধুকি' নিজে কোনো অলঙ্কার নয়; বেহারে কিন্তু 'যুগনু' নিজেই একটি অলঙ্কার। এইজন্যে আমরা 'যুগনু' শব্দ ব্যবহার করিলাম।

৫. লা-মেরিনা মাতাল হইলে তাহার প্রণয়ীদিগকে বোতল ছুড়িয়া মারিয়া থাকে। অদ্য লর্ড কারলীঅন তাহার মাতলামির আস্বাদ পাইয়া আসিয়াছেন।

৬. মি. পল ভালডিস থিয়েটারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

৭. "Murder of Delicia"র ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—Edward Fitzgerald wrote of one of England's greatest poets thus Mrs. Barrett Browning is dead. Thank God we shall have more "Aurora Leighs!" It is the usual manner assumed by men who have neither the brain nor the feeling to write an 'Aurora Leigh' themselves."

৮. উপক্রমণিকায় ঐ ভাবের কথা আছে।

৯. শেষ উক্তিটি এমনই মর্মস্পর্শী যে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না "Not a tear, not a heart-throb of one pure woman wronged shall escape the eyes of Eternal justice, or fail to bring punishment upon the wrong-doer! This we may believe-this we must believe,...else God Himself would be a demon and the world His Hell!."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানফল[১]

[রূপকথা]

আদম ও হাভা পূর্বে ইডেন-উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন; তাঁহাদের কোনো অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদম দম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরানমণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়নকরত একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাঁহার বড়অঙ্গে একখানি চীর পর্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন একপ্রকার অভিনব মর্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।—এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন অলস জীবন—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন তিনি রাজবন্দি, এই ইডেন-কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (সুরকি মসলার স্থলে) প্রবাল মুক্তাচূর্ণ নির্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ 'আপন' বলিতে এক কড়ার জিনিস তাঁহার নাই—এমনকি পরিধানের একখণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গসুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল—জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল! তিনি হাভাকে বলিলেন, 'এতদিন কী মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম!'

হাভা উত্তর দিলেন, 'তাই তো। এই-যে সৌন্দর্যের লীলাভূমি—সুগন্ধি জাফরান কুসুমশয্যা যাহাতে দুর্বারূপে বিরাজমান; এই-যে হীরক-প্রসূন ভূষিতা ললিতা বল্লরী;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে মরকত কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষপদ্মরাগ ফুল—ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দপ্রতিম অমিয় বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এসব স্বর্গীয় ঐশ্বর্য আমাদের কী প্রয়োজন? কোনো এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

পরমেশ্বর উদ্যানভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদম দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায়, বিভু সমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দূর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ স্বাধীনতায় কত সুখ!'

আদম দম্পতি সেই দিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা অভাব-স্বচ্ছন্দ, শোক-হর্ষ-রোগ, আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্যজীবন লাভ করিলেন। হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালোবাসিতেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন। কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে, সুখে শান্তিতে গৃহে অবস্থিতি করিবে; প্রেমের অক্ষয়ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না-থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোনো বর দান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে একগুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ু হয় চতুর্গুণ! আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে একগুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ। স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাঁহারা যুদ্ধচ্ছলে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে!

স্বর্গচ্যুত হাভা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যে-জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখাটি ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ব ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্বারা উদরপূর্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্তী শান্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল!

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরের পরপারে পরীস্থান।

পরীস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না; সে দেশে কেবল মাকালের বন; উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ[২] নানা কৌশলে অতি যত্ন পরিশ্রমেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্কশ অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরীগণ অমরাবতীতুল্য বিলাসভবনে বাস করে, নানাপ্রকারে পরীগণ বিলাস-সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে; তাহাদের ঐশ্বর্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায়! বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার!

একবার কতিপয় জিন অবগাহনকালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের লবণাম্বু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞাতরূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অন্নচিন্তারূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্যচক্ষে তাহারা পথ দেখিতে পাইল।

সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনকদ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল। কনকদ্বীপে একজাতি সুবর্ণকায় মানবের বসতি ছিল।

কনকদ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন-বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের দেশের মতো ঐশ্বর্যশালী দেশ আর নাই, তাহারা 'ধুলামুঠা ধরিলে, সোনামুঠা' হয়। কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা! এখানে নানাজাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি লোকেরা প্রধানত ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন-বণিক মনে করিল, কোনোরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনকদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোনামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র লইল। এইরূপে প্রতি বৎসর মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্রপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনকদ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

পর বৎসর বণিকেরা বিপণিতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ! তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—'ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না।' অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না; অপিচ ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক-বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, 'এ কী রঙ্গ! আমরা এই কৃষকশিশুদের তামাশার বিষয় হইলাম দেখি!'

যাহা হউক, কোনোপ্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, 'আহা! দাও, ওরা ক্ষুধার্ত। আমাদের এত ধান আছে!'৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত পরীস্থানে প্রতিবৎসর বাণিজ্যতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোনোপ্রকার ক্লেশ নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময়-সময় কনকদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনকদ্বীপবাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল। বাকি রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ!

পূর্বে দুই-একখানা জাহাজে বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত, পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন-চারিবার কনকদ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানি হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে, কৃষক আর কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না, ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল বিনিময়ে বিক্রয় করে। সুতরাং কনকদ্বীপে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল।

এই মাকাল-বাণিজ্যের সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট সাগরতীরে একটি অপরূপ পেয়ারাগাছ হইয়াছিল। জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞানফলের গুণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জিনপরীগণ ঐ পেয়ারা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে জাহাজে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরুচূড়া হইতে গোটাকত পেয়ারা জাহাজে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনকদ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।

কনকদ্বীপবাসী দুই-চারিজন ভাগ্যবান ব্যক্তি পরীস্থান হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজ কনকদ্বীপেও পেয়ারাগাছ হইল। ক্রমেই শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

* * *

পেয়ারা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনকদ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্তস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন। দীর্ঘকালের—শত শত বৎসরের মোহনিদ্রার পর এ কী তীব্র জাগরণ! অন্ধ চক্ষুপ্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন! তাহারা বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্তে দেশের সর্বস্ব লইয়া গিয়াছে; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহার বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করিতেছে! কনকের দৈন্যদুর্দশা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।

আর সে আম্রকানন নাই; কোনো স্বাদুফল গাছেই আর ফল নাই; ক্ষেত্রে স্বর্ণশস্য নাই, রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে 'হা অন্ন হা অন্ন!' আর্তনাদ উঠিয়াছে। পূর্বের মতো কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই; তাহার দেহ কঙ্কালসার, পরিধানে শতগ্রন্থি চীর! কনকদ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই, আছে কেবল মাকাল আর মাকাল। নগরে রাজপথে দ্বিধারে পণ্যবীথিকায় মাকাল; গ্রামে হাটে-বাজারে মাকাল, গ্রাম্য মুদির দোকানে মাকাল—সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন! এখন উপায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনকদ্বীপবাসী শাপে বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞানপেয়ারা লাভ করিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর মাকাল গ্রহণ করিবে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে একযোগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে—মাকালে নাকাল না হইলে এত শীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না। এজন্য তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।

এদিকে যথানিয়মে জিন-সওদাগর পূর্বঅভ্যাস মতো জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া বন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা বেসাতির কূলকিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিল!

পরীস্থানে বণিক-সভায় এ বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল—আন্দোলন প্রলয়ে বিরাট সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্যন্ত আলোড়িত হইল। পরিশেষে জনৈক গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, 'অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনকদ্বীপবাসী কেন মাকালে বিরাগী হইল।'

বণিকদল কনকদ্বীপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানাপ্রকার জনরব শুনিয়া অবগত হইল যে, যাঁহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালে বিরোধী। সওদাগর এই সন্দেশ মায়াবলে এক নিমিষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেইদিনই বণিক নেতা আদেশ দিলেন, 'কনকের পেয়ারা-তরু সমূলে উৎপাটন কর।'

পুনরায় বণিকেরা মায়া সন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, 'অতবড় মহীরুহ সমূলে উৎপাদন করা অসম্ভব। অতএব কী আদেশ? বণিকনেতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, 'উহার মূল ছেদন কর!'

পেয়ারা-তরুর মূলে শত শত শাণিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে কনকদ্বীপবাসী প্রথমে তো অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কী! তাহারা প্রথমত অনুনয়-বিনয় দ্বারা জিন-বণিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল—পরে সওদাগরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন কনকদ্বীপে ভয়ানক হইচই পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিল! জিন তবু নাছোড়বান্দা। তাহারা বরং সুবর্ণকায়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল

'ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফল গ্রহণদোষেই আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ-ফল মানবের অতীব অনিষ্টকারী। অতএব, তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া এ গাছ কাটিতেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকাতর্কে ভুলিবার পাত্র নয়। তাহারা বলিল, 'তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদিজননী যখন ঐ ফল বিনিময়ে স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।' কিন্তু সে-কথা শুনে কে?—এ যে আঁতে ঘা।

বৃক্ষকর্তন উপলক্ষে কনকে কিছুকাল খুব বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময় কোনো অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, 'এ বিকৃত পেয়ারাগাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন? ইহা তো সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্তৃক রোপিত সেই আদিবৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর পূর্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।' বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্তমান ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল। বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না—তিনি উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্যটনে নদনদী, জনপদ, পর্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরু সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক শাস্ত্র দেখিয়া, বহু কিংবদন্তি শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই শুষ্ক তরুই আদি জ্ঞানবৃক্ষ। তখন মর্মান্তিক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসে আহার-নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত কষ্ট সহিয়া এদেশে আসিল এই মৃত তরুর জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বি-শতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, 'তবু ভালো, তোমরা যে অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা!!'

এখন কী করা যায়? কী উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর; কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর—ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমনকি দুই-একজন মানবের প্রাণ বিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়।

সকলে শুষ্ক তরুর নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিল,—অশ্রুধারা, রক্তধারা কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্মাহত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোনো সন্ন্যাসী বলিতেছেন

'বৎস! ক্রন্দনে কোনো ফল হইবে না। দুই-একটি কেন, দুই লক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে না। দুইশত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিতমূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কার্যক্রমে ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ-ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ-ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ-গাছের সেবা-শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবাযত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে! যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিনগণ যে গাছ কাটিতে চাহে, কাটুক; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নবরোপিত পেয়ারা-চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে। সাবধান আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না। নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ-কথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে।' নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন; তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদার হৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, 'তাই তো! পুরুষেরা নদী পার হইয়া কুমিরকে কলা দেখাইয়াছিল—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল—তাহার ফল হাতে হাতে!'

কনকদ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এককোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আইস ভগিনী। তোমরা যোগদান কর। আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর। আজি কী শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।' বিস্ময় স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ-শুভকার্যে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎকার্যে—জিন দূরে থাকুক, দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম।

অতঃপর কনকদ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ-ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোনো প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়। কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞানকাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

কনকের রূপকথা অমৃত সমান,
মৃতব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

টীকা

১. এস্থলে কোরআন শরীফ বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।
২. জিন—নর। পরী—নারী।
৩. আহারে!—'নিজ অন্নপর কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী-সৃষ্টি

[পৌরাণিক উপাখ্যান]

[কিছুদিন হইল কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রে নারীসৃজন সম্বন্ধে একটি চমৎকার কৌতুকপূর্ণ গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। আমার ভগিনীদিগকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়া রাখি, আমি স্কুলের ছাত্রীর জন্য শাব্দিক অনুবাদ করিব না—মূল বিষয়ের মর্মোদ্ধার করিব। সুতরাং কেহ মূলের সহিত অনুবাদের বৈষম্য দেখিয়া হতাশ বা বিরক্ত হইবেন না।]

কর্নেল ইঙ্গারসোল (Ingersoll) 'মুসার ভ্রম' শীর্ষক বক্তৃতাদানকালে নারীসৃজন বিষয়ক পুরাকালের একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে ভালোবাসিতেন। তিনি তদ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন যে, বাইবেলের নারীসৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা ঐ প্রাচ্য গল্পের ভাব কত উচ্চ এবং কত উদার। কিন্তু জানি না, তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যায়িত শ্রবণ করিলে ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন কি না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই প্রাচীন পুস্তকখানি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক ইংরেজ লেখক মি. বেন (Mr. Bain) ইহা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অতঃপর উহা 'চিকাগো টাইমস হেরাল্ড' (Chikago times Herald) পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। গল্পটি এই প্রকার

আদিকালে যখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা আদি কিছুই ছিল না—ছিল কেবল ঘোর অন্ধকার—ত্বস্তি নামক হিন্দুদেবতা এই বিশ্বজগৎ সৃজন করিলেন। সর্বশেষে যখন রমণী সৃষ্টির পালা, তখন বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি দেখিলেন যে, তিনি পুরুষ সৃজনকালেই সমুদয় মালমশলা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ঘন কিংবা শক্ত কোনো বস্তুই অবশিষ্ট নাই। ত্বস্তিদেব নৈরাশ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, উপায়ান্তর না-দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পর ত্বস্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ পদার্থের সার সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা ১. পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; ২. সর্পের বক্রগতি; ৩. লতিকার তরুশাখা অবলম্বন; ৪. তৃণের মৃদু কম্পন; ৫. গোলাপ লতার ক্ষীণতা; ৬. কুসুমের সৌকুমার্য; ৭. কিশলয়ের লঘুত্ব; ৮. হরিণের কটাক্ষ; ৯. সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য; ১০.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুয়াশার অশ্রু; ১১. সমীরণের চাঞ্চল্য; ১২. শশকের ভীরুতা; ১৩. ময়ূরের বৃথা গর্ব; ১৪. তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা; ১৫. হীরকের কাঠিন্য; ১৬. মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ; ১৭. ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; ১৮. অনলের উত্তাপ; ১৯. তুষারের শৈত্য; ২০. ঘুঘুর ললিত স্বর; ২১. নীলকণ্ঠের কিচিরমিচির গান—

ঐ পর্যন্ত অনুবাদ লিখিবার পর অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হওয়ায় আমি কলম হাতে লইয়াই টেবিলে ন্যস্ত বামহাতে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। জানি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না। সহসা আমার কক্ষটা অতিশয় আলোকিত হইয়া উঠিল—বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর দুই-চারিটি সূর্য উদয় হইয়াছে। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, আলোস্তম্ভের ন্যায় অতি উজ্জ্বল একটি মূর্তি দণ্ডায়মান। সেদিকে দেখিতে আমার নয়নদ্বয় ঝলসিয়া গেল। আমি তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার সম্মুখস্থিত জ্যোতির্ময় মূর্তিটি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'শুন বৎসে! আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি। তুমি আমার নারীসৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি সর্বসুদ্ধ তেত্রিশটি উপাদানে নারী রচনা করিয়াছি। ইংরেজ লিপিকার মি. বেন এই উপকথা সংস্কৃত হইতে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় ভ্রমক্রমে ১২টি উপকরণের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। অদ্য আমি সেই ভ্রম সংশোধন করিতে আসিয়াছি। কেননা পৌরাণিক ইতিহাসে কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আমি সেই দ্বাদশ বস্তুর নাম বলিয়া যাই, তুমি লিখ।' আমি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বিহ্বলচিত্তে কলমটা কালিতে ডুবাইয়া লইয়া অলসভাবে লিখিতে লাগিলাম

২২. তেঁতুলের অম্লত্ব; ২৩. লবণের লাবণ্য; ২৪. মরিচের ঝাল; ২৫. ইক্ষু দণ্ডের মিষ্টতা'—ভ্রম হইতেছে ভাবিয়া আমি থামিলাম, ক্ষণকাল পরে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম, 'মহাত্মন! এ যে চাটনির মসলা—'

ত্বস্তি স্মিতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 'আমি যাহা বলি নির্বিবাদে লিখিয়া যাও।' আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যন্ত্রচালিতার ন্যায় লিখিলাম

২৬. কুইনাইনের তিক্ততা; ২৭. যুক্তিজ্ঞানহীনতার কূটতর্ক; ২৮. কলহপ্রিয়তার মুখরতা; ২৯. দার্শনিকের অন্যমনস্কতা; ৩০. রাজনৈতিকের ভ্রান্তি; ৩১. পাষাণের সহিষ্ণুতা; ৩২. সলিলের তারল্য এবং ৩৩. নিদ্রার মোহ।

পাঠিকা ভগিনী হয়তো বড্ড রাগ করিয়াছেন, গল্পের তালভঙ্গ এবং রসভঙ্গ হইল দেখিয়া। তা কী করি, বলুন দেখি। পরের লেখা অনুবাদ করিতে গেলে নিজের স্বাধীনতা খাটানো যায় না। বিশেষত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে কল্পনা বেচারিকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। যাক, এখন পুনরায় অনুবাদ চলুক। না, আমি আবার গোড়া হইতে বলি, অনুবাদ ও দৈববাণী একত্রে মিশাইয়া বলি।—

ধ্যানভঙ্গের পর ত্বস্তি চক্ষু মর্দন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতিপয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের সারভাগ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; ২. সর্পের বক্রগতি; ৩. লতিকার তরুশাখা অবলম্বন; ৪. তৃণদলের মৃদু কম্পন; ৫. গোলাপ লতার ক্ষীণতা; ৬. কুসুমের সৌকুমার্য; ৭. কিশলয়ের লঘুত্ব; ৮. হরিণের কটাক্ষ; ৯. সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য; ১০. কুয়াশার অশ্রু; ১১. সমীরণের চাঞ্চল্য; ১২. শশকের ভীরুতা; ১৩. ময়ূরের বৃথা গর্ব; ১৪. তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা; ১৫. হীরকের কাঠিন্য; ১৬. মধুরস্নিগ্ধ স্বাদ; ১৭. ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; ১৮. অনলের উত্তাপ; ১৯. তুষারের শৈত্য; ২০. ঘুঘুর ললিত স্বর; ২১. নীলকণ্ঠের কিচির মিচির গান; ২২. তেঁতুলের অম্লত্ব; ২৩. লবণের লাবণ্য; ২৪. মরিচের ঝাল; ২৫. ইক্ষুরসের মিষ্টতা; ২৬. কুইনাইনের তিক্ততা; ২৭. যুক্তিজ্ঞানহীনতার কূটতর্ক; ২৮. কলহপ্রিয়তার মুখরতা; ২৯. দার্শনিকের অন্যমনস্কতা; ৩০. রাজনৈতিকের ভ্রান্তি; ৩১. পাষাণের সহিষ্ণুতা; ৩২. সলিলের তারল্য; ৩৩. নিদ্রার মোহ।

ত্বস্তিদেব উপরোক্ত তেত্রিশ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া ললনা রচনা করিলেন। (Egg beater দ্বারা উত্তমরূপে ফেটিয়া!) বলাবাহুল্য, রমণী সৃজন করিতে সৃষ্টিকর্তাকে অত্যধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেক গবেষণা, অনেক চিন্তা, গভীর ধ্যান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। লোকে যে-জিনিসটি প্রস্তুত করিতে অধিক মাথা ঘামায়, তাহা নিশ্চয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কোনো বস্তু নির্মাণ করিয়া হাত পাকিলে পর সর্বশেষে যাহা প্রস্তুত করা হয়, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং রমণী যে সৃষ্টিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, ইহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতঃপর ত্বস্তি সেই অতি যত্নে নির্মিতা অঙ্গনা পুরুষকে উপহার দিলেন।'[১] অষ্টম দিবস পরে পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'হে প্রভো! আপনি যে জীবটি আমাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, সে তো আমার জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে যে অবিরত বকবক কচরকচর করে; সে আমাকে এক তিল অবকাশ দেয় না; সে যে বিনাকারণে বিলাপ করে; এক-কথায় সে যারপরনাই মন্দ।' ত্বস্তি অবলাকে ফিরাইয়া লইলেন।

অষ্টাহ অতীত হইলে পর পুরুষ পুনর্বার দেবতা-সমীপে উপনীত হইয়া বলিল—'হে দেব! আপনার প্রদত্ত জীবটিকে প্রত্যাখ্যান করা অবধি আমার জীবন অতিশয় নির্জন ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে। আমার স্মরণ হয়, সে কী সুন্দর! আমার সম্মুখে নাচিত, গাহিত, খেলিত! মনে পড়ে তাহার সেই কটাক্ষ—মরি মরি! সে কেমন করিয়া আড়-নয়নে আমার দিকে চাহিত! সে আমার খেলার সহচরী ছিল; আমার জীবনসঙ্গিনী ছিল। তাহার বিরহ আমার অসহ্য।'

ত্বস্তি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে পুনরায় সে রমণী প্রদান করিলেন।[২]

চতুর্থ দিবসে আবার ত্বস্তিদেব দেখিলেন যে, পুরুষ বনিতাসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট আসিতেছে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুরুষ বলিল, 'দেব! আমায় ক্ষমা করুন; আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, নারী আমার আনন্দের কারণ, না বিরক্তির কারণ। তাহাকে লইয়া আমার সুখশান্তি অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক! অতএব প্রভো! আপনি কৃপাবশত আমাকে ইহা হইতে মুক্তিদান করুন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'যাও, তোমার যাহা ইচ্ছা কর গিয়া!'

পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, 'এ যে আমার কালস্বরূপ, ইহার সহিত জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে কিছুতেই ইহার সঙ্গে থাকিতে পারি না!'

ত্বস্তি উত্তর দিলেন, 'তুমি তো ইহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পার না।'

পুরুষ নিরুপায় হইয়া মনের দুঃখে খেদ করিতে লাগিল, 'কী আপদ! আমি রমণীকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না।'

তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে!!!

টীকা

১. উপহারটা যেন বানরের গলায় মতির হার!

২. নারীও যেন প্রাণমনহীন, বুদ্ধিবিবেকহীন একটা কাঠের পুতুল বিশেষ—পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে নাই, আবার ফিরাইয়া লইতে আসিলেও গৌরব অনুভব করে নাই। ত্বস্তিদেব অবশ্যই জানিতেন, এইরূপ নির্বাক 'কাঠের পুতুল' গৃহিণীই পুরুষের বাঞ্ছনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্স নেলি

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

১

আমার ছোট ননদ খুকি তিন বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। তাঁহার যত্ন করিবার জন্য আমিও সঙ্গে আসিয়াছি। আল্লাহ রাখে, আমাদের কাফেলায় অনেক লোক, খুকির স্বামীপুত্র প্রভৃতি সকলেই ছিল।

আমাদের জনৈক বন্ধু হেমবাবুও লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবী পীড়িত হইয়া জানানা হাসপাতালে আছেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহার বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দেয় নার্স; তাঁহার বাহুর ক্ষতস্থলে পট্টি বাঁধে নার্স। এক-কথায়, তাঁহার সমুদয় কার্য নার্সগণই করে। আমি প্রায় দুই-ঘণ্টাকাল তথায় ছিলাম, ততক্ষণে বিভিন্ন কার্যের জন্য গোটা-পাঁচ নার্সকে আসিতে যাইতে দেখিলাম। কিন্তু রক্তপুঁজপূর্ণ বালতি লইয়া যে-নার্সটি, তাঁহার চেহারাটা আমার চক্ষে যেন কেমন বোধ হইল।

আমি একদিন অন্তর একদিন হেমবাবুর স্ত্রীকে দেখিতে যাইতাম। সত্য কথা বলিতে কি, বিমলাকে দেখিবার আগ্রহ তত ছিল না; তাঁহার সেই জীর্ণশীর্ণ রুগ্‌ণকায়া মলিনবদনা—বিষাদের প্রতিমূর্তি নার্সটিকেই দেখিতে যাইতাম। তাহার সেই যেন চিরপরিচিত মুখখানি, অথবা চিনি-চিনি চিনিতে পারি না মুখখানি আমার কেমন যেন লাগিল। একদিন বিমলা বলিলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি নার্স নেলির দিকে অমন করে চেয়ে থাকো কেন?'

আমি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, 'ওর ঐ শুকনো মুখখানা দেখে বড় মায়া লাগে।'

বিমলা। হ্যাঁ, ওর বড় দুক্ষু, আমারও বড্ড মায়া করে। কিন্তু উপায় কী? ওকে দু-চার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার জো নাই। ছ-টাকা মাইনে পায়—খেয়েই পেট ভরে না। প্রথমে প্রথম আমি নার্স নেলিকে সিকিটা-আধুলিটা দিতুম, কিন্তু পরে জানতে পারলুম, সিস্‌টার রিভা সব কেড়ে নিয়ে হাসপাতালের যত চাকর আছে, সবাইকে ভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেন—হয়তো নেলির ভাগেও একটা পয়সা কখনো পড়ে। সিসটার রিভার কী অন্যায় দেখ দেখি। যত নোংরা কাজ সব নেলি করে, অথচ সে একটু ভালো খাবার খেতে পায় না।

আমি। নেলি কি জাতে মেথর?

বিমলা। না, বাঙালি খ্রিস্টান। শুনেছি, এককালে সেও গেরস্থ ঘরের বউ-ঝি ছিল। পাদরি মাগীরা ফুসলিয়ে খ্রিস্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে। তার আগেকার নাম বদলে নেলি নাম রাখা হয়েছে। নেলি বাংলা জানে বলে তাকে আমাদের, অর্থাৎ বাঙালি রোগিণীদের সেবায় রাখা হয়েছে। মুসলমান মেয়েদের কোয়ার্টারে নেলিকে মোটেই যেতে দেয় না। ভয়, পাছে কেউ তাকে মুসলমান করে ফেলে। আর-এক কথা শুনেছ, নেলি নাকি দিব্বি কোরআন পড়তে পারে!

নেলি কোরআন শরীফ পাঠ করিতে পারে, শুনিয়া আমার মনে আরও কেমন খটকা লাগিল। না জানি সে কোন্ মুসলমান কুলে কালি দিয়া পতিত হইয়াছে! হায়! কোরআন শরীফের এই অবমাননা! খ্রিস্টান নেলি—মেথরানি নেলি—যে হস্তে ঘৃণিত রক্তপুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরআন শরীফ স্পর্শ করে। কার্যত নেলি মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্স নেলি বলিয়া ডাকেন।

বিমলাকে দেখিবার ছলে হাসপাতালে যাইতাম বটে, কিন্তু একদিনও নেলির সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুবিধা পাইতাম না। নেলিও কাজের ছলে আমাদের নিকট যখন-তখন আসিত—অথবা দূর হইতে তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষু দুটি আমার দিকেই ন্যস্ত রাখিত। হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলে চক্ষু অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত। এখন আমার ফিকির হইল, কিরূপে নেলির সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কালেভদ্রে সুযোগ পাইয়া নেলিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিত। যাহা হউক, নেলিকে আমাদের নিকট পাইবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

খুকির অস্ত্রচিকিৎসা করাই স্থির হইল। কিন্তু আমি তো কিছুতেই খুকিকে হাসপাতালে যাইতে দিব না। এজন্য দুলামিয়ার (খুকির স্বামীর) সঙ্গে অনেক বাকবিতণ্ডা হইল—তিনি আমাকে হাসপাতালের উপকারিতা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন; সমুদয় ন্যায়শাস্ত্র আবৃত্তি করিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হেমবাবুর স্ত্রীর নজির পেশ করিলেন; কিন্তু হাসপাতাল একবার আমার যে সর্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রাণ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। আমার সে দগ্ধক্ষত এখনো আরোগ্য হয় নাই। দুলামিয়াকে আর সে-সব কথা খুলিয়া বলিলাম না। শেষে আমারই জয় হইল। 'ধন্য স্ত্রীলোকের কুসংস্কার!' বলিয়া দুলামিয়া অস্ত্র (যুক্তি অস্ত্র) ত্যাগ করিলেন। বাসাতেই অস্ত্র হইবে, ঠিক হইল।

যথাসময়ে হাসপাতালের বড় ডাক্তার মিস ফলি তাঁহার দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই-তিনটা নার্সও ছিল। আমরা সকলে বাঙালি, 'হিন্দি কা চিন্দি' বুঝি না, তাই আমাদের ভাষা বুঝাইতে নার্স নেলিকে আসিতে হইয়াছিল। কার্য শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে চলিয়া গেলেন। কেবল রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য দুইজন সেবিকা—নেলি এবং লিজি রহিল।

পরদিন যথাসময় সকলের স্নান আহার এবং খুকিকে ঔষধপথ্য খাওয়ানো শেষ হইলে পর আমি অবসর ও সুযোগ পাইয়া নির্জনে নেলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নার্স, তোমার বাড়ি কোথায়?'

তদুত্তরে সে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল—বহুকষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, 'বুবুজান। আমাকে চিনিতে পারেন নাই?'

অ্যাঁ! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! আমি মেঝেতে বসিয়া পড়িলাম। হাঁ, চিনিলাম তো। অহো! কী নিষ্ঠুর সত্য—কী দারুণ সত্য আবিষ্কার করিলাম।

... নেলি তাহার দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করিল। ইতিহাসের প্রত্যেকটি অক্ষর অশ্রুবিধৌত ছিল।

২

পুর গ্রামে আমার পিত্রালয়। পিতামহের মৃত্যুর পর আমার পিতা ও পিতৃব্য সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। পিতৃব্যের সংসারে (চাকর, চাকরানি ব্যতীত) মাত্র তিনটি প্রাণী—তিনি, তাঁহার ভার্যা এবং তাঁহাদের একমাত্র কন্যা নয়ীমা। পিতার সংসারে আমরা পাঁচ ভাই-ভগিনীসহ মোট সাতজন। তবু শুনিলাম, চাচাজানের হাতে টাকা নাই। তাঁহার অনেক দেনা আছে ইত্যাদি।

আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল—আমরা পরম সুখে খাইয়া পরিয়া গা-ভরা গহনায় সাজিয়া থাকিতাম! আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? সাড়ে তিন শত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটি। বাড়ির চতুর্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোনো কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, 'বউ কথা কও', 'ও খুকি, ও খুকি', 'চোক গেল' প্রভৃতি পাখির ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যা হুয়্যা' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি মাগরিবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখির 'কা-আক্-কা-আক্-কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশবজীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরমসুখে অতিবাহিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে চাচিজান একমাত্র তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিলেন। চাচাজান চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতিপালনই তাঁহার প্রধান সমস্যা। আমার মাতা তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, তুমি অত ভাবছ কেন? নয়ীমার মা মরেছেন, আমি তো মরি নাই। যে কোলে আমার তিন মেয়ে জোবেদা, হামিদা, আবেদা মানুষ হয়েছে, সে কোলে কি নয়ীমার জায়গা হবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃব্য যেন অকূলসাগরে ডুবিতে ডুবিতে কূল পাইলেন। পরদিন তিনি নয়ীমাকে পাঁচজন দাসীসহ আমাদের বাড়িতে রাখিয়া গেলেন।

নয়ীমা আমাদের সব ভাইবোনের চেয়ে ছোট বলিয়া আমরা তাহাকে অতিশয় ভালোবাসিতাম। আমার পিতামাতা তাহাকে আমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভালোবাসিতেন। এইরূপে নয়ীমা রাজকুমারীর মতো স্নেহযত্নে বর্ধিত হইতে লাগিল। পল্লীগ্রামে আমরা উচ্চশিক্ষার ধার ধারিতাম না। সামান্য পড়ালেখা যাহা আমরা জানিতাম, তাহা নয়ীমাও শিক্ষা করিল। শিকা গাঁথা, কেশী প্রস্তুত করা, সুপারির ফুল, সুপারি কাটা, নারিকেলের চিড়া, জিরা কাটা, সুজনী সেলাই ইত্যাদি যাহা কিছু শিক্ষণীয় ছিল, নয়ীমা সে-সমস্তই ক্রমে শিখিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজনের মতে, মেয়ে-মানুষের পড়ালেখা শেখার মতো অকেজো জিনিস যেন পৃথিবীতে নাই।

সাত বৎসর হইতে নয়ীমা আমাদের সঙ্গে আছে। চাচাজানও পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আপন ভাগের সম্পত্তি সব অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়াছেন; কেবল নয়ীমার মাতার অলঙ্কারগুলি নষ্ট করেন নাই, তাহা আমার পিতাকে দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জামাল আহমদ সাহেব প্রায় আট-দশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে ট্রান্সফার হইয়া এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করিয়া বাড়ি আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছি; এবং আরও কতিপয় আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছেন। এ-সময় আমাদের বাড়িটা লোকের ভিড়ে বেশ গমগম করিতেছিল।

একদিন আমরা চারি ভগিনীতে গল্পগুজব করিতেছিলাম, এমন সময় ভাইজান তথায় আসিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা লেখাপড়ার চর্চা কর না, এমন আঁধার মন নিয়ে কী করে থাকো? হ্যাঁ নয়ীমা! তুমি কিছু পড়াশুনা কর না?'

নয়মা উত্তর দিল, 'আমি কোরআন শরীফ খতম করিয়াছি। এখন বড় আপার নিকটে কোরআন শরীফের তরজমা আর রাহে নাজাত পড়ি।'

ভাইজান হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যস, এই! আর কিছু পড় না—একটু বাংলা, একটু ইংরেজি?'

আমি আমার (১৮ বৎসর বয়সের) জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, 'ভাইজান! আপনি বাংলা, ইংরেজি অনেক পড়ে বিলাত গিয়ে, শেষে এতদিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, না কালেক্টর হয়েছেন। নয়ীমার ইংরেজি পড়ে কী হবে? কোন্ জেলায় কালেক্টরি করতে যাবে?'

ভাই। নয়ীমা ভালো লেখাপড়া শিখলে কালেক্টরের স্ত্রী হতে পারবে। ভালো বর পাবে; ভালো ঘরে বিয়ে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সকলে খিলখিল করে হাসিয়া উঠিলাম। আমি তখনই ভাইজানের সৃষ্টিছাড়া কথা মাতাকে গিয়া জানাইলাম। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—'ভাইজান বলেন, লেখাপড়া শিখলে নয়ীমা কালেক্টরের বউ হবে।'

মাতা আমার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'হুঁ—আচ্ছা, তাই হবে।'

৩

আমাদের বাড়িময় ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে—ভাইজানের সঙ্গে নয়ীমার বিবাহ। আমাদের আনন্দের সীমা নাই—আমাদের খেলার পুতুল নয়ীমা এখন আমাদের বড় ভাবীজান হইবে! আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাগিনী আবেদার ভারি রাগ, সে কিছুতেই নয়ীমার পা ছুঁইয়া সালাম করিবে না, কারণ নয়ীমা তাহার অপেক্ষা দুই-বৎসরের ছোট। সকলে আবেদাকে ঐ কথা লইয়া খেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিল! একদিকে ভাইজানও যারপরনাই বিরক্ত—ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়াছেন। তিনি বিলাত ফেরা, বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী—তিনি কি একটা দশ বৎসরের বালিকা বিবাহ করিয়া দেশ হাসাইবেন? তিনি বঙ্গের সভ্যসমাজে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তিনি আমাকেই সব দোষ দেন যে, 'জোবেদাই সব নষ্টের গোড়া! আমি সেদিন তাচ্ছিল্যভাবে কী একটা কথা বলেছি, তাই ও গিয়ে মাকে লাগিয়েছে। তারপর এই মহাবিভ্রাট!'

ভাইজান রাগ করুন, আর যাহাই করুন, তাঁহার একটা মস্ত গুণ এই যে, তিনি পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়স্বজনের কথার অবাধ্য ছিলেন না। মাতার দুটি মিষ্টিকথা, পিতার উপদেশ তাঁহাকে সহজেই সম্মত করিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে তিনি বড় যত্নে মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে পরের ঘরে যাইতে দিবেন না, ইত্যাদি। ভাইজান আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নিরীহ সুবোধ বালকটির মতো বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমাদের দূরসম্পর্কীয়া এক ভাবীসাহেবা ভাইজানকে শুনাইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কী লো, বিলাত ফেরা সাহেবকে মেহদি উবটন লাগান হবে না?'

ভাইজান রুদ্ধক্রোধে বলিলেন, 'যা আপনার মরজি! আমি উবটন বা তার চেয়ে জঘন্য কিছু মাখলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে আমার আপত্তি নাই। আমি তো নীরবে মাথা পেতে দিয়েছি—যত ইচ্ছা অত্যাচার করুন!'

আমি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে মেহদি বাটিয়া আনিয়া তাঁহার দুইহাত ভরিয়া লাগাইয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না ভাইয়ের হাতে অধিকক্ষণ মেহদি রাখা, কিন্তু আমি কার্যান্তরে গিয়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বেচারা ভাইজান তখনো হাত দুইটি ইজিচেয়ারের দুই বাহুতে রাখিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার হাত ধুইতে বসিলাম। লাল টকটকে হাত দেখিয়া ভাইজান তো রাগিয়া অস্থির। তিনি অনেক বিদ্যালাভ করিয়াছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মেহদির মাহাত্ম্য জানিতেন না। তিনি আমার হাত হইতে সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তখনই স্বীয় স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন। কিন্তু মেহেদি তো নাছোড়বান্দা!

৪

...নগরের জানানা হাসপাতালে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দুইমাস হইতে আছেন। তাঁহার ছয়মাসের শিশুপুত্র জাফরও সঙ্গে আছেন। এখানে তাঁহার আদরযত্নের সীমা নাই। হাসপাতালের বড় ছোট লেডি ডাক্তার ও সেবিকাগণ পালাক্রমে সর্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্তা থাকে। এক-কথায়, তিনি এখানে রাজভোগে আছেন। তাঁহার স্বামী ও দেবর প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা জমিলাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শ্বশ্রূ মহোদয়াও সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। রোগিণী আমার ভ্রাতৃবধূ নয়ীমা।

আমার মাতা নয়ীমাকে হাসপাতালে পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ক্রমেই যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন অগত্যা ভাইজান মাকে বলিলেন, 'মা! আমি এ পর্যন্ত কদাচ তোমার কথার অবাধ্য হই নাই; এখন একজনের জীবনমরণ হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতেছে, এ সময় বাধা দিও না। আজ তোমার কথা রাখিতে পারিব না।' ভাইজান এই একদিন মাতৃউপদেশ লঙ্ঘন করার জন্য আজীবন অনুতাপ করিয়াছেন।

অপরপক্ষে কতিপয় মিশনারি রমণী গল্প ও হাস্যপরিহাস করিতেছেন। একজন বলিলেন, 'এইবার দেখিব। পোড়া সমালোচকেরা আর বলিতে পারিবে না যে, আমরা কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নক্লিষ্ট পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি!'

দ্বিতীয় রমণী। এমন শিকার পাইলে কলিকাতার বিশপ বাহাদুরও কৃতার্থ হইতেন!

তৃতীয়া। ইশ! ভারি তো তোমাদের বাহাদুরি—একটা ১৯ বৎসরের বালিকা (হোক না সে দুই ছেলের মা, আমি তাকে বালিকাই বলি) ভুলাইয়া খ্রিস্টান করা কোন্ বড় শক্তকথা!

১মা। শক্তকথা না হউক, কিন্তু ... কাঁপিয়া উঠিবে—এমনকি সমুদয় বঙ্গদেশ তোলপাড় হইবে। একজন কালেক্টরের স্ত্রীকে হাত করা কি সহজ ব্যাপার?

২য়া। সন্ধ্যা হইল, এখন চল নয়ীমা বিবির কামরায় আজ আমি ভজন গাহিব। তিনি আরো একমাস হাসপাতালে থাকিবেন। সুতরাং আমাদের যথেষ্ট সময় আছে।

দুই-চারিজন মিশনারি-ললনা সর্বদা নয়ীমার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। রোগী দেখা এবং রোগীর সেবাই তাহাদের পরম ধর্ম। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ অমায়িক ভালোবাসায় নয়ীমা মোহিত হইয়াছেন! তাহারা সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিয়া যিশুর অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা পাইবার পথপ্রদর্শন করিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়ীমা নিজের ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না—তাঁহার নির্মল অন্তরে যিশুমহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। যে কখনো আলোক দেখে নাই, তাহার নিকট জোনাকির আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বোধহয়। নয়ীমার দশাও সেইরূপ।

৫

তিন মাস পরে নয়ীমা—না, আমার ভাবীজান হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি আর সে প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নয়ীমা নহেন। তিনি কাহারও সহিত ভালোমুখে কথা কহেন না। ইহাতে সকলেই ভাবিলেন যে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার মেজাজ খিটখিটে হইয়াছে। ভাইজান তাঁহাকে মাতার সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে নয়ীমার চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হাসপাতালের সঙ্গিনীদের অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই; জঙ্গলা বাতাস আর তাহার ভালো লাগে না।

নয়ীমা একদিন শাশুড়ির নিকট কৈফিয়ত তলব করিলেন যে, তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় নাই কেন? তাঁহাদের কিসের অভাব ছিল, কী বাধা ছিল? তিনি অবাক হইয়া বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। পরে সহাস্যে বলিলেন, 'পাগলের মেয়ে বলে কী?'

নয়ীমা। বলি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমাকে একটা আস্ত জানোয়ার করে রেখেছেন। এক অক্ষর পড়ালেখা শিখান নাই যে, আজ ভদ্রসমাজে বসবার উপযুক্ত হতেম। উনি আমায় লেখাপড়া শেখাতে বললেন, আপনি তা শুনে সাত তাড়াতাড়ি আমায় বিয়ে দিয়ে পাশে বাঁধলেন।

মা। তুমি তো বাছা এমন মুখরা ছিলে না। এ-সব কথা তুমি কোথায় শিখলে? তোমায় তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করলুম। এত যত্নের ধন তুমি—তোমাকে পরের হাতে না দিয়ে নিজের ঘরে রেখেছি। তারই নাম কি বেঁধে ফেলা?

নয়ীমা। মূর্খ লোকেরা শিক্ষার মর্ম কী বুঝবে? তাই আপনারা সেটা অবশ্যক বোধ করেননি। বুঝেছিলেন কেবল বিয়ে।

মা। বাছা! এখন নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এলে বিয়ে (এল.এ.বি.এ) পাস করিয়ে কেমন মেমসাহেব সাজাও দেখব! আমি পড়ালেখা শেখা মন্দ বলছি না; কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ে থেকে সুবিধা করতে পারিনি। মেয়েদের জন্য স্কুল নেই, মক্তব নেই, পাঠশালা নেই। ঘরে পড়াবার জন্যও ভালো শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। এখন তোমরা শহরে বেড়িয়ে যদি পড়ালেখার সুবিধা করতে পার, ভালো।

তাহাই হইল। দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না-থাকায়—আর যদিও বা মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় দুই-একটি উপযুক্ত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে তো 'শরিফগণ' কন্যা পাঠাইবেন না। বিশেষত মফস্বলবাসীগণ কী করিবেন? সুতরাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিলার জন্য পালাক্রমে কতকগুলি মিশনারি রমণী নিযুক্তা হইলেন। তাঁহারা নিজের নিয়ম অনুসারে প্রথমে বাইবেল হইতে গল্প বলিয়া পরে অন্য কাজ আরম্ভ করিতেন।

ইহাতেও ভালো সুবিধা হইল না। শেষে একজন ইউরোপিয়ান গবর্নেস নিযুক্তা হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে স্বীয়প্রভাব বিস্তার করিয়া একাধারে আমার ভাবীজানের সঙ্গিনী (Companion), জমিলার শিক্ষয়িত্রী এবং এ-সংসারের গৃহিণী হইলেন। এখন মিস লরেন্স এ বাড়িতে সর্বেসর্বা। তিনি মিষ্টকথায় বাড়িসুদ্ধ সকলকে একরূপ ভুলাইয়া রাখিয়াছেন।

৬

বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য...নগরের আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য।...পরগনায় যত লোক ছিল—তাহারা প্রায় সকলেই উপস্থিত। ব্যাপার কী? ব্যাপার?—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. জামাল আহমদের স্ত্রী মোসাম্মত নয়ীমা খাতুন প্রায় ২৫,০০০.০০ টাকার অলঙ্কার এবং নগদ ১৭,০০০.০০ টাকা লইয়া লালকুঠি মিশন হাউসে পলাইয়া গিয়াছেন। একমাস যাবৎ এই জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে। উভয়পক্ষেই বড় বড় ব্যারিস্টার নিযুক্ত আছেন। নয়ীমা পালকি করিয়া এজলাসে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য বিচারকের রায় প্রকাশ হইবে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন, এমন লোমহর্ষক সংবাদ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের পত্রিকা অতিশয় লোকরঞ্জন হইবে।

একদল লোক আসিয়াছে তামাশা দেখিয়া হাততালি দিতে। কেহ আসিয়াছে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিতে। কেহ এই অবসরে খানিকটা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া লইবেন। কেহ স্ত্রীশিক্ষার কুৎসা গাহিলেন। কেহ কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিয়া বিলাতফেরা মি. জামাল আহমদকে, তাঁহার কন্যা সুশিক্ষা—উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।

কেহ বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। কেহ সান্ত্বনা দিতেও আসিয়াছেন।

কেহ কেহ আপন চিন্তায় শঙ্কিত হইয়াছেন যে, এ রকম হইলে তো ঘরে বউ-ঝি রক্ষা করা দায়! আজ এতবড় কালেক্টর সাহেবের বিবি মিশনারিদের কথায় ঘরের বাহির হইলেন, তবে আমাদের তো কথাই নাই।

নয়ীমা নিজ মুখে বলিলেন যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহার শাশুড়ি ও স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু গৃহে যথাবিধি দীক্ষিতা হইবার সুবিধা ছিল না বলিয়া মিশন হাউসে আসিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্মের জন্য—একমাত্র যিশুর জন্য—স্বামী, কন্যা, পুত্র, গৃহ—এক-কথায় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারক একরূপ রফা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, এখন তো দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে তবে আপনি বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মিস লরেন্স সাধারণত অন্তঃপুরের দুর্দশা এবং বিশেষত নয়ীমার অন্তঃপুরের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিলেন। তিনি দশ বৎসর যাবৎ বিহার ও কলিকাতার বিভিন্ন অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া অন্তঃপুর রহস্য সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।

শেষ নিষ্পত্তি এই হইল যে, টাকা ও অলঙ্কার যাহা নয়ীমা সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা তাঁহারই থাকিবে; আর পুত্র ও কন্যা পিতার নিকট থাকিবে। নয়ীমা পুত্রলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

৭

নয়ীমা এখন লালকুঠিতে মিশনারি রমণীদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার আদরযত্নের সীমা নাই। মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখিলে পিঁপড়ায় খায়—এ হেন আমেদ মেম সাহেবাকে তাহারা রাখিবে কোথায়? উনিশ বৎসরের বালিকার এই ধর্মানুরাগ, এ মহান আত্মত্যাগ, কি কম প্রশংসার বিষয়? ইনি মিশন হাউসে আদর্শ রমণী। সকলের মাথার মুকুট, কণ্ঠের মণি—এই আমেদ মেমসাহেবা! অত্যধিক প্রশংসা ও তোষামোদে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমেদ মেমসাহেবা এত পূজা পাইয়াও এমন বিমর্ষ কেন?

যিশুর জন্য যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ ততক্ষণই সুখকর বোধ হইতেছিল, যতক্ষণ সোনার সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। ক্রমে যখন মোকদ্দমার গতি কুপথে চলিল, যখন স্বামী ও সন্তানদের সহিত ইহজীবনে দেখা হওয়ার আশার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু নিবিয়া গেল, তখনই নয়ীমার প্রফুল্লতা তিরোহিত হইল। বিচারালয় হইতে বিজয়গর্বে ফিরিবার সময় হইতেই তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পালকি হইতে নামিয়াই মূর্ছিতা হইলেন; মিশনারি ভগিনীগণ 'ভারি গরম!' বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। হাঁ, গরমই বটে, এ যে প্রাণ পোড়ার গরমী!

জ্ঞান হওয়া মাত্র নয়ীমা তওবা করিলেন; বারম্বার প্রাণ ভরিয়া কলেমা পড়িলেন; আল্লাহকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এ-সব বৃথা। গভীর রজনীতে মনে করিতেন, পলাইয়া যাই—যাই স্বামীর পা জড়াইয়া ধরি গিয়া। কিন্তু পথ যে চিনেন না। লালকুঠি হইতে কালেক্টর সাহেবের কুঠি কতদূর? কোন্‌দিকে? কে পথ বলিয়া দিবে? হায় হায়। কেউ না!

যতদিন ছলেবলে কৌশলে নয়ীমার সমস্ত অলঙ্কার ও টাকাগুলি হস্তগত না হইয়াছিল, ততদিন মিশনারি ভগিনীগণ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। এখন 'আছে' বলিতে নয়ীমার হাতে দু-গাছি কাচের চুড়ি আর পরনে একখানা বিলাতি মোটা ধুতি। এখন তাহারা নয়ীমাকে পদব্রজে গির্জা যাইতে বলেন, নয়ীমা তাহাতে স্বীকৃত নহেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে নয়ীমাকে একমুষ্ঠি অন্নদান করাও তাঁহাদের পক্ষে ভারবোধ হইতে লাগিল। এখানে সকলেই খাটিয়া খায়, বাড়ি বাড়ি পড়াইতে যায়, প্রচার করিতে যায়। কেবল নয়ীমা বসিয়া খাইবে কেন? শেষে তাঁহারা নয়ীমাকে হাসপাতালে নার্সগিরি করিতে দিলেন। কিন্তু এই বঙ্গদেশে তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া নয়ীমাকে বহুদূরে, লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নয়ীমা তাঁহার কোরআন শরীফখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন—যে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি আয়াত খণ্ডন করিয়া জগতকে দেখাইবেন মুসলমান ধর্ম কেমন অসার, অন্ধ বিশ্বাসীর ধর্ম!—তাঁহার সে-সব কল্পনা জাহান্নামে গিয়াছে। এখন সেই কোরআন শরীফখানি তাঁহার একমাত্র দুঃখের সঙ্গী। সকলে শয়ন করিলে পর গভীর নিশীথে উঠিয়া তিনি ওজু করিয়া অতিযত্নে কোরআন শরীফ লইয়া বসেন। পাঠ করিবেন কী, দরবিগলিত অশ্রুধারায় ভিজিয়া যায় বলিয়া প্রতিপত্রে সাদা ব্লটিং কাগজ রাখিয়াছেন। অনুতাপে দগ্ধ হইলে রোদনে এত শান্তি পাওয়া যায়, সুখের ক্রোড়ে পালিতা নয়ীমা এতদিন তাহা জানিতেন না।

স্বামীচিন্তা এখন নয়ীমার জীবনের সার হইয়াছে। পতি ধ্যান, পতি জপমালা হইয়াছে। ইয়া আল্লাহ! আর একবার—মাত্র একটিবার অভাগিনীকে স্বামীর চরণে পৌঁছাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান, সব করিতে পার!—পার না কেবল এইটুকু? এখনো তওবার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই, নয়ীমার তওবা গ্রহণ কর, প্রভু গাফুরুর রাহীম।

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে আসিয়া নয়ীমা নার্স নেলি হইয়াছেন। দিবাভাগে রোগীসেবা করিতে হয়, নামাজ ও কোরআন শরীফ পাঠের সুবিধা হয় না। সঙ্গে থাকে কেবল অনিবার অশ্রুধারা। প্রথম প্রথম অন্যান্য নার্স, এমনকি লেডি ডাক্তারেরাও তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার দ্বীন দুনিয়া-ইহকাল পরকাল—দুই-ই রসাতলে গিয়াছে, যে-স্বয়ং সার্বভৌম সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য মেথরানি সাজিয়াছে, যে স্বহস্তে সোনার নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার সান্ত্বনা কোথায়? অতঃপর আর কেহ নেলিকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে নাই।

এইরূপে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সাত বৎসরের সাত বারো চৌরাশি মাসের দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন দিবসের একটি দিনও নেলির বিনা ক্রন্দনে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি কোনোমতে স্বীয় অস্থিচর্মসার দেহখানিকে বহন করিয়া জীবনের দিন গণনা করিতেন। রজনীর প্রতীক্ষায় কোনোরূপে দিবা অতিক্রম করিতেন। রাত্রিকালে নামাজ ও কোরআন শরীফ পাঠের সুবিধা হইবে, তাহাই যাহা কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু যে-দিন রাত্রির কাজ (night duty) থাকিত, সেদিন নেলির ভাগ্যে নামাজের সুখটুকুও ঘটিত না। সোবহান আল্লাহ! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায়—অশ্রুপ্লাবনে সেজদার স্থান ভিজাইয়া দেওয়ায় এত শান্তি লাভ হয়!

নেলির ঐরূপ কঙ্কালসার দেহখানি দেখিয়া প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে যখন বলিল, 'বুবজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?' তখন আর কোনো সংশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহিল না। আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। আমি তাই মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। যে আমার মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই পিতৃব্যজাতা ভগিনীকে চিনিব না? তাই তো! কোরআন শরিফ পাঠ করিতে পারে, এমন বাঙালি খ্রিস্টান ভূ-ভারতে কয়টা আছে? কিন্তু হায়! নন্দন কাননের পারিজাত নয়ীমাকে কীট নেলিরূপে কে দেখিতে চাহিয়াছিল? যে নয়ীমা শৈশবে পাঁচজন দাসীসহ আমাদের বাড়ি আসিয়াছিল, সে আজ পরের সেবাদাসী!

'হায় রে নিয়তি! তুমি কত খেলা খেল,
সুখের শিখরে নিয়া দুঃখ-কূপে ফেল!'

৮

নেলির ইতিহাস শ্রবণকালে আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। বারম্বার মনকে বুঝাইতেছিলাম যে, নয়ীমা স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিতেছে—ইহা তো তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য, তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার কারণ কী? কিন্তু নেলির আত্মগ্লানিপূর্ণ মর্মন্তুদ ভাষায় পাষাণ শতধা হইত, মানুষ কোন্ ছার?

নেলি আত্মকাহিনী সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিরামের পর তাঁহার স্বামী ও পুত্রকন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব সংযত ভাষায় সমস্ত অবস্থা বলিলাম। বলিলাম—'যেদিন ভাইজান মোকদ্দমা হারিয়া বিচারালয় হইতে অধোমুখে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই 'হায়—নয়ীমা!' বলিয়া মাতা শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণাব্যঞ্জক হা-হুতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাসের বুলি ছিল, 'হায়-নয়ীমা!' ভাইজান পুরুষমানুষ, কোনোপ্রকার বাহ্যিক কাতরতা প্রকাশ করিতেন না; তিনি ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় নীরবে সে অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, খেদ রুদ্ধনিশ্বাসে সহ্য করিতে লাগিলেন।

মাস দুই পরে মা দেহত্যাগ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই অভাগিনী জমিলার জ্বর হইল। পিতার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সে তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিত না। তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন 'দাদি আম্মা'। তাঁহাকে হারাইয়া মাতৃহীনা বালিকা একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িল।

জ্বরের বিকারে 'মা' 'মা' বলিয়া প্রলাপ বকিত। কাঁদিয়া বলিত, 'মা তুই আবার হাসপাতালে গেলি কেন? আয় ফিরে আয়। জাফর তোর জন্য বড় কাঁদে, আয় মা! দাদি আম্মাও নাই!' জমিলা অধিক দিন কষ্ট পায় নাই, মৃত্যু তাহাকে শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে।

পক্ষকাল মধ্যে মাতা ও কন্যাকে হারাইয়া ভাইজান শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সহ্য গুণেরও সীমা আছে। বেচারা জাফরেরও কান্না বাড়িয়া গেল। ভাইজান তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতেন কিন্তু মাত্র এক বৎসরের শিশু মাতৃহারা হইয়া আর কতদিন সুস্থ থাকিবে? এক মাসের মধ্যে সেও ইহধাম ত্যাগ করিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজান অদ্যাবধি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সোনার সংসার সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁহার 'আছে' বলিতে একমাত্র ভগিনী আমিই আছি।' 'নয়ীমা! একবার মানসচক্ষে তোমার নিজহাতে গড়া সেই গোরস্থানের প্রতি—তোমার শ্মশানবাসী স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখ তো!' আমার মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে মূর্ছিতা নয়ীমা ভূপতিত হইল।

আমি নেলির চোখেমুখে একটু জলের ছিটা দিব মনে করিতেছি, এমন সময় দুলামিঞা আমার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়োপ্রাপ্ত কন্যা সিদ্দিকা দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে আর আমি নেলিকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইলাম না! সিদ্দিকা আমার হাত ধরিয়া তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল।

৯

খোদার ফজলে খুকি আরোগ্যলাভ করিলে পর আমরা দেশে ফিরিলাম। ফিরিবার পূর্বে পশ্চিমের আরো কয়েকটি নগর, বিশেষত দিল্লি, আগ্রা ও লাহোর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। লাহোরে আনারকলির সমাধিমন্দির দর্শনে একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরের প্রভূত ক্ষমতা, অন্যদিকে যুবরাজ সেলিমের অনাবিল প্রেম—উভয় চিত্র যেন মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিলাম।*

আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া আরো একটি কথা মনে উদয় হইল। নারীদ্বেষী পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ুন-না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য। শিক্ষা—স্ত্রীলোক পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোনো গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে?

তাজমহল সৌধটি জগদ্বিখ্যাত; পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য। তাজমহলের নাম না-জানে এমন লোক ধরাতলে অতি অল্প। কিন্তু ভুবন বিখ্যাত তাজমহলের অভ্যন্তরে যিনি সমাহিতা আছেন, সে মমতা মহলকে কয়জনে চিনে? ঐ অমন নয়নরঞ্জন মর্মর প্রস্তর নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর তাজমহলও তৎগর্ভস্থা মহিষীকে চিরস্মরণীয়া করিতে পারে নাই। আর নূরজাহাঁ বেগম? তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কণামাত্র আয়োজন করা হয় নাই। তাঁহার নগণ্য সামান্য সমাধিমন্দির লাহোরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র অজ্ঞাত স্থান শাহতারায় বনাবৃত অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেকে সে কবরস্থানের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না। কিন্তু নূরজাহাঁ বেগম চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। সে কী বস্তু, যাহা নূরজাহাঁকে অমর করিয়াছে? ঐ শিক্ষা। সুশিক্ষার প্রসাদে জগজ্জ্যোতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। খোদা না-খাস্তা, ভূমিকম্পে কিংবা কোনো প্রবল শত্রুর কামানে তাজমহল ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু নূরজাহাঁ বেগমের স্মৃতির মৃত্যু নাই!

যাক, আমার ধান ভানিতে শিবের গানে প্রয়োজন নাই। গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াও আমি নেলির সনির্বন্ধ অনুরোধ তুলিতে পারি নাই। তিনি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, ভাইজানকে অনুরোধ করিয়া যেন আমি তাঁহাকে বাড়ি আনাই। তিনি এখন পতিগৃহে সামান্যা চাকরানি কিংবা অধমতমা মেথরানিরূপে জীবনের অবশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় যাপন করিতে চাহেন। অত্যধিক রোদনে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে, অভাগিনী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

পূজার ছুটিতে আমি পিতৃগৃহে—না, এখন তো পিতা নাই—সুতরাং ভ্রাতৃগৃহে গেলাম। একদিন ভাইজানকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া সেই সুযোগে তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া—ধীরে ধীরে বলিলাম, 'ভাইজান! তোমার পা টিপে দি?' তিনি প্রসন্নবদনে বলিলেন, 'আচ্ছা। কিছু মতলব আছে নাকি?'

আবার সেই সুখের শৈশব মনে পড়িল। বাল্যকালে ভাইজানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পায়ের তলা টিপিয়া দিতাম, পায়ের আঙুল ধরিয়া টানিতাম। তাই আজও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু মতলব আছে নাকি? আমি বহুকষ্টে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় আমার মতলব প্রকাশ করিলাম। নয়ীমার প্রাণপোড়া রামকাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম, 'অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পতিপ্রাণা নয়ীমা এখন অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পবিত্রা হইয়াছেন।'

সমুদয় শ্রবণান্তে ভাইজান বলিলেন 'তাহা হইলে নয়ীমাকে দেখিবার আশা করিতে পারি? তাহাকে জীবনে আর একটিবার দেখিব বলিয়া আমি এখন পর্যন্ত মরি নাই। আমার সব মনে আছে—ঐ দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরে কিছু ভুলি নাই। মনে আছে—যেদিন 'হায় নয়ীমা' বলিয়া জননী শয্যাগ্রহণ করিয়া আর ওঠেন নাই। মনে আছে, জমিলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া তাহার মাতার জন্য কাঁদিত। আমার সম্মুখে তাহার নাম উল্লেখ করিতে সাহস পাইত না—দুঃখিনী বালিকা অব্যক্ত যন্ত্রণায় এটা-ওটা ছুঁতা ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত। শেষে আমারই কোলে তাহার মাতা সম্বন্ধে প্রলাপ বকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে! আরো মনে আছে—জাফর, আমার অন্ধের যষ্টি জাফর—আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জাফর, যেদিন আমার বুকে মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে! আমার বক্ষ না হইলে সে ঘুমাইত না—শেষনিদ্রার সময়ও সে আমারই বুকে লুটাইয়া পড়ে!'

* * *

'এতখানি লাঞ্ছনার পরেও যে বেহায়া জীবনযাপন করিতেছি, তাহা কেবল নয়ীমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া। চাকুরি ছাড়িলে কর্মহীন জীবনে স্মৃতি আমাকে পাইয়া বসিত—অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় হয়তো এতদিন মরিয়া যাইতাম। যেদিন জাফর প্রাণত্যাগ করিল, সেইদিন এই পিস্তলে গুলি পুরিয়াছিলাম, আত্মহত্যা করিব বলিয়া—'

ভাইজান বুকের পকেট হইতে একটি ছয়নলী পিস্তল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন

'কিন্তু আত্মহত্যা করি নাই। এই-যে স্মৃতির বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিয়া, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া বাঁচিয়া আছি—কেবল জীবনে আর-একবার নয়ীমাকে দেখিবার আশায়—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহে ও আশায় ভাইজানের মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, বুঝি অভাগিনী নেলির কপাল ফিরিল—বুঝি সে আবার স্বামীপদে আশ্রয় লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। তাঁহার মুখ ভয়ংকর গম্ভীর; চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তলটি ধরিয়া বলিলেন,—'কোনোরূপে নয়ীমাকে একবার আমার সম্মুখে আনিতে পার? তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দেনাপাওনা শোধ করিয়া লইব। আমার জীবনের এই শেষ আকাঙ্ক্ষা, জোবেদা! আর কিছু চাহি না। নয়ীমাকে—না, হাঁ, কী বলিলে, সে এখন 'নেলি' হইয়াছে?—বেশ, তবে সেই নেলিকে এই পিস্তলে গুলি করিয়া হত্যা করিব। একটি একটি করিয়া এই ছয়টি গুলি ছুড়িয়া নেলিকে হত্যা করিয়া আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব। কিন্তু না, ওহ্! তাহা তো হইবে না! নয়ীমা যে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান হইয়াছে; তবে তো সে অবধ্যা। মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নাই।' এই বলিয়া তিনি পিস্তলটি ভূতলে রাখিলেন।

ঠিক এই সময় তাঁহার বালকভৃত্য একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। ভাইজান পাঠ করিলেন

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন 'কবর প্রস্তুত রাখো, নার্স নেলির শবদেহ প্রেরিত হইল।'

টীকা

১. যুবরাজ সেলিমের প্রণয়িনী আনারকলি সম্রাট আকবরের আদেশে জীবন্ত সমাহিতা হইয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশু-পালন[১]

উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণ!

চোখের উপর নিত্য যে মহামারী, বিশেষত শিশুহত্যা দেখতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ভাববার বিষয়, গত বৎসর কেবল বাংলাদেশে ষোলো লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত এগারোজন লোক মারা গেছে—তার মধ্যে দশ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশ পঞ্চান্নজন ছিল। ঐ সোয়া ছয় লক্ষ ছেলের মধ্যে এক বছরের কম বয়সের শিশু দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার তিন শ সত্তর জন ছিল। ফল কথা, সাড়ে ষোলো লক্ষ লোকের তিনভাগের একভাগ ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলেমেয়েই তো ভবিষ্যৎ—তারা যদি এমন হু হু করে মরে যাবে, তবে আমাদের আর থাকবে কী? আর সব জায়গার বিষয় ছেড়ে শুধু কলিকাতায় দেখছি, গত বৎসর ৬০০০ অর্থাৎ দৈনিক ১৬ জন করে আঁতুড়ে শিশু মারা গেছে। যদি যত্ন করা যেত, তাহলে রোজ ১৪ জন করে ছেলে বাঁচানো যেতে পারত। ২৫ বৎসর আগে এই শহরে যত ছেলে জন্মাত, তার শতকরা ৫০ জন শিশু এক বৎসরের মধ্যেই মারা যেত। ১৮৯৫ সনে শতকরা ৪৮ জন ছেলে মরেছে। তারপর শহরের জলবায়ুর কিছু উন্নতি হয়ে ১৯০০ সনে শতকরা ৪৪ জন করে মরেছে। আর গত বছর শতকরা ৩০/৪০ জন করে মরেছে। তার মধ্যে রোজ ১৪ জন করে শিশু কেবল মা ও ধাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হয়েছে। অযত্নে ছেলে মারা হয়েছে, এর অর্থ এই যে, পোয়াতিরা ঠিকমতো যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হউক, এ রকম শিশুহত্যা তো সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাচ্ছে যে, পুরাকালে আমাদের অতিবৃদ্ধা ঠাকুমা, দিদিমারা যা করেছেন, সে-সব ব্যবস্থা মন্দ ছিল—তার কিছুই ভালো নয়। সেইজন্য তার উল্টো করতে হবে। একটু পরিষ্কার করে বলি, ধরুন, যেমন দিদিমার আমলে হিন্দু পোয়াতিকে ৯ দিন থেকে ২১ দিন আর মুসলমান পোয়াতিকে ৪০ দিন আঁতুড়ঘরে বন্ধ থাকতে হতো, এখন তার উল্টো করতে গিয়ে দুইদিনের পোয়াতি (প্রসূতি) মোটরগাড়িতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে বা সংসারের কাজকর্মে হাত দিবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বোকা ছিলেন না; তাঁরা যা ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা নিখুঁত ছিল, তাই তাঁরা নির্বিবাদে ৯০/৯৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে গেছেন। এখন তো আমাদের 'বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ!' দশ বছর বয়সে চশমা পরতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝখান থেকে আমরা সেই নিয়মের বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলেছি! আবার সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ! আপনারা পুরাকালের, বিশেষত মুসলমান নিয়মের সঙ্গে এখনকার ডাক্তারি ব্যবস্থার তুলনা করে দেখবেন।[২] এই দেখুন না, আমাদের ব্যবস্থা বলে

১. প্রসূতিকে যথাসম্ভব নির্জন ঘরে রাখবে।
২. ঘরের দরজার কাছে কাঠ কয়লার আগুন রাখবে।
৩. বাহিরের যে-লোক ঘরে আসবে সে হাত পা ও কাপড় আগুনে গরম করে আসবে।
৪. মুসলমানি মতে ৪০ দিন আর হিন্দু মতে ২১ দিন পর্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশি নড়াচড়া করবে না।
৫. আঁতুড়ঘরে অতিরিক্ত বাহুল্য জিনিস ('অশুচ' হওয়ার ভয়েই বলুন, আর যাই বলুন) রাখবে না।

আর আধুনিক ডাক্তার কী বলেন? তিনি বলেন

১. রোগীর কামরায় মানুষের ভিড় বা গোলমাল হওয়া উচিত নয়। (পোয়াতিও তো রোগী বিশেষ।)
২. কয়লার আগুন পাবক, অর্থাৎ বাতাসকে পরিষ্কার করে। (তবে সে জিনিসটা পোয়াতির ঘরে থাকলে দোষ কী?)
৩. বাহিরের লোকের কাপড়চোপড়ে রোগের কীটাণু থাকা সম্ভব; আর আগুনের উত্তাপে রোগের জীবাণু মারা যায়।
৪. ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশবিশেষ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সে-সময় নড়াচড়া করা উচিত নয়। এমনকি বিছানা ছেড়ে উঠতে নাই। (ছয় সপ্তাহ অর্থে বিয়াল্লিশ দিন, তবে আমাদের মুসলমানী ব্যবস্থা চল্লিশ দিন ঘরে থাকতে বলেও কী পাপ করলে?)
৫. রোগীর কামরায় অতিরিক্ত জিনিস, এমনকি বই, কাগজ ইত্যাদিও রাখা উচিত নয়। কারণ সেগুলো infected অর্থাৎ অশুচি হয়।

আমরা যদি এখন কাঠ কয়লার ধোঁয়া রাখি; ঘরটা গরম রাখতে হবে বলে সব দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে পাতকুয়া করে ফেলি; কিংবা ছাগলের ঘরে পোয়াতিকে রাখি, সে-দোষ কার—আমাদের না ব্যবস্থার?

আমাদের দেশের পোয়াতিদের প্রধান দোষ এই যে, তারা পরিষ্কার বাতাসের মর্ম বোঝে না। চারিদিকের দোরজানালা একেবারে বন্ধ করে রাখে। পাড়াগাঁয়ে দরমার কিংবা চেঁচাড়ির বেড়া দেওয়া খড়ের ঘরে অমন করে দোর বন্ধ করলে তত অনিষ্ট হয় না। কারণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে ঘরে বাতাস আসতে পারে। কিন্তু কলকাতার পাকা বাড়িতে কিংবা মাটির দেয়ালের ঘরে দোরজানালা বন্ধ করলে কিছুতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের বাতাস আসতে পারে না। এক ঘরে অনেক বেশি লোকের শোয়া উচিত নয়; তাতে ঘরের বাতাস খারাপ হয়। শোবার ঘরে রোদের আলো যেন যেতে পারে। দিনের বেলা সব দরজা খুলে রাখা উচিত।

খাস কলকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর-একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রসূতির শরীর ভালো না-থাকায় শিশু মায়ের দুধ পায় না। গাইয়ের দুধ আর নানারকম ছাইমাটি খাইয়ে শিশুকে একরকম গলা টিপে মারা হয়। কেবল শিশুরক্ষার চেষ্টা করলে কোনো ফল হবে না—শিশুর মা'দের স্বাস্থ্যেরও যত্ন করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেছেন, মায়ের কর্তব্য কী, তা না-জেনেশুনে কেউ যেন মা না হয়। মায়ের প্রধান কর্তব্য সন্তান পালন করা, এ-কথা অবশ্য কাউকে বলে দিতে হবে না, কারণ পশুপক্ষীও এ-কর্তব্য পালন করে থাকে। কিন্তু পশুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে বলেই মানুষকে তার কর্তব্য ঠিক করে শিখে নিতে হয়। পশুরা তাদের কাজে ভুল করে না; আমরা মানুষ কি না, তাই আমাদের পদে পদে ভুল!

নোংরামির জন্যও অনেক আঁতুড়ে ছেলে মারা পড়ে। নাওয়া ঠিকমতো হয় না; ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে নাওয়ানো হয় না। যে ছেলেরা মায়ের দুধ পায় না, তাদের জন্য যে দুধ বা ফুড তৈরি করা হয়, তার বাসনপাত্র ঠিকমতো পরিষ্কার থাকে না। একবার অনেকখানি দুধ তৈরি করে ফেলে, সেই ঠাণ্ডাদুধ তিন-চারবার খাওয়ানো হয়। এই রকম আরও কত অত্যাচার হয়, তা আর কত বলব! ' সর্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা!'

শিশুকে রোজ একবার নাওয়াতে হবে। জলটা একটু গরম, শিশুর বগলে হাত দিলে যেমন গরম লাগে কিংবা মায়ের কনুইতে যে গরম জল গা-সহ্য বোধহয়, অতটুকু গরম হলেই হবে। শীতকালে খোলা জায়গায় বা যেখানে ঝাপটা বাতাস লাগে, এমন জায়গায় নাওয়াবে না। নাওয়াবার আগে বেশ করে সর্ষের তেল মালিশ করে নেবে, কিন্তু এ সময় দুধ খাওয়াবে না। কোনোরকম উগ্র সাবান ব্যবহার না করে বরং ডালের বেশন মাখলে চলে। স্নান শেষ হলে তাড়াতাড়ি গরম তোয়ালে কিংবা পরিষ্কার পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেশ করে শিশুর গা মুছে দিতে হবে। শরীরের কোনো অংশ-যেমন কানের পীঠ, বগল, কুঁচকি যেন ভিজা না থাকে। নচেৎ ঐসব জায়গায় ঘা হবে।

নাওয়া শেষ হলে তাড়াতাড়ি শিশুকে কাপড় পরাবে। হালকা ফ্লানেল কিংবা সেইরকম কাপড় পরানো চাই। কাপড় খুব ঢিলেঢালা হওয়া চাই। উলেন টুপি আর মোজা কোনোকালে পরানো উচিত নয়। কাপড় খুব পরিষ্কার আর শুকনো চাই। কোনোরকম ভিজে, এমনকি ঘামে ভিজা কাপড়ও গায়ে রাখতে নাই।

তারপর শিশুর খাওয়া—এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। এক বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ সবচেয়ে ভালো; তা যদি একান্তই না পাওয়া যায়, গাইয়ের দুধে অনেকটা জল মিশিয়ে মায়ের দুধের মতো পাতলা করে খাওয়াবে। এজন্য দুধ খাওয়া শিশি (feeding bottle) ব্যবহার করা প্রশস্ত। ঝিনুকে কিংবা চামচে দিয়ে দুধটা একেবারে গলায় ঢেলে দিলে শিশুর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর হয়। মাই কিংবা ফিডিং বোতলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঁটা চুষে চুষে খেলে দুধের সঙ্গে শিশুর মুখের লালা কতক পরিমাণে পেটে যায়। ঐ লালায় এমন একটা গুণ আছে, যাতে দুধ কিংবা যে-কোনো খাদ্য সহজে হজম হয়। ঐরূপে জল মিশিয়ে ছাগলের কিংবা গাধার দুধও খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের জন্য মানুষের দুধই সবচেয়ে ভালো খাদ্য। সর্বদা মনে রাখবে যে, গাই কিংবা ছাগলের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে মিষ্টি কম থাকে। তিন মাসের ছেলেকে দেড় ছটাক খাঁটি দুধ, আধ ছটাক ননী, দেড় ছটাক পানি আর-একটু মিছরি একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে একটু চুনের পানি মিশিয়ে দিলে আরও ভালো হয়। তাহলে ছেলের পেট ফাঁপার ভয় থাকে না। যদি দেখা যায়, এতে শিশু ভালো থাকে না, অর্থাৎ মোটাতাজা হয় না, তবে ননীর ভাগ কম করে দুধ মিছরির ভাগ বাড়িয়ে দিবে। বিলাতি অর্থাৎ টিনের ঘন দুধ খাওয়াতে হলে, টাট্‌কা তৈরি করে খাওয়াতে হবে। এক সঙ্গে অনেকখানি তৈরি করে, তাই সাতবার খাওয়াবে না। এ-দুধ এই নিয়মে তৈরি হয়;—আধছটাক দুধ, আধছটাক ননী, একপোয়া (কিংবা সাড়ে-চার ছটাক) জল। এর চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেকে মেলিন্স ফুড দেওয়া যেতে পারে। এতেও দুধ এবং ননী মিশিয়ে দিতে হবে। এইরূপে এলেনবেরি ও বেঞ্জার সাহেবের তৈরি ফুড এবং হরলিক সাহেবের মলটেড মিল্ক দেওয়া যেতে পারে।[৩] ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং দুধ যাতে বেশি খায়, সে দিকে নজর রাখবে। মনে রাখা দরকার, ছেলেকে কখনো ঠাণ্ডা দুধ বা ফুড খাওয়াতে নাই।

ঘুম—শিশুকে নাওয়াবার পরেই খাওয়াবে, তারপর তাকে ঘুম পাড়াবে। দুধ খাওয়া আঁতুড়ে ছেলের জন্য প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা, দুই বছরের ছেলের জন্য ১৪ ঘণ্টা এবং চার বছরের ছেলের জন্য ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। শিশুর মুখে চুষনি দিয়ে রাখা অভ্যাস ভালো নয়। কেউ কেউ আবার ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য আফিম খাওয়ায়, এ অভ্যাসও ভালো নয়। ছেলেদের দোলায় শোয়াবার অভ্যাস করতে নাই। দোলা দোলাতে গিয়ে মায়ের বৃথা সময় নষ্ট হয়, আবার শিশুরও শরীর মাটি হয়। ছেলের শোবার ঘরে যেন পরিষ্কার বাতাস খেলতে পারে। ঘরে বাতাস আসবে, কিন্তু ছেলের গায়ে যেন জোরে বাতাস না লাগে। ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় খুব বেশি। প্রায়ই দেখা যায়, শিশু ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকে। বিশেষত ঘুমের সময় যদি ভিজা বিছানায় থাকে কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস আদুল গায়ে লাগে, তবে বিপদের ভয়। ফ্লানেলের টুকরো দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রাখবে। শোবার ঘরে কেরোসিনের আলো রাখতে নাই। এককোণে সর্ষের তেলের একটা প্রদীপ রাখবে।

যদি সম্ভব হয়, শিশুকে আলাদা বিছানায় শোয়ানো ভালো। তাহলে সে স্বাধীনভাবে নড়তেচড়তে পারবে। মায়ের সঙ্গে শুলে সে ততটা পরিষ্কার বাতাস পায় না, মায়ের নিশ্বাসের বাতাসে তার অনিষ্ট হয়। মশামাছির উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য মশারি খুব দরকার। ঘরের মেজেতে বা কোনো পাত্রে জল খোলা থাকলে তাতে মশা জন্মায়; ঘরে আবর্জনা থাকলে মাছি হয়। যাতে মশা ও মাছি না জন্মাতে পারে, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা চাই। তার ঔষধ কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। কাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন রৌদ্র দেওয়া চাই; রোদ না থাকলে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিংবা কাঠকয়লার আগুনে বিছানার গরম কাপড় করে নেবে।

শিশুর সামান্য অসুখ হলেও যত্ন করা চাই। ছেলেদের পরিপাক, অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। কাঁদলেই দুধ খাওয়াবে না, বরং অন্য কোনো অসুবিধা আছে কি না তা তদন্ত করতে হবে। ঔষধ ব্যবহার যথাসাধ্য কম করবে। ঔষধের অভ্যাস ভালো নয়। খুব দরকার না পড়লে ডাক্তার ডাকবে না। আর যখন ডাক্তার ডাকবে, তখন ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি জানি, অনেক সময় গিন্নীরা ডাক্তারকে ফাঁকি দেন; অর্থাৎ ডাক্তারের উপদেশ মানেন না; পরে ডাক্তারকে মিথ্যা কথা বলেন যে, হ্যাঁ, ঠিক সময়মতো ঔষধ দিয়েছি; ঐ পথ্য ছাড়া আর কিছু খায়নি। এতে অনিষ্ট কার—ডাক্তারের, না গিন্নীদের—আপনারাই ভেবে দেখুন। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ঠিক নিয়মমতো হলে শিশুদের বেশি অসুখ না হওয়াই সম্ভব। পরিষ্কার বাতাস সবচেয়ে দরকারী জিনিস। মানুষ খেতে না পেলে ১৩ দিন, জল না পেলে ৩ দিন বাঁচাতে পারে, কিন্তু বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না। আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র সর্বপ্রথম বাতাস খেতে অর্থাৎ নিশ্বাস নিতে আরম্ভ করি, আর জীবনের শেষমুহূর্তে নিশ্বাস নেওয়া ছাড়ি। তাই বলি, পরিষ্কার বাতাসটা সবচেয়ে বিশেষ দরকারী।

কেবল যে আমাদের দেশেই বেশি লোক মারা যাচ্ছে তা নয়। মানবজাতির এই যে ভয়ানক অধঃপতন—এটা প্রথমে ইংল্যান্ড ১৮৯৯ ও ১৯০২ সনে বুয়র যুদ্ধের সময় অনুভব করেন। সৈন্য সংগ্রহ করবার সময় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে যখন একে একে অনেক লোককে সেপাই হবার উপযুক্ত নয় বলে বাদ দিতে লাগলেন, তখন কর্তাদের চৈতন্য হলো যে, শিশু রক্ষার উপায় করতে হবে, নচেৎ সমস্ত দেশের লোক অধঃপাতে যেতে বসেছে।

এবারের যুদ্ধের সময় ফ্রান্স বুঝতে পারলেন যে, তাঁর লোকবল কমে যাচ্ছে; তাই শুনেছি তাঁরা আইন করেছেন যে, গভর্নমেন্ট দেশের পোয়াতিদের প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে বৃত্তি দিবেন, যাতে শিশুর যত্ন হয়। যে-ঘরে চারিটি ছেলেমেয়ে আছে, সে স্থলে ছেলের বাপকেও একটা আলাদা বৃত্তি দেওয়া হয়। ফল কথা, ইউরোপ মানুষরক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছেন, এখন আমাদের সাবধান হবার পালা।

আমার মনে হয়, এ শিশু মহামারীর আর-একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। ডাক্তার ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'মায়ের কর্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়।' যে নিজেই ১২/১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্তব্য শিখতে সময় পেল কখন? উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই।

মেয়েদের শরীর যাতে ভালো থাকে, সেদিকেও নজর রাখা দরকার। বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভালো রাখবার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে বটে, তা তো কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত করবার যো-টি নেই। কারণ ছাত্রীর মা-বাপ ড্রিল করতে বারণ করেন। মেয়েরা ১২ বছর বয়স পর্যন্ত জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে, তারপর তাদের বিয়ে হবে; ফল—ছেলে বাঁচে না, কপাল মন্দ!

আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, আজ আমি যা বলছি, তা এই প্রথম বলা নয়। আমি ১৪ বছর পূর্বে বলেছিলাম, 'যাঁরা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহলোয়ান' দেখিতে চাহেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধহয়, তাঁরা সুকুমারী-গোলাপ লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!' ইত্যাদি। (মতিচূর প্রথম খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা)। যা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম, স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয়, বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়ালেখা শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়েমানুষ বেশিরভাগ মরে কেন? কারণ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখছি, শিশুরক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মাদের রক্ষা করা দরকার। ভালো ফসল পেতে হলে গাছে সার দেওয়া দরকার। বুঝলেন? মেয়েদেরও খাওয়াদাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারিদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী; তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।

টীকা

১. বিগত ৬ এপ্রিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত হয়। সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

২. কিছুদিন হইল ডাক্তার মিস বি. এম. বোস, এম. বি. মহোদয়া গ্রীয়ার পার্কে সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দানকালে খাদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'দেখ মেয়েরা! তোমরা এক তরকারি দিয়ে ভাত খাবে। সাত রকম তরকারি খেলে পেটে অসুখ হয়। মনে রেখো, এক সময়ে এক তরকারির বেশি খাবে না।' গত ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'আল এসলাম' পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মোহাম্মদ (সা.) শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই—'হজরত মোহাম্মদ (সা.) এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তিনি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতি ভোজন দোষ দূর করিবার জন্য এক তরকারি দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারি দিয়া আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয়, (প্রভৃতি) বহু সংখ্যক ব্যাধি একবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীকে অর্ধস্বর্গে পরিণত করিতে পারে।'

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন বেচারা গরিব মানুষেরা কেবল শাকভাত বা ডালভাত খায় বলে তাদের অসুখবিসুখ বড়লোকদের তুলনায় অনেক কম হয়। বড়লোকেরা নানা রকম চর্ব্য চোষ্য খেয়ে-খেয়ে ব্যাধির আধার হয়ে পড়েন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. শিশুকে হরলিক্স মিল্ক ও বেনজারস ফুড প্রভৃতি কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ানো সম্বন্ধে একটি উর্দু কবিতা মনে পড়ল, যথা

'তিফিল মেঁ বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কী?
দুধ তো ডিব্বে কা হায়, তালিম হায় সরকারি কী!!'

অর্থাৎ বেচারা শিশু পিতামাতার স্বভাবের গন্ধ লাভ করিবে কোথা হইতে? সে তো টিনের ডিবের কৃত্রিম দুধ খায়, আর শিক্ষা লাভ করে গভর্নমেন্টের! সত্যই তো মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু মাতার স্বভাবের প্রভাব লাভ করিবে কেমন করিয়া?

স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি—'

ইত্যাদি চিরসত্য কথাও মিথ্যা হইয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিফল

[রূপকথা]

কাঙ্গালিনী বহুদিন হইতে পীড়িতা। তাঁহার জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে—কাঙ্গালিনী বুঝি এখন মরেন। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে না—চিকিৎসা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবার আহার্যও জোটে না, একমাত্র জীর্ণকন্থা দারুণ শীত ও লজ্জা নিবারণের সম্বল। যিনি এককালে ভোলাপুরের রানী ছিলেন, তিনি অদ্য কাঙ্গালিনী!

কাঙ্গালিনী তরুতলে শ্যামল দূর্বাশয়নে শায়িতা। অসংখ্য মশামাছি তাঁহার ক্ষত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে। তিনি রোগে ভুগিয়া এত দুর্বল হইয়াছেন যে, মশামাছিও তাড়াইতে পারেন না। তাঁহার বালকপুত্র নবীন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে! সে কখনো দূর্বা লইয়া খেলা করে, কখনো বা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া মাছি তাড়ায়। কাঙ্গালিনী যখন অসহ্য যাতনায় অস্থির হন, মুদ্রিত নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেন, নবীন তখন তাহার ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলে, 'মা! আমি বড় হইলে তোমাকে এত এত ভাত আনিয়া দিব, তোমায় বানারসি শাড়ি পরাইব!'—নবীনের বালসুলভ বাচালতায় তিনি আপন যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃদু হাস্য করেন।

তরুশাখায় বসিয়া একটি পাখি মধুরস্বরে বলিতেছিল—'চৌদ্দ পুত—এত দুখ!'[১]

তাহা শুনিয়া কাঙ্গালিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'পাখিটা আমারই দুঃখগাথা গাহিতেছে! আমি শত শত পুত্রের জননী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! আমার এ দুঃখ অমানিশা কি কখনো পোহাইবে?'

দর্পানন্দ নূতন বুটজুতা পায়ে মচ্‌মচ্‌ করিয়া আসিয়া কাঙ্গালিনীকে সহাস্যে বলিলেন, 'মা! আর তোমার দুঃখদারিদ্র্য রহিবে না, আমি তোমার জন্য সোনার মল গড়াইতে দিয়াছি!' কাঙ্গালিনী অতিকষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বাবা আগে প্রাণে বাঁচি তো! ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত'—

দর্প। (বিরক্তির সহিত) তোমার দুর্নিবার ক্ষুধার তৃপ্তি কিসে হইবে, আমি তো জানি না। বুড়া মানুষদের লইয়া বড় জ্বালাতন সইতে হয়। তুমি বিফ-টি ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না, তবে খাইবে কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঙ্গালিনী। আমি গরিব মানুষ, একমুঠা মুড়িমুড়কি পাইলে বাঁচি।

দর্প। ও-সব অসভ্য লোকের কুখাদ্য। তুমি যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও, তবে উপবাসে মর। আমি আর তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না। দেখি তোমার জ্বর সারিয়াছে কি না, এই নাও একমাত্রা কুইনাইন খাও।

কাঙ্গালিনী। আমার রোগ কুইনাইনে সারিবার নহে।

'তবে মরিতেছ মর!'—এই বলিয়া দর্পানন্দ চলিয়া গেলেন।

কাঙ্গালিনীর অন্যতম পুত্র প্রবীণ আসিয়া মাতার নিকট বসিলেন। তিনি সস্নেহে জননীর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'মা! তুমি দিন দিন বড়ই রোগা হইতেছ।'

কাঙ্গালিনী দর্পানন্দের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াছিলেন, এখন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'সেজন্য তোর ভাবনা কেন? তোদের 'শেরি', 'শ্যাম্পেনের' অভাব না হইলেই হইল!'

প্রবীণ। বন্ধুবান্ধবসহ 'শেরি', 'শ্যাম্পেন' পান করেন তোমার ধনবান পুত্র দর্পানন্দ; সে কথা আমাকে বল কেন মা? আমি তো সুরা স্পর্শ করি না, কেবল বিস্কিট খাই। আর এ কী কথা বল মা—তোমার জন্য আমরা ভাবি না? আমরা তোমার এতগুলো সন্তান থাকিতে তুমি অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে?

এই সময়ে শাখাস্থিত পাখিটা আবার ডাকিয়া উঠিল—'চৌদ্দ পুত—এত দুঃখ'। প্রবীণ তদুত্তরে বলিলেন, 'না পাখি, আর এত দুঃখ থাকিবে না—আমরা মায়ের দুঃখ দূর করিব।'

কাঙ্গালিনী। হাঁ, মরিলে তো দুঃখ দূর হয়ই—এখন আমি মরিতে প্রস্তুত।

নবীন মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথন বুঝিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মাতার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল, আর এক-একবার ভ্রাতার মুখপানে চাহিতেছিল। মা মরিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঙ্গালিনী পুত্রকে আদর করিয়া বলিলেন, 'তুই কাঁদিস না, আমি মরিব না। তোর দাদার সঙ্গে খেলা করিতে যা।'

নবীন। এই তো আমি বড় হইয়াছি, আর খেলা করিব না। চল দাদা, মার জন্য ওষুধ আনি গিয়া।

প্রবীণ। আমাদের সাধ্যমতে যে ঔষধ আনি তাহাতে মায়ের উপকার হয় না। মা! তুমি কি ঔষধ খাও না?

কাঙ্গালিনী। থাক বাবা! আমার জন্য আর ভাবিও না। এখন আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়! তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তোমাদের বালাই লইয়া আমি মরি!

নবীন। (সজল নয়নে) তুমি মরিলে আমি বড় কাঁদিব। মা গো! তোমায় মরিতে দিব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঙ্গালিনী। ওরে হতভাগা ছেলে! তোরই জন্য মরিতে পারি না। যেদিন সিংহাসনচ্যুত হইলাম, যেদিন রাজরানীর পদ হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম, সেইদিন মরিতে চাহিয়া ছিলাম; কিন্তু তোরা অসহায় শিশু ছিলি বলিয়া মরি নাই! তোমাদের এই অবস্থায় ফেলিয়া মরিতেও কষ্ট হয়। নচেৎ মরণে ভয় করি না—এমন ঘৃণিত জীবন বহন করা অপেক্ষা শতবার মৃত্যু শ্রেয়।

নিন্দুককে সঙ্গে লইয়া দর্পানন্দ এই সময় আবার আসিয়া বলিলেন, 'ঔষধপথ্য না খাইলে মানুষ বাঁচে কীরূপে? মা! তুমি এমন অবোধ মেয়ে কিছু বুঝ না। আমি সুবর্ণমল পরাইয়া তোমার চরণ উজ্জ্বল করিতে চাই, তবু তুমি সন্তুষ্ট হও না। আবার বলি কুইনাইন খাও।'

কাঙ্গালিনী। দেখ দর্প! আমাকে আর জ্বালাতন করিস না। আমি দীনদুঃখিনী অন্নভিখারিনী, তোমার স্বর্ণমল আমার পক্ষে উপহাস মাত্র। আর আমার রোগ ঔষধে সারিবার নহে। যাহাতে এ রোগ সারে, সে-কার্য তোমার ন্যায় আনাড়ি পুত্রের অসাধ্য। তুমি নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিও, আর চাই কী?

নিন্দুক। যাহাতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, এমন কার্য দর্পানন্দ কখনো করে নাই, এখন সুবর্ণবেড়ি পরাইয়া মায়ের চরণ উজ্জ্বল করিতে চাহিয়াছিল, বেচারার সে-সাধও অপূর্ণ রহিল! অবশেষে কুইনাইন খাওয়াইয়া মায়ের মুখ তিক্ত করাও হইল না।

কাঙ্গালিনী। যাও নিন্দুক! তোমার কথা শুনিলে আমার গা জ্বলে।

প্রবীণ। কী করিলে মা তোমার রোগ সারিবে, আমি প্রাণপণে সে-সাধনা করিব। যদি তোমার রোগ ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি, ধিক আমার জীবনে! ধিক আমার শিক্ষা-দীক্ষায়!

নিন্দুক। ব্যস! আর ভাবনা নাই! প্রবীণ আমার অদ্বিতীয় বাকপটু—বাক্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে!

নবীন। তোমার পায়ে পড়ি, বল মা! কী করিলে তুমি ভালো হইবে!

কাঙ্গালিনী। বলিলে লাভ কী? তুই কি সে ঔষধ আনিতে পারিবি?

প্রবীণ। আমি আনিতে পারিব—আমি থাকিতে তোমার চিন্তা কি মা?

কাঙ্গালিনী। তবে শুন। বহুদিনের কথা—জনৈক সন্ন্যাসী আমার বাড়ি অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, আমি পুত্রকন্যার প্রতি তুল্য ব্যবহার করি না। তিনি বিদায় লইয়া যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, 'বৎসে তুমি পুত্রকে অধিক স্নেহ কর, কন্যাকে একটুও আদরযত্ন কর না, ইহা বড় অন্যায়। পরিণামে তুমি এই অতি আদুরে পুত্রের দ্বারা কষ্ট পাইবে।' আমি ভাবিলাম, কন্যার প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করিলে লাভ কী? কন্যা কি আমার ভোলাপুর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে? প্রকাশ্যে ব্যস্তভাবে বলিলাম, 'প্রভো! আমায় শাপ দিলেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি শাপ দিব কী, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা করে তাহাকে সে কর্মফল ভোগ করিতেই হয়। কণ্টক বপন করিয়া কেহ কুসুম চয়ন করে কি? অযোগ্য পুত্রের জননী হওয়া এবং অপত্যস্নেহে পক্ষপাতিতা করিবার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।' আমি পুনরায় তাঁহার পদযুগল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিনে আমার শাপাবসান হইবে?' তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কৈলাস শিখরে মুক্তিফলের গাছ আছে, যে-দিন কেহ তোমাকে সেই গাছের ফল আনিয়া খাওয়াইবে, সেইদিন তুমি শাপমুক্ত হইবে।'

প্রবীণ। আমি এখনই তোমাকে মুক্তিফল আনিয়া দিতেছি।

দর্প। কৈলাস পর্বত এখন মায়াপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত। সুতরাং মুক্তিফল আনয়ন সহজ নয়। মা! তুমি এমন কথা বল যাহা মানবের সাধ্যাতীত।

নিন্দুক। কোনো কার্যই মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

প্রবীণ। আমি মায়াপুরের রাজার চরণে ঐ ফল ভিক্ষা চাহিব। আমি সম্রাটের চরণ উদ্দেশে চলিলাম—

কাঙ্গালিনীর দুহিতা শ্রীমতী কাঁদিয়া বলিলেন, 'আহা! মা আমাদের প্রতি অনাদর অবহেলা করার জন্য শাপগ্রস্তা হইয়াছেন। তাই আমরা কি মায়ের কাজ করিব না? চল দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাহিতে যাইব।'

দর্প। তুমি আবার কোথায় যাইবে? তুমি যেখানে আছ, সেইখানে থাক, আর একপদ অগ্রসর হইও না।

নিন্দুক। (করতালি দিয়া) শ্রীমতী আর ফাটকে আটক রহিবে না। আর মায়ের চিন্তা কী?—এইবার শ্রীমতী মুক্তিফল আনিবে।

শ্রীমতী। (স্বগত) দর্পদাদা অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবেন না, নিন্দুক দাদার বিদ্রূপবাণ ততোধিক অসহ্য! যদি ঈশ্বর সহায় হন, তবেই মায়ের সেবা করিতে পারিব। (প্রকাশ্যে) নিন্দুক দাদা! তোমার বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, বরং তোমার দুর্মতির জন্যই আমার দুঃখ হয়—আমি তোমারই জন্য ব্যথিত।

নিন্দুক। নেহাল হইলাম! শ্রীমতী আমার প্রতি দয়া করেন, আর চাই কী?

প্রবীণ। শ্রীমতী, তোমার রচিত দুই-চারিটি গানের নকল আমাকে দাও দেখি, ভিক্ষা প্রার্থনার সময় গানের প্রয়োজন হয়।

শ্রীতমী। ঐ জন্যই তো আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম—আমিও গান গাইতাম—

প্রবীণ। না বোন, তোমাকে কৈলাস পর্যন্ত যাইতে দিতে পারি না। তুমি আমার সহিত গল্প কর, উপন্যাস পাঠ কর, আমার সঙ্গে পারমার্থিক গান গাও—এই পর্যন্তই যথেষ্ট; ইহাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা বা সমকক্ষতা দিতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দুক। সীমা লঙ্ঘন করিও না, শ্রীমতী, লোক হাসাইও না।

দর্প। দেখ তো সুমতি কেমন সরল মেয়ে, সে তো কুটিরের বাহিরে পদার্পণ করে না।

শ্রীমতী। সুমতি বোকা, তাই কোণের ভিতর লুকাইয়া থাকে। আর তাহার বাহিরে আসিবার সাহস কই?

সুমতি কাজ না পাইয়া কুটিরাভ্যন্তরে বসিয়া জীর্ণকন্থা সংস্কার করিতে ছিলেন এবং নীরবে সকলের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন; তিনি শ্রীমতীর শেষ কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, 'আমি বোকা হই বা ভীরু হই, কিন্তু যথাবিধি শক্তি সঞ্চয় না করিয়া দিদির মতো হঠাৎ বাহিরে যাইব না। দিদি বাহির হইয়াই এমন কী দিগ্বিজয় করিয়াছেন? কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন?—ঐ উপন্যাস পাঠ করা আর দাদার সহিত সুর মিলাইয়া গান করা—ব্যস! এই পর্যন্তই তো?'

দর্প। সুমতি বোকা বলিয়াই তো আমরা উহাকে একটু কৃপাচক্ষে দেখি।

শ্রীমতী। বেশ। দেখিব, সুমতি আর কতদিন তাহার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব গোপন রাখে। কিন্তু দাদা, আমাদিগকে মস্তক উত্তোলন করিতে না দিলে তোমাদেরও বলবৃদ্ধি হইবে না যে!

নিন্দুক। চুপ কর শ্রীমতী, তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। তুমি নিজের কাজ দেখ, হাঁড়িবাসন ধোও গিয়া।

২

কৈলাস পর্বত শিখরে মায়াপুরের রাজার প্রমোদ কানন। আঠারো হাজার দৈত্য মুক্তকৃপাণ হস্তে উদ্যান রক্ষা করিতেছে। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু দূরে থাকুক—পক্ষী, মক্ষিকা, পিপীলিকা পর্যন্ত সে-কাননে প্রবেশ করিতে পারে না।

মায়াপুরের বৃদ্ধ রাজা দিবাশেষে রাজাকার্য সমাধা করিয়া কর্মচারীবৃন্দকে একে একে বিদায় দিলেন। এখন রাজকুমার মন্ত্রী এবং কতিপয় প্রধান কর্মচারী মাত্র আছেন। এমন সময় একজন দৈত্য রাজসভায় আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি?'

রাজা। নির্ভয়ে বল।

দৈত্য। কৈলাসশিখরে জিনকুল চূড়ামণি মহারাজার প্রমোদ কাননে মুক্তিফলের গাছ আছে—

মন্ত্রী। হাঁ, তাই কী?

দৈত্য। সে অমর-বাঞ্ছিত বৃক্ষে শত বৎসরে একটি ফল হয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনৈক কর্মচারী। হাঁ জানি। আবার তাহাতে ফল ধরিয়াছে, ইহাও আমরা অবগত আছি। তোমার বক্তব্য শীঘ্র বল, দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন নাই।

দৈত্য। (ভয় কম্পিত কলেবরে) জনশ্রুতি শুনিতে পাই, ভোলাপুর হইতে মানবনন্দন মুক্তিফল চয়ন করিতে আসিতেছে—

যুবরাজ। অসম্ভব! মিথ্যা জনরব।

মন্ত্রী। যদিই জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে তোমরা আঠারো হাজার দৈত্য আছ কিসের জন্য?

কর্মচারী। তোমাদের ন্যায় ভীমকায় জাগ্রত প্রহরী থাকিতে ভয় কী? বিশেষত পৃথিবীতে ভোলাপুর অতিভ্রান্ত নগণ্য দেশ, তথাকার মানবসন্তান কি তোমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান?

দৈত্য। না মহাশয়! আমি কেবল রাজধানীতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমরা সকলে সশস্ত্রে প্রস্তুত আছি—আবশ্যক হইলে কৈলাস ভূধরে মানবরক্তের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।

মন্ত্রী। বীরের উপযুক্ত কথা! এখন তুমি যাইতে পার।

যুবরাজ। (আসন ত্যাগ করিয়া) আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে। আপনি বলুন।

যুবরাজ। আমি রাজকার্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আস্পর্ধা রাখি না। কিন্তু এ-সময় মন্ত্রিবরের কথার প্রতিবাদ না-করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি দৈত্যদিগকে মানবরক্তের নদী প্রবাহিত করিতে উৎসাহ দিয়া বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই। ভোলাপুরের নিবীর্য মানব ধ্বংস করা আমাদের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জাতির পক্ষে কিছুমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। পরন্তু, মায়াপুররাজ দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ নামে জিনজগতে বিখ্যাত। মায়াপুর রাজ্যে নরশোণিত পাত হইলে আমাদের প্রতিবেশী জিনরাজগণ কী বলিবেন? সমস্ত পরীস্থান আমাদিগকে বীর না বলিয়া কাপুরুষ বলিবে না কি?

মন্ত্রী। যুবরাজের কথা অতি যুক্তিসঙ্গত। মানবরুধিরে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হইবে, এমনকি সমগ্র পরীস্থান কলুষিত হইবে। কিন্তু মানবের আস্পর্ধাও তো অসহ্য! তাহারা মুক্তিফল লইতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার কী উপায়?

কর্মচারী। যুবরাজ অবশ্যই উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা। বৎস! তোমার যুক্তি অতি সারবান। তুমি পরীস্থানের মুকুটতুল্য মায়াপুর সাম্রাজ্যের আসন্ন কলঙ্ক মোচন করিলে। এখন যাহাতে কার্যসিদ্ধ হয় তাহাই কর। তুমি কৃতকার্য হইলে তোমাকে রাজ্যদান করিয়া আমি বানপ্রস্থ লইব।

সকলে। যাহাতে সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙে, তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবরাজ। কথিত আছে, মানবজাতি অতিশয় মূর্খ এবং জিনজাতি ও দৈত্যগণ মায়াবিদ্যায় পারদর্শী। অজ্ঞ বিবেকহীন মানবকে ইন্দ্রজালে বশীভূত করা অতি সহজ ব্যাপার। মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর করুণ সুরে সহানুভূতিসূচক মোহন মুরলী বাজাইলে, তাহা শুনিয়া মানবগণ তালে তালে নৃত্য করিবে। তখন অন্যান্য জিন-গায়কেরা তাহাদের বলিবে, চল আমরা তোমাদিগকে মুরলীধরের নিকট লইয়া যাই। তাহাতে মানুষেরা সম্মত হইলে জিন ও দৈত্যগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে।

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী করতালিসহকারে যুবরাজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর যুবরাজ প্রধান প্রধান দৈত্য, প্রহরী ও মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধরকে লইয়া কয়েকদিন গোপনে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিক করিলেন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, দৈত্যগণ কোনোপ্রকারে মানবের অনিষ্ট করিবে না। তাহারা কেবল মানুষের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যথাকালে মায়াপুরে সেই সংবাদ প্রেরণ করিবে।

বহুদিন পূর্বেই কৈলাস পর্বতের চতুর্দিকে কণ্টক রোপণ করা হইয়াছিল। জিন, পরী ও দৈত্যগণ মায়াযানে ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে।

৩

লায়েক দিবানিশি জননীর সেবা করিয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের আহার-নিদ্রায় উদাসীন থাকায় তাঁহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তিনি মাতার পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে ছিলেন। পুত্রের সস্নেহ করস্পর্শে কাঙ্গালিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'লায়েক! তুমি এখানে! তাই তো, লায়েক ভিন্ন অভাগিনী মায়ের ব্যথায় আর কে ব্যথিত হইবে? তা বাছা! তোমার যত্নে আমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। মুক্তিফল প্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত আমি ব্যাধিমুক্ত হইব না।'

শ্রীমতী ছোট একটি থালায় কিছু খাবার আনিয়া মাতাকে বলিলেন, 'মা, তুমি বড়ই দুর্বল হইয়াছ। এখন কিছু একটু মুখে দাও, তবে একটু সবল হইবে।'

কাঙ্গালিনী। 'মুক্তিফলের পূর্বে আর কিছু ভক্ষণ করিতে পারি না।'

লায়েক। প্রবীণ কবে না-কবে ফল আনিবে! এদিকে তুমি-যে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছ, মশামাছি তাড়াইবার সামর্থ্যও তোমার নাই।

শ্রীমতী। দাদার ফল আনয়নের পূর্বেই হয়তো মা মারা যাইবেন। হায়! রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ আসিলে লাভ কী?

কাঙ্গালিনী। আমার জন্য ভাবিস না মা। আমি মরিব না—আমি মরিলে জগতে ক্লেশ-ভার কে বহন করিবে? উপবাসে থাকিয়া নানা ব্যাধির আধার হইয়া অশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। এই-যে পরিধানে জীর্ণ কন্থাখণ্ড—ইহার একপ্রান্ত মায়াপুর রাজ্যের জিনদের হস্তে, অন্যপ্রান্ত আমি অভাগিনী অর্ধউলঙ্গিনী দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাণপণে ধরিয়া কটিদেশে বেষ্টন করিয়া কোনোমতে লজ্জা নিবারণ করিতেছি! এত অপমান সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে! হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর।

ইতিমধ্যে লায়েক রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীমতী শশব্যস্তে দৌড়িয়া ভ্রাতার নিকট আসিলেন। সহোদরের আসন্নকাল বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী দীননয়নে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—'দেখ মা! দাদা এমন হইলেন কেন?'

কাঙ্গালিনী তখন কোনোরূপে উঠিয়া মুমূর্ষু পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'লায়েক! লায়েক! বাপ! তুই আমারে ছাড়িয়া চলিলি! হায়! এ দুর্দিনে তুই আমার সহায় ছিলি! আমার মরণ লইয়া তুই মরিলি!'

লায়েক অর্ধনির্মীলিত লোচনে বলিলেন, 'মা, তুমি কাতর হও কেন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মায়ের সেবা করিতে গিয়া মরিতেছি। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কী আছে? যে নিজের জন্য মরে তাহার মৃত্যু ক্লেশদায়ক; যে মায়ের চরণে আত্মবলিদান করে—'এইমাত্র বলিয়াই লায়েক প্রাণত্যাগ করিলেন।

কাঙ্গালিনী। এইজন্য লায়েককে আমার শুশ্রূষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লইয়া লায়েক মারা গেল। হায়! অভিশপ্তার শাপ মোচন করে, কাহার সাধ্য! পুত্রগুলিকে অধিক ভালোবাসিতাম—অতি সোহাগে তাহাদের কেহ হইল দর্পানন্দ, কেহ হইল কৃতঘ্ন, কেহ হইল নিন্দুক, কেহ হইল মাতৃদ্রোহী—আর যে মানুষ নামের উপযুক্ত হইল, সে সোনার চাঁদ লায়েক শমন কবলে পড়িল। আর আমার আশাভরসা কোথায়?

শ্রীমতী। মা, নৈরাশ্যে আকুল হইও না—এখনো ধীমান দাদা, প্রবীণ দাদা ও নবীন আছেন; আমিও তোমার দীনতমা সেবিকা আছি। আশা ছাড়িতে পারি না। তোমার এ-দুর্দশা দূর হইবে এরূপ আশা করি।

কাঙ্গালিনী। দর্পানন্দের এই ঐশ্বর্য থাকিতে আমি দীনহীনা, এ-দুঃখ কাহাকে বলিব?

নবীন লায়েকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকাডাকি করিল। লায়েকের সাড়াশব্দ না পাইয়া, দ্রুতপদে শ্রীমতীকে গিয়া বলিল, 'দিদি, লায়েক দাদা এ-সময় ঘুমাইলেন কেন?'

শ্রীমতী। আমাদের লায়েক দাদা ঘুমান নাই—অমর হইয়াছেন।

নবীন। আমিও অমর হইব, দিদি!

কাঙ্গালিনী। রেশ! যা, এখন বকিস না, খেলা কর গিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবীন। একা একা খেলা ভালো লাগে না, প্রবীণ দাদা কখন ফিরিবেন?

কাঙ্গালিনী। প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিবেন।

নবীন। দাদা মুক্তিফল আনিতে পারিবেন না, আমি আনিতে যাই।

শ্রীমতী। তুমিও তো এখন এতবড় হইয়াছ, বেশ তো যাও না—ফল লইয়া শীঘ্র ফিরিও—আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৪

প্রবীণ কৈলাস ভূধরের পাদমূলে বসিয়া প্রতিদিন মায়াপুরের রাজাকে সম্বোধন করিয়া আবেদনের পাণ্ডুলিপি লিখেন। আবেদন লিখিতে ইতিমধ্যে ঝাড়া সাত মণ মসি ব্যয় হইয়াছে; লেখনীর জন্য দেশের সমুদয় খাগড়াবনের খাগড়া প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে; কাগজে আর কুলায় না, এখন মানকচুর পাতায় আবেদন লিখা যায়। এদিকে আবার মানকচুপত্রের বিনাশ দেখিয়া মানকচুর দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বরাহকুল অন্নদাতা দেবতার নিকট অভিযোগলিপি প্রেরণ করিয়াছে।

প্রবীণ এক-একবার এক-এক দৈত্যের দ্বারা আবেদনলিপি প্রেরণ করেন, কিন্তু আবেদনের কোনো উত্তর আর প্রাপ্ত হন না। মায়াবী গায়কেরা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, রাজা স্বহস্তে মুক্তিফল চয়ন করিয়া তোমাদিগকে দিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

প্রবীণ! (মায়াবীর প্রতি) আমি তো নিশ্চিন্ত আছিই। কিন্তু বাড়ি গেলেই দর্পানন্দ মাতাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, 'তোমার গুণধর পুত্র মুক্তিফল আনিল কই?' আর ইদানীং নবীন বড় হইয়াছে, তাহার তাড়া আরও অসহ্য বোধ হয়। সে আমাকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করে।

মায়াবী। নবীনটাকে কোনোরূপে জব্দ করিতে পারেন না।

প্রবীণ। পঁচিশ-ত্রিশজন দৈত্য প্রহরী সহায় হইলে নবীনকে জব্দ করা কঠিন ব্যাপার নয়।

মায়াবী। নবীনের ধরা পাইলে হয়—সে বড় দাম্ভিক, সে দৈত্যদের নিকট আসিয়া ফল প্রার্থনা করে না এবং আমাদের কাছে মোটেই ঘেঁষে না, সর্বদা দূরে দূরে থাকে। আর দর্পানন্দের বিদ্রূপের জন্য ভাবিবেন না, তিনি একপ্রকার আমাদের হাতেই আছেন। তিনি বানর সাজিতে চাহেন, সেজন্য লাঙ্গুলের প্রয়োজন। সেই লাঙ্গুল লাভের জন্য তিনি এখন জিনের সাধনা করিতেছেন।[২] এবার আমরা তাঁহাকে লাঙ্গুল বন্ধনে বাঁধিলে তিনি আর নড়িতে পারিবেন না—তাঁহার মুখে কথাটি ফুটিবে না। এ-বৎসর যুবরাজের জন্মোৎসবের দিন দর্পানন্দ লাঙ্গুলাবদ্ধ হইবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবীণ। (স্বগত) আমিও লাঙ্গুল লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন নবীন হাসিবে, সেই ভয়ে লাঙ্গুলের লোভ সম্বরণ করিলাম। দর্পানন্দের তো লাজ নাই, কাজেই ল্যাজেও আপত্তি নাই! (প্রকাশ্যে) ঐ দেখুন, দর্পানন্দ সবান্ধবে আসিতেছেন।

মায়াবী। আসুন, আপত্তি নাই, উনি আমাদের বন্ধু।

দর্প। (মায়াবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) কুশলে আছেন তো?

মায়াবী। আসুন, বসুন। আপনার সংবাদ কেমন?

দর্প। আমাদের সবই মঙ্গল। আমার লাঙ্গুলের কথাটা বোধহয় জিনকুল চূড়ামণি মহারাজের স্মরণ আছে?

মায়াবী। অবশ্য স্মরণ আছে। কিন্তু এক-কথা, আপনিও মুক্তিফলের প্রার্থী নাকি?

দর্প। না মহাশয়, আমি কি পাগল? যাহাতে পূজ্যপাদ মায়াপুররাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ আমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব; সে-কথা আমার যমজ ভ্রাতা প্রবীণকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রবীণ। (সভয়ে) আমি কী করিয়াছি? আমি কি বলপূর্বক মুক্তিফল আনিতে যাইতেছি? আমি কেবল রাজার চরণকমলে সবিনয় করপুটে ভিক্ষা চাহিতেছি—দাতার ইচ্ছা হইলে ভিক্ষা দিবেন।

মায়াবী। তাহাই ঠিক। আপনারা রাজার বদান্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা অবশ্যই আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। মুক্তিফল পাকিতে এখনো অনেক বৎসর বিলম্ব আছে, ফলটি পাকিবামাত্র আমরা আপনাদিগকে সাধিয়া আনিয়া দিব।

দর্প। সে-ফলে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধা মাতা মরিতেছেন, মরুন। আমি এবং আমার একশত ছয়জন বন্ধু জিনরাজার অতিশয় ভক্ত—সুতরাং আমরা মুক্তিফল চাই না। (বন্ধুদের প্রতি) তোমাদের রচিত সেই স্তবগানটি গাও দেখি।

দর্পানন্দ প্রভৃতি একশত সাতজন সেতার বাজাইয়া সমস্বরে গাহিলেন

'আমরা ক-জন সবে একশত সাত
অতি অকপট জিন-ভকত নেহাত!
হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে প্রবল বেগে চলে
শীতল বিমল জিনভক্তির প্রপাত,
দিগন্ত কাঁপায়ে ওঠে তার কলনাদ!
ধারি না কাহার ধার
ভগিনী ভ্রাতার মার—
ক্ষুধায় মরুক মাতা, নাই দৃকপাত!
জিনরাজ-ভক্ত মোরা একশত সাত!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান শ্রবণে মায়াবী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বাহবা দর্পানন্দ। বাহবা!! আপনারা অতিশয় বুদ্ধিমান, নিজের সুখস্বার্থ বেশ বুঝিয়াছেন। তবে আর বুড়িটার জন্য চিন্তা কী?'

দর্প। না, বুড়ি মায়ের জন্য আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমাদের সুখশান্তি বজায় থাকিলেই হইল।

প্রবীণ। (স্বগত) আমাকে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নবীন সুখশান্তি ভোগ করিতে দিবে না। ধীমান দাদাও বারম্বার তাড়া দিতেছেন। তিনি বলেন, মুক্তিফল প্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। আমি কেবল মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মুখে বলিয়াছিলাম ফল আনিয়া দিব, কিন্তু নবীন সত্য-সত্যই উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে। (প্রকাশ্যে) তাই তো ভাই, আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।

মায়াবী। দেখুন, আপনারা ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। আমরা ব্যাধিক্লিষ্টা কাঙ্গালিনীর জন্যই মুক্তিফল রক্ষা করিতেছি। নতুবা আমাদের আর কী স্বার্থ?

দর্প ও প্রবীণ। তাই তো আহা! আপনাদের কী দয়া!

মায়াবী। প্রবীণ! আপনাকে আমরা যৎপরোনাস্তি ভালোবাসি, আপনি সতত আমাদের কাছে কাছে থাকিবেন।

প্রবীণ। (অনুচ্চস্বরে) যে আজ্ঞা, আপনারা আমাকে চোখে চোখে রাখিবেন।

(মায়াবীর প্রস্থান)

নিন্দুক বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সকলের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। মায়াবী প্রস্থান করিলে পর তিনি সমক্ষে আসিয়া সহাস্যে প্রবীণকে বলিলেন, 'কি প্রবীণ! মুক্তিফল পাইলে?'

প্রবীণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, 'পাই নাই, পাইবার আশা তো আছে। ধৈর্য ধারণ কর, অধীর হইও না—আমি নিশ্চিত মাতাকে মুক্তিফল আনিয়া দিব। নবীন পর্বতের সন্নিকটস্থিত অরণ্য খানিকটা পরিষ্কার করিয়াছে, সেই পথে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, কৈলাস কতদূর।'

দর্প। সাবধান! ও-পথে পদার্পণ করা উচিত নয়, দৈত্যগণ দেখিতে পাইলে অনর্থ ঘটাইবে।

প্রবীণ। নবীন যে আমাকে ঐদিকে সোপান নির্মাণ করিতে বলে। সে এত কঠিন পরিশ্রম করিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতেছে, আর আমি একটু যাইয়া দেখিব না?

দর্প। তা দেখ, কিন্তু নবীন যেরূপ অবিমৃষ্যকারী, সে ইহার ফলে বিপন্ন হইবে।

নিন্দুক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'নবীন ও প্রবীণের কৈলাস আরোহণ, মুক্তিফল চয়ন—এসব কার্য অতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, কারণ দৈত্যগুলি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে কি না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবীণ। আমি আত্মগোপন করিতে জানি, আমি নবীনের মতো অসতর্ক নই। আমি উভয় কুলের মনরক্ষা করিয়া চলি; নবীনকে বলি, হাঁ সোপান প্রস্তুত করিব, দৈত্যকে বলি, আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকি, যেই তোমরা উপর হইতে মুক্তিফল ফেলিয়া দিবে, অমনি লুফিয়া লইব।

নিন্দুক ও দর্পানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন। প্রবীণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

৫

মায়াপুর রাজসভায় পাত্রমিত্র সকলে উপস্থিত। মহারাজ অসুস্থত। নিবন্ধন সভায় আসিতে পারেন নাই, তিনি অন্তঃপুরে পরীমহলে বিশ্রাম করিতেছেন। যুবরাজ রাজকার্য করিতেছেন।

জনৈক কর্মচারী মুরলীধরকে বলিলেন, 'কই, আপনার বংশীরবে মানব ভুলিল কই?'

মুরলীধর। আমার মাননীয় বন্ধু সম্ভবত পৃথিবীর সমাচার অবগত নহেন; মানুষ ভুলিয়াছে বইকি!

কর্মচারী। প্রবীণের কথা একরূপ, কার্য অন্যরূপ। তিনি মুখে বলেন, 'হাঁ হাঁ, রাজার চরণে শুধু ভিক্ষা চাই', কার্যত কিন্তু তিনি গোপনে নবীনের সহিত কৈলাস পর্বতে আরোহণের নিমিত্ত সোপান নির্মাণ করিতেছেন, এসব সংবাদ মুরলীধর অবগত আছেন কি?

অন্য কর্মচারী। তবে তো চিন্তার বিষয়!

মুরলী। (সহাস্যে) আপনারাও ভালো, প্রবীণের সোপান রচনা ছেলে ভুলানো মাত্র। প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত করিতেছেন, তাও আবার বৎসরে এক ধাপের অধিক নির্মিত হয় না।

যুবরাজ। কথা কাটাকাটির কাজ কী, প্রধান গায়ককে ডাকিয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করা যাউক।

প্রধান গায়ক তৎক্ষণাৎ মায়াযানে আগমন করিলেন।

মুরলী। বলুন কবিবর, ধরণীর কী সংবাদ? প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া গিয়াছেন?

গায়ক। প্রবীণ মুক্তিফল লইতে পারিবেন, তবে এত দৈত্য প্রহরী আছে কেন? কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষেরা কৈলাস আরোহণে কৃতকার্য হইতেও পারেন।

মন্ত্রী। অসম্ভব! অতি অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবরাজ। গায়ক কিরূপে জানিলেন, প্রবীণ কৈলাসশিখরে আরোহণে সক্ষম হইবেন?

গায়ক। প্রবীণ কৈলাসারোহণ করিতে পারিবেন না; সে-বেচারা এতদিন কেবল আবেদন লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন নবীনের প্ররোচনায় তিনি সোপান প্রস্তুত করিতে চাহেন। নবীন তাহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেন না—নবীনই যত অকাণ্ডের মূল।

মন্ত্রী। তথাপি আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। নবীন, প্রবীণ, ধীমান, নিন্দুক, দর্পানন্দ প্রমুখ সকলে মিলিয়া সমবেত চেষ্টা না করিলে, তাঁহারা কৈলাসারোহণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না; অথচ তাঁহাদের পরস্পরে কখনো একতা স্থাপিত হইবে না, সুতরাং আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই। তদ্ব্যতীত কাঙ্গালিনী পুত্র বলিদান না করিলে মুক্তিফল পাইবেন না। আর তিনি অপত্য বাৎসল্যহেতু পুত্র বলি দিতে পারিবেন না, ইহাও আমরা জানি।

গায়ক। তাহা সত্য, কিন্তু লায়েক স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিয়াছেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) বটে? কাঙ্গালিনীর অক্ষম ভীরুপুত্র জীবনের মায়াত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

গায়ক। হাঁ, লায়েকের আত্মত্যাগ সত্য ঘটনা, আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি।

জনৈক সভাসদ। তাহা হইলে বেচারি কাঙ্গালিনীকে মুক্তিফলে বঞ্চিত করা অন্যায়।

মন্ত্রী। (ব্যঙ্গ ভাষায়) বটে? তবে আমরা কৈলাসগিরি হইতে আঠারো হাজার দৈত্য প্রহরী সরাইয়া লই—মানব অনায়াসে নির্বিঘ্নে অপক্ব মুক্তিফল খাইয়া দেখুক, তাহার আস্বাদ কেমন?

অনেকে। (একবাক্যে) না, না। আহা, এমন কাজ করিতে নাই। অবোধ মানবনন্দন স্বকীয় ভালোমন্দ বুঝে না, তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা থাকিতে তাহারা অপক্ব মুক্তিফল ভক্ষণে বিপন্ন হইবে, ইহা আমাদের দয়াসুধাসিক্ত সুকোমল প্রাণে সহিবে না।

মানবের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভাস্থিত সকলে এক-এক ঘটি অশ্রু বিসর্জন করিলেন।

যুবরাজ। (প্রথমে বহু কষ্টে অশ্রুসম্বরণপূর্বক) গায়ক কি বিশ্বাস করেন, অপরিণামদর্শী নবীন পর্বতারোহণ করিয়া এখন মুক্তিফল চয়নে কৃতকার্য হইবেন?

গায়ক। না, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেবল নবীনের আস্ফালন উল্লম্ফন দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

মন্ত্রী। জ্যোতিষশাস্ত্রে জানা যায়, যতদিন কাঙ্গালিনীর কন্যাগণ তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের কার্যে সহায়তা না করিবে, ততদিন কেহই মুক্তিফল লইতে পারিবে না। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঙ্গালিনীর দুহিতা কী প্রকার নগণ্য ও অকর্মণ্য, তাহা আপনারা সকলে অবগত আছেন।

সকলে। তবে আমরা বহু বৎসর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

মন্ত্রী। অবশ্য। এই তো নবীন ও প্রবীণে, সোপান প্রস্তুত ব্যাপারই দেখুন না! নবীন বলেন, 'একধাপ উচ্চে নির্মাণ করি', প্রবীণ বললেন, 'না, নিচে নামিয়া আর-একধাপ প্রস্তুত করি।' নবীন বলেন, 'উপরে উঠি'; প্রবীণ বলেন, 'নিচে নামি'—এই বিষয় লইয়া উভয় ভ্রাতায় কেবল বাকবিতণ্ডা চলিতেছে!

জনৈক পারিষদ। (সহাস্যে) আমার বন্ধু মহোদয়গণ কাঙ্গালিনীর এইসব অযোগ্য পুত্রের আস্ফালন দেখিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইতে বলেন। যদি কেহ শূন্যগর্ভ বক্তৃতা গর্জনে শঙ্কিত হন, তিনি কোকিলের কাকলি শ্রবণেও মূর্ছা যাইতে পারেন।

(সভাসদগণের উচ্চহাস্য)

মন্ত্রী। বাস্তবিক উৎকণ্ঠার কারণ নাই, কেবল কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি দৈত্য মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আমাদিগকে এখন বিরক্ত করিতেছে।[৩]

যুবরাজ। এখন আমরা নিরুদ্বেগ হইলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়; মুরলীধর যথাবিধি মায়াবংশী বাজাইতে থাকুন।

অতঃপর মুরলীধর দ্বিগুণ উৎসাহে মায়াবংশী বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মোহন বাঁশির ললিত সুর শুনিয়া সপ্তসাগর স্তম্ভিত হইয়া গভীর গর্জন ভুলিল; সদাগতি সমীরণ স্থির হইল; তরুলতা স্থাবর জঙ্গম—সকলে উৎকর্ণ হইল; গগনবিহারী বিহগকুল মধুরকাকলি ভুলিয়া গেল—তখন বাঁশির সুরে প্রবীণ ভুলিবেন না কেন? তিনি তো মানুষ বই নন!

৬

কৈলাসের উপত্যকায় নবীন, প্রবীণ, ধীমান ও নিন্দুক উপস্থিত। ধীমান সোপান প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিতেছেন, নবীন তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি কাঁচাবাঁশের মই প্রস্তুত করিতেছে। প্রবীণ অতি ধীরে ধীরে প্রস্তুত সোপান নির্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। নিন্দুক কার্য করিতে আসেন নাই, তিনি অপর কর্মোৎসাহী ভ্রাতাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। নিন্দুক সুবিধা বুঝিয়া কখনো নবীনের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, কখনো-বা প্রবীণকে বিদ্রূপধারায় নাকানিচুবানি খাওয়াইতেছেন। এইরূপে ভ্রাতৃচতুষ্টয় মাতৃকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নবীন। (প্রবীণের প্রতি) দাদা, তোমার দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া গা জ্বলে। আজ পর্যন্ত তোমার উপকরণই সংগৃহীত হইল না—কবে সিঁড়ি হইবে, তবে তুমি উঠিবে? মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবীণ। ইস! আমি ২২/২৩ বৎসর হইতে মাতৃসেবা করিয়া আসিতেছি, কৈলাসচূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, আজ তুই তিন-দিনের ছোঁড়া বলিস কিনা 'মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়!' তুই বুঝি মনে করিস, ঐ ভাঙা বাঁশের মই দিয়া ওঠা যাইবে? একে তো পদচাপে মই ভাঙিয়া যাইবে, দ্বিতীয়ত ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত হইতে রক্ষা পাইবার কী উপায়?

নবীন। পাথরের সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে গেলে তুমি বৃষ্টিজলে ভিজিবে না?

প্রবীণ। আমি কি তোমার মতো অর্বাচীন যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইব? আমি প্রতি ধাপ সিঁড়ির নিচে এক-একটি চোরকুঠরি নির্মাণ করিব, আবশ্যক হইলে—চপলা-চমক দেখিলে তাহার ভিতর লুকাইব।

ধীমান। নিজের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে অত ভাবিতে গেলে পরমায়ু শেষ হইবে, অথচ কার্য কিছুই হইবে না।

প্রবীণ। পথে বিস্তর কাঁটা আছে, তাহা জানো দাদা?

ধীমান। কাঁটার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কেবল কাঁটা কেন, পার্বত্য অরণ্যসঙ্কুল পথে সর্প বৃশ্চিকও আছে, আরও ঊর্ধ্বে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও আছে, সে-সব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নবীন। না, ওসব কিছু মানিব না—বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের? চল (প্রবীণের হাত ধরিয়া) দাদা চল!

প্রবীণ। (স্বগত) আমার সাহসে কুলায় না। (প্রকাশ্যে) তোমার মইটা তো মজবুত নয়, উঠিতে পা কাঁপে যে!

নবীন। বাইকাটা অস্ত্রে ভর দিয়া—কোনোমতে লম্ফ দিয়া একবার উঠিলেই হইল।

প্রবীণ। বাইকাটা অস্ত্রখানি লুকাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রহরী দৈত্যগণ উহা দেখিলে খেপিবে। আর আমার আবেদনলিপিগুলিও অবশ্য সঙ্গে থাকিবে।

নবীন। তোমার আবেদন লিখিতে যতগুলি মানকচুপত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তো সাত গাড়ির বোঝা—সেগুলি বহিয়া লওয়া অসম্ভব। না দাদা, আবেদন-নিবেদনে কাজ নাই—

প্রবীণ। না নবীন, ঐ শুন মেঘ গর্জন। অর্ধপথে ভিজিতে হইবে।

নবীন। ভিজিলেই ক্ষতি কী?

(তিনজন মায়াবী গায়কের প্রবেশ)

১ম গায়ক। আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?

প্রবীণ। নবীন কৈলাস গিরিচূড়া আরোহণ করিতে চাহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দুক। (জনান্তিকে) প্রবীণ কেমন চতুর! তাড়াতাড়ি সে নবীনের যাত্রার কথা বলিল, সে নিজেও যে ঐ পথের পথিক সে-কথা আপাতত গোপন রহিল!

২য় গায়ক। ঐ মই দিয়া উঠিবেন? আপনারা বাতুল নাকি? আর বাইকাটা অস্ত্রে প্রয়োজন কী? ওটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৩য় গায়ক। চলুন, আমরা পথ দেখাইয়া দিব, সুন্দর পাকা রাস্তা আছে।

প্রবীণ। চল নবীন, উহারা পথ প্রদর্শন করিবেন।

নবীন। না, আমরা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিব না।

প্রবীণ। শুনিয়াছি মায়াপুররাজ্যে মুরলীধরের বসতি, তিনি নাকি কল্পদ্রুমবৎ সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১ম গায়ক। হাঁ, যদি বলেন তো আমরা আপনাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই। তিনি স্বহস্তে আপনাদিগকে মুক্তিফল দান করিবেন।

প্রবীণ। কি বল নবীন, চলিবে না?

নবীন। অমন অনেক কল্পতরু দাতার প্রশংসা শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষায় আর আমাদের কুলাইবে না।

প্রবীণ। নিশ্চয় জানিও, মুরলীধরের ন্যায় উদার হৃদয় কল্পদ্রুম দ্বিতীয় আর নাই।

নবীন। আমার তো বিশ্বাস হয় না।

[দূরাগত বংশীধ্বনি]

তোমরা কী চাও নরনারী—
সব দিতে পারে বংশীধারী।
এস গো প্রবীণ! (দূরে যা নবীন,
তোর মুখ দেখিতে না পারি)—
এস বন্ধু নিকটে আমারি।
মুক্তিফল ছার— কত ফুল আর
কোটি ফলে আমি অধিকারী।
রবি যদি চাও, দিব আমি তা'ও,
তারা-হার পরাইতে পারি!
চাহিও না কিন্তু পূর্ণিমার ইন্দু,
শুধু সুধাকর দিতে নারি।
এস গো প্রবীণ, তাড়াতাড়ি।

প্রবীণ। আর কী দেখ নবীন, চল ইঁহাদের সঙ্গে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবীন। আমি যাইব না, মুরলীধর তো আমাকে ডাকেন নাই। তিনি ডাকিলেও যাইতাম না।

'তবে তুমি থাক, আমি চলিলাম।'—এই বলিয়া প্রবীণ নবীনকে ছাড়িয়া গেলেন। জিনগণ তাঁহাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও গভীর অরণ্যে লইয়া গেলেন।[৪] তাঁহারা প্রবীণকে বুঝাইলেন যে, প্রবীণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মুক্তি মোক্ষ—সবই পাবেন। এমনকি জিনেরা তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করিবেন।

প্রবীণ। (আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে) আমাকে সসাগরা ধরণীর রাজা করিবেন, আমি অধমের প্রতি আপনাদের এত অনুগ্রহ!

মায়াবী। শুধু সসাগরা বসুন্ধরা কেন, সৌরজগতের রাজত্বগুলিও ক্রমে ক্রমে আপনাকে দিব। শনির সাম্রাজ্য অতি বিশাল, তাহা জয় করিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে।

প্রবীণ। আহা! আপনাদের দয়ার বালাই লইয়া মরি! আমাকে একেবারে রাজা না করিয়া আপাতত মন্ত্রী করিলেও চরিতার্থ হইব।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা! কোথায় তুমি! আর কত দূর গেলে দাদার দেখা পাই?

প্রবীণ। এ কি জ্বালা! নবীন এখানেও আসিল! আমি কিন্তু সাড়া দিব না।

ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া প্রবীণ ত্বরিত পদে একটি গুহার ভিতর লুকাইলেন। নবীনও সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া প্রবীণকে দেখিলেন।

নবীন। এ কি দাদা! তুমি এ-সুড়ঙ্গের ভিতর কেন? এদিকে আমি তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইলাম! আমি দিবানিশি পথ চলিয়া তিনদিন পরে অদ্য তোমার ধরা পাইলাম।

প্রবীণ। তুমি মই দিয়া কৈলাসে উঠিতে চাও, তাহা আমি পারিব না।

নবীন। বেশ দাদা! তুমি যাহাই বল, আমি তাহাই মানিব। চল, তোমারই পথে চল, আমি কেবল আমার স্বদেশী বাইকাটা অস্ত্রখানি সঙ্গে লইব।

প্রবীণ। (স্বগত) তুমি যাহাই বল, আমি আর তোমাকে আমার সঙ্গে কিছুতেই মিশিতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তোমারই দোষে আমার সিঁড়ি প্রস্তুত হইল না, নতুবা এতদিন আমি অর্ধপথে উঠিতাম।

নবীন। এখনই কী হইয়াছে, সিঁড়ি প্রস্তুত কর না? কোথায় ইট, পাথর, সব লইয়া চল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবীণ চক্ষুলজ্জার দায়ে নবীনকে সঙ্গে লইয়া পর্বতগাত্রে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দুই-একধাপ সোপান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মায়াবী গায়েকেরা অদূরে থাকিয়া সমস্বরে মধুর রাগে গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ শুন ঐ শুন মুরলী বাজে—
করিছ সময় নাশ বৃথা কী কাজে?
আবেদন লয়ে হাতে
চল আমাদের সাথে,
লয়ে যাব তোমা বংশীধরের কাছে।
এস ত্বরা ঐ শুন মুরলী বাজে!

প্রবীণ উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন; ভাবিলেন, নবীন সঙ্গে থাকিলে পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব, মুরলীধরের নিকট কদমতলায় যাওয়া অসম্ভব, অথচ নবীন আমাকে ছাড়ে না—কী করি! নবীনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিই।

অতঃপর প্রবীণ সোপান প্রস্তুত করা ছাড়িয়া নবীনকে সবলে ধাক্কা দিলেন—ধাক্কার বেগ সম্বরণ করিতে না-পারায় নিজেও তাহার সঙ্গে পড়িলেন, উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয়ে গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিন্দুক করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীমান হাসিলেন না, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রবীণ নবীনকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'তোমারই দোষে আমরা পড়িলাম।'

নবীন। বাহ্ দাদা! তুমি ধাক্কা দিলে!

প্রবীণ। আমি কী জানি? তুমিই আমাকে লইয়া পড়িলে।

নবীন। বেশ ভালো, উল্টা চোর কোটাল শাসে! তুমি ধাক্কা না দিলে আমরা পড়িতাম কেন? যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তোমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়িতাম কিরূপে?

প্রবণী। যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তোমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়িতাম কেন?

নবীন। যেহেতু তুমি ধাক্কার ধাক্কা সামলাইতে পার নাই।

প্রবীণ। সমস্ত জগৎ সাক্ষী—কেহ বলুক তো যে-ব্যক্তি ধাক্কা দেয়, সে কি পড়ে?

নবীন। সমস্ত জগৎ তোমার চাতুরী বুঝিয়াছে। এক্ষেত্রে তুমিই আমাদের পতনের কারণ।

প্রবীণ। চুপ কর মিথ্যাবাদী! আমি আজ ২২/২৩ বৎসর হইতে সোপান রচনা করিয়া আসিতেছি, আর আজ কিনা আমিই পতনের কারণ হইলাম।

নবীন। অকথ্য ভাষায় গালি দিলেই কেহ বড় হয় না। কে মিথ্যাবাদী, তাহাও সকলে বিদিত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবীণ। তুমি আমার ২৩ বৎসরের পরিশ্রম মাটি করিলে। হায়! আজীবন মায়ের সেবা করিয়া আসিলাম—সমুদয় যত্ন পরিশ্রমের ফল এক-মুহূর্তে ব্যর্থ হইল! চল তো মায়ের নিকট—

নবীন। চল না! মাও বুঝেন, তাঁহার কোন্ পুত্র কেমন।

৭

কাঙ্গালিনী ঘোরতর পীড়িতা—জীবনের আশা প্রায় আর নাই। শ্রীমতী ও সুমতি মাতৃসেবায় নিযুক্তা। মাতার কঙ্কালসার দেহ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া এক-একবার শ্রীমতী নিরাশ হইয়া কাঁদেন, আবার ভাবেন, এই দাদা মুক্তিফলসহ আসিলেন আর কী? পাতাটি নড়িলে, সামান্য কিছু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শ্রীমতী আশায় উৎফুল্ল হন—এই বুঝি দাদা আসিলেন!

দুরাশায় উদগ্রীব হইয়া সুমতি পৌষ মাসের সুদীর্ঘ রজনী জাগিয়া যাপন করিয়াছেন।

প্রভাত হইল, অদ্য নবীন, প্রবীণ প্রভৃতি মুক্তিফলসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আহা! আজি কী সুখের দিন! সুমতি জননীর মুখহাত ধোয়াইয়া, ছিন্নবস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া জীর্ণ কুটিরের দ্বারদেশে বসিয়া স্থির নয়নে পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

অপর ভ্রাতাদের আগমনের পূর্বে নিন্দুক দ্রুতপদে আসিয়া ভগিনীদিগকে বলিলেন, প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিয়াছেন।

সুমতি। (ব্যাকুলভাবে) আমার তো বিশ্বাস হয় না—আমার মাথার দিব্য, সত্য বল দাদা!

নিন্দুক। তোমার চুলের দিব্য, সত্য বলিতেছি। ধীমান দাদা মায়ের জন্য স্বর্ণথাল ভরিয়া খাবার আনিতেছেন, আর নবীন মায়ের জন্য বারানসী শাড়ি আনিতেছে।

শ্রীমতী। আহা! সকলে শীঘ্র আসুন! এদিকে মা আমার রোগেশোকে জীবন্মৃতা হইয়াছেন। হায়! দাদারা কতক্ষণে আসিবেন।

নিন্দুক। অধীর হইও না, শ্রীমতী ধৈর্যধারণ কর। ঐ দেখ প্রবীণ আসিতেছে।

প্রবীণকে দূর হইতে দেখিয়া প্রথম সুমতি দৌড়িয়া আসিলেন, 'কই দাদা, ফল কই?'

প্রবীণ। তোমার সাধের কনিষ্ঠ নবীনকে জিজ্ঞাসা কর। নবীন না-গেলে আমি আনিতে পারিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবীন। তবে এতদিন আনো নাই কেন?

সুমতি। শেষে তোমরা কী করিয়া আসিলে? এদিকে মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ফল না আনিয়া তোমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলে কোন্ মুখে!

প্রবীণ। আমাকে অনুযোগ করা বৃথা—সব দোষ নবীনের।

নবীন। ধর্ম জানেন, সব দোষ দাদার। তিনি আমাকে ফেলিয়া দিলেন—

প্রবীণ। পতনের জন্য নবীন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—

নবীন। দাদা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমাকে ধাক্কা দিবেন—

প্রবীণ। মিথ্যা বলিয়া আর পাপভার বাড়াও কেন?

নবীন। তুমি বৃদ্ধ বয়সে এত মিথ্যা—

ধীমান। মাতার জীবন সঙ্কটাপন্ন, এই কি তোমাদের কলহের সময়? অকৃতকার্য হইয়া আসিয়াছ, এই লজ্জাই কি যথেষ্ট নয়?

কাঙ্গালিনী। (স্বগত) ধরণী! দ্বিধা হও—তোমার বক্ষে মুখ লুকাই। (প্রকাশ্যে) শ্রীমতী মা, তোর ভাইয়েরা বড় শ্রান্ত, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বল।

সুমতি। নিন্দুক দাদা, তুমি ধর্মত বল দেখি, কে কাহাকে ধাক্কা দিয়াছে?

নিন্দুক। কী বলিব বোন—মোহন বাঁশির স্বরে যার মন তিষ্ঠে না ঘরে, যাহাকে মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর আপন পার্শ্বে কদম্বতরুর ছায়াতলে ডাকিতেছেন, সে-ই অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিয়াছে। ফলে উভয়ে পতিত হইয়াছে।

নবীন। নিন্দুক দাদা এইবার সত্য বলিয়াছেন।

প্রবীণ। তবে আমি কি এতদিন কেবল অরণ্যেরোদন করিলাম?

শ্রীমতী। দাদা, তুমি ২৩ বছর অরণ্যে রোদন করিয়াছ, অথবা কী করিয়াছ, তাহা আমরা জানি না—আমরা তোমার কার্যফল দেখিতে চাই। মায়ের কুটিরের দ্বার হইতে কৈলাসগিরির সীমা পর্যন্ত যে-বিজন অরণ্য ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়াছে কে?

ধীমান। সে ঘোর বন নবীন ২৩ বৎসর ধরিয়া পরিষ্কার করিয়াছে।

নিন্দুক। প্রবীণ তো সেই বিজন বনে বসিয়া কেবল আবেদন লিখিতেছিল।

সুমতি। যাহা হউক, তোমরা এখন থাম। ঐ দেখ, মায়ের কুটিরে আগুন লাগিয়াছে, চল শীঘ্র নিবাইতে যাই।

কাঙ্গালিনী ভূমিশয্যায় পড়িয়া নীরবে নয়নজলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমানে তাঁহার হৃদয় শতধা হইয়াছিল। সুমতি তাঁহাকে ধরিয়া দাহ্যমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুটিরের বাহির করিতে চেষ্টা করায় তিনি বলিলেন, 'কে ও সুমতি? আর আমাকে টানাটানি করিস কেন মা?—পুড়িয়া মরিতে দে!'

শ্রীমতী। না, মা! আমরা থাকিতে তুমি মরিবে, ইহা অসহ্য।

কাঙ্গালিনী। অভাগীর মেয়ে! তোরা জানিস, মুক্তিফল না পাইলে আমি শাপমুক্ত হইব না, তবে আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়া বৃথা কষ্ট দিস কেন?

নবীন। মাগো! তুমি রাগ করিও না। আমি মুক্তিফল আনিতে আবার চেষ্টা করিব। এবার কৈলাসে উঠিতে পারি নাই, পুনরায় আরোহণের চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী ও সুমতি। এবার আমরাও সঙ্গে যাইব, পথ কি বড় দুর্গম?

নবীন। একেবারে দুর্গম নয়—কতকদূর মই দিয়া উঠা যাইতে পারে—

শ্রীমতী। বুঝিয়াছি—যাক, মইয়েরও প্রয়োজন নাই। চল নবীন শীঘ্র, আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

নিন্দুক। অবাক করিলে শ্রীমতী—নবীন তো তবু মই সংগ্রহ করিয়াছে তুমি তাহার উপরও নির্ভর কর না।

শ্রীমতী। কেন দাদা, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিব। পার্বত্য লতাগুল্ম ধরিয়া উঠিব—তাহাতে না কুলাইলে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর দিয়া—যে-কোনো প্রকারে হউক, উঠিব।

প্রবীণ। যেখানে পর্বত অত্যন্ত ঢালু সে-স্থান অতিক্রম করিবে কিরূপে?

নিন্দুক। সেখানে উভয় ভগিনী উড়িতে চেষ্টা করিবে!

সুমতি। এত বিদ্রূপ কর কেন দাদা? কোনো উপায় তো হবেই। এ-জগতে কিছুই স্থায়ী নয়, হয় আরোগ্য নয় মৃত্যু—কিন্তু রোগ চিরকাল থাকে না।

ধীমান। কেবল কথায় কাজ নাই, এখন সকলে মিলিয়া আবার যাত্রা করি।

প্রবীণ। হাঁ চল—দুই-একখানা আবেদন সঙ্গে লইয়া আমিও আসিতেছি।

শ্রীমতী। আমি এই চুল খুলিলাম—আমরা সকলে জননীকে মুক্তিফল আনিয়া দিতে না-পারা পর্যন্ত আমি আর চুল বাঁধিব না। হে প্রভু পরমেশ্বর! সহায় হও!

কাঙ্গালিনী। এ কী দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননীর পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থে—সাংসারিক ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবত আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী প্রভাত হইবে!—এতদিনে হয়তো আমার সন্তানসন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে।—আশা মায়াবিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. যেমন কতিপয় পাখির স্বরে 'চোখ গেল' 'বউ কথা কও' ইত্যাদি শুনা যায়, সেইরূপ একটি পাখির ডাক 'চৌদ্দ পুত এত দুখ' এই কথার অনুরূপ।

২. পার্থিব কোনো বিষয় সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় অনেকে জিনের সাধনা (আমল) করিয়া থাকে। মানবের সাধনাবলে জিন বশীভূত হয়। আলাদিনের প্রদীপের কথা প্রায় সকলেই জানে।

৩. সাধারণত মুসলমানেরা ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না, কিন্তু জিনপরী ও দৈত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। প্রবাদ আছে, জিনেরা মানবদের সহিত অল্পবিস্তর হিংসা করে এবং স্থলবিশেষে আবার জিনপরী নরনারীর সহিত বিবাহও করিয়া থাকে! আর দৈত্যদানবও জিনজাতির সহিত শত্রুতা রাখে। কবির মতে দৈত্য ভীমকায় ও অত্যন্ত বলবান হইয়াও জিনের অধীন থাকে। প্রায় শুনা যায়—জিন রাজা, দৈত্য প্রজা; অমুক পরীর অন্তঃপুরের রক্ষক প্রহরী দৈত্য ইত্যাদি। যাহা হউক, সামান্য সুবিধা পাইলেই দৈত্য জিনকে অনর্থক বিরক্ত করিয়া বৈরসাধন করে।

৪. প্রবাদ আছে. জিনেরা নাকি সহজে মানবের বশীভূত হইতে চাহে না, তাই সাধারণত লোকের সাধনায় তাহারা নানাপ্রকার বাধা দিয়া থাকে; কখনো সাধককে বিকট মূর্তি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে, কখনো-বা ছলে কৌশলে ভুলাইয়া বনে লইয়া গিয়া সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। ধ্যানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবও বড় দুঃখে তাঁহার আরাধ্য দেবীকে বলিয়াছেন—

> 'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া,
> কী গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া!'

দুর্গাদেবী কি চমৎকার কৌশলে ব্যাসদেবকে 'গর্দভ বারানসী' বরদান করিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিতত্ত্ব

সেদিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল : জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন, কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন! মিস ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এককোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কিনা, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল, তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কিসের শব্দ হলো?'

'বলতে পারি না। কিছুদিন হলো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন ইঞ্জিন ভেঙে কোনো বাড়ির ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু-খাওয়া ভাঙা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন-ট্রেন এসে পড়েনি তো? জানালা খুলে দেখুন না?'

মিসেস বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, 'বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগ্‌গির!'

আমার কথা শেষ হইতে না-হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কী? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, 'যে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কী করে? তাছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!'

'আচ্ছা, আমি জানালা খুলে দেখছি',—বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবামাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গেই মস্ত এক উলকাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের তো চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্বাক! আমরা চিৎকার করিয়া বাড়িময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নিস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ময় মনুষ্যমূর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্তি বলিলেন—

'বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোনো ভয় নাই।'

শিরীন। সেদিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ির কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই তো টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্তি। (সতেজে) না, মা! আমি সেসব কিছু নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি।

'ত্বস্তি' নাম শ্রবণ করিবামাত্র বীণা ও ননী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় 'নারীসৃষ্টি' লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বস্তিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, 'অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে 'ধূলি' না বলিয়া 'পদকর্দম' বলিতে হয়!) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

ত্বস্তি। কারণ? (আমার দিকে অঙুলি নির্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা।

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, 'মহাত্মা বলেন কী! আমি?

ত্বস্তি। হ্যাঁ, তুমি! তুমি আমার নারীসৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কী; কতক দোষ 'সওগাত' আফিসের।

ননী। সে কী রকম?

ত্বস্তি। তাহা এই ইনি 'নারীসৃষ্টি' লেখাটা 'সওগাত' নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে-সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; অফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইঁহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা-অভাবে রচনাটি স্থলবিশেষে দুর্বোধ্য হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না-পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না! তখন তাঁহারা বলেন, 'ডাক ব্যাটা ত্বস্তিকে, ইহার কোথায় কী ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক!' তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন; কতকগুলি যুবক 'সত্যগ্রহ' ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, 'সত্যগ্রহ' ছাড়িয়া 'মিথ্যাগ্রহণ' কর।' কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। 'মিথ্যাগ্রহণ' না-করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিলবাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ির অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জানো, 'চোর না শুনে ধরম কাহিনী।' রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদাজল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া 'মিথ্যাগ্রহণ'-এর বিরুদ্ধে সত্য প্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন। রাত্রি ১২টা-১টা পর্যন্ত উকিলবাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যাহোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি.আই.ডি আছে: কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এতরাত্রে উকিলবাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাম্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব! বাতায়নে লোহার গরাদ আছে যে!

ত্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদ! বিশেষত আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব। আপনি কী কী উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

ত্বস্তি। না, বাছা! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক-পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন) মারো—

ত্বস্তি (সচকিতে) সে কী? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না-পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ত্বস্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরানি ডাকিতে গেলেন। উহার চাকরানির নাম 'মারো'![১] আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্বস্তি। তোমরা নেহাত ছাড়িবে না, তবে আর কি করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি উকিলবাবুদের চেয়ে কম নও! তাঁহারা তবু আইন-কানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মানো না। শুনিলে তো তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননী, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যান্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যান্ডের তিনশত শব্দ লিখিতে পারি।' ইহা শুনিয়া মহাত্মা ত্বস্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা ত্বস্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনোবা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলুঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনো চক্ষুমর্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন! একবার তিনি গর্জনস্বরে বলিলেন—

'জানো বৎসেগণ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোনো বস্তুই ছিল না, সুতরাং আমাকে কোনো দ্রব্যের গন্ধ, কোনো বস্তুর স্বাদ এবং কোনো পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল—হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি, হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দূলের সমস্ত নখর লইয়াছি, মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজনকালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম। পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি। বাছা! তুমি তাহাই লিখ।'

বীণা লিখিলেন, (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

ত্বস্তি। বৎসে! মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় তুষার খণ্ড,—এমনকি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ, বীণা?

বীণা কাগজ দেখাইলেন—(তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Vesuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার-মূর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ।'

আবার পর-মুহূর্তেই (অবশ্য 'পার্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যাজি উগ্রভাব')—

'সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।'

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা ত্বস্তি বলিলেন, 'দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমনকি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক-ওদিক না হয়।'

বীণা। তাহাই হইবে, আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে—এখন তো কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে!

অতঃপর ত্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কী জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি তখনো সোফায় বসিয়া; গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজি রাখিয়া ঘুমাইতেছেন দুরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

টীকা

১. বেচারি চাকরানির সুন্দর 'মরিয়ম' নামটি বিকৃত হইয়া 'মারো'তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। যথা—'হাশো, লাতো', 'দুল্লু', 'উল্লু', 'জুব্বা' ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনীও ত্বস্তিদেবের মতো ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন 'হাশমত আরা', 'লতিফুন্নেসা', 'দৌলতন্নেসা' 'অলিউন্নেসা' এবং 'জোবেদা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসনা-পূজা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ চন্দ্রসূর্যের উপাসক, কেহ জড়পুত্তলিকা উপাসক ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনাপূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে 'রসনা-পরস্ত' (রসনা-উপাসক) বলি, তবে বোধহয় অন্যায় হইবে না এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে 'বূতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।[১] যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক-একপ্রকার বিপদে এক-এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত 'নজর ও নেয়াজ' দিতে হয়! যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা 'কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে' (মন্দিরে?) গিয়া 'নজর' (দর্শনী) মানস করিয়া আইসে! হঠাৎ কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে 'আচানক (হঠাৎ) পীরের' উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবত পা খোঁড়া হইলে 'লঙ্গর শাহের দরগাহে' 'শিন্নী' লইয়া যাইতে হয়!![২]

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়। আমাদের দুর্গতি ও অবনতির কারণ অনেকে অনেকরূপে অনুমান করেন, আমার বোধহয় রসনাপূজা ইহার অন্যতম কারণ। স্ত্রীলোকেরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের অবসর থাকে না। সমস্ত দিন ও অর্ধরাত্রি তো তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন—'যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!'

আমরা আহার ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারি না, সত্য। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। মনে রাখিবেন—ভোজনের উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন। কিন্তু সচরাচর আমাদের খাদ্যসামগ্রী যেরূপ হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া শরীরের ধ্বংস সাধন হয়। আমাদের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—খাদ্যগুলি কেবল রসনাদেবের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনৈক ডাক্তার একদা কোনো ধনী মুসলমান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন 'আপনার বাড়ি একদিন খেয়ে আমি তিনদিন খেতে পারি নাই। এই রকম খাবার আপনারা সর্বদাই খেয়ে থাকেন, কাজেই আপনাদের অসুখ ছাড়ে না।' ডাক্তারবাবু ঠিক বলিয়াছেন। আবার মজা এই যে, চিররুগ্ন জীবন বহন করাই ভদ্রতার লক্ষণ! কুশল প্রশ্ন করিলে কেহ সহসা উত্তর দেয় না, 'সম্পূর্ণ ভালো আছি।' তাদৃশ চিররুগ্‌ণ অবস্থা রমণী-সুলভ কোমলতা ('নাজাকৎ!') বলিয়া প্রশংসিত হয়। কেবল চাষা-স্ত্রীলোকেরা সবল সুস্থ থাকে।

আহারের অত্যাচার যে কেবল ধনবানের গৃহে হয় তাহা নহে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরেও সুযোগ অনুসারে রসনাপূজা হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোনো ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন, '(দরিদ্র) কুলীন মুসলমান আমি বেশ চিনি। যদি কাহারও মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারি, তবে একবার তার বাড়ি গেলে আর চিনিতে বাকি থাকে না। কুলীনের লক্ষণ এই—

'কাহারও বাড়ি গেলে দেখিবে, চালের উপর খড় নাই, ঘরখানার চারিদিক আবর্জনাময়, বসিবার একটু স্থান নাই, মাথার উপর (চালে) মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে— এইরূপ তো হীন অবস্থা। কিন্তু জলখাবার সময় দেখিবে অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্মা, কাবাব উপস্থিত—আমাদের সাত দিনের খাবার খরচ তাঁহার একদিনে ব্যয় হয়।'

যদি উক্ত কালেক্টর মহাশয় কখনো কাহার বহির্বাটী দেখিয়া কুলীন চিনিতে না পারেন, তবে তিনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু সে ডেপুটি কালেক্টরের ভাগ্যে অন্তঃপুর দর্শনলাভ অসম্ভব। অতএব আমরা একটু নমুনা দেখাই—

প্রথমে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হউন—দ্বারদেশে পচা কাদা; হংস, কুক্কুট ইত্যাদি সেই (পচা ফেনমিশ্রিত) কাদা ঘাঁটিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত্রাহি ত্রাহি করিবে।[৩] কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবেন না—কোনোমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ কেওড়া বা গোলাপজলে জাফরান ভিজাইতেছে ইত্যাদি। এখানকার সুগন্ধ এতই আনন্দপ্রদ (Inviting) যে ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইবে! পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কী চমৎকার—বলিহারি যাই। এখানকার সৌন্দর্য দেখিলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে যায়, তৃপ্তি হয়, আহার তো দূরে থাকুক। এখানে দাঁড়াইয়া আপনার বোধ হইবে—'আহা মরি! মরি! এ কোন্ সৌরভরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম!—এ স্বর্গ না কি!!'

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধীয় পরিচ্ছন্নতা সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন, মাংস এত ধোওয়া হয় যে, তাহার বলকারক গুণ থাকে না। গরম জলে মাংস ধুইলে মাংসে আর থাকে কী? অন্যান্য বস্তুও প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিষ্কার করা হয়। এই প্রকার খাদ্য দ্বারা কেবল জড় রসনার পূজা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কেবলই রসনাপূজায় সময় কাটাই। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানচর্চা তো আমরা জানিই না। সামান্য সূচিকার্য ও রন্ধন-প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনি, ৪০০ প্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলেই সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারা যায়। রমণী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মরণে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সুখের চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করা পর্যন্ত!

এইরূপ অত্যধিক রসনাপূজায় বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে রসনাপূজার কেবল ত্রিবিধ অনিষ্টের উল্লেখ করা গেল: ১. ব্যয়বাহুল্য বা অপব্যয়, ২. শ্রমবাহুল্য এবং ৩. স্বাস্থ্য নষ্ট। ময়দার পারাটা ও মসলা-বহুল কোর্মা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যের পরিপাক কার্যে আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিকে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতে হয়। ঐ শক্তি যোগাইতে গিয়া শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। তাদৃশ অখাদ্য রাঁধিতে গৃহিণীদের অনর্থক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়।

শরীরের পুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহার করিতে গেলে রসনাপূজা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিদিন অত ছাইভস্ম না খাইয়া কেবল যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে সুখাদ্য খাইলেই আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মোহনভোগ ফিরনি ইত্যাদির পরিবর্তে পাতলা দুধ খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

উক্ত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে। ব্যয়ও পরিমিত হয়। ঐ অবসরটুকু অন্য সৎকার্যে ব্যয় হইতে পারে।

আমরা রসনাপূজা করিতে বসিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। দিল্লির সম্রাটগণ বিলাসস্রোতে ভাসিয়াই দিল্লি হারাইয়াছেন। এ-স্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা গেল। দিল্লিশ্বর মোহাম্মদ শাহের সাহিত নাদির শাহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহাম্মদ শাহ ছিলেন বিলাসী—সর্বদা নানাবিধ সুস্বাদু বস্তু দ্বারা রসনাপূজা করিতেন, তাই পরাস্ত হইয়া সিংহাসন হারাইলেন, আর নাদির শাহ রসনা-উপাসক ছিলেন না—কেবল শুষ্ক রুটি ও কাবাব খাইতেন, তাই বিজয়ী হইয়া মোহাম্মদ শাহের মুকুট ও সিংহাসন লইতে পারিলেন। দেখুন তো শুষ্ক রুটির গুণক্ষমতা কত! অতীতের পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলে, বর্তমানে রুশ-জাপান যুদ্ধে তাই দেখা যায়। রুশীয়দের অপেক্ষা জাপানীদের ভোজনের আড়ম্বর কম, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাপান অমিত তেজের পরিচয় দিতেছে। তাই দেখুন, কেবল আহার করিলে বলবৃদ্ধি হয় না। খাদ্য পরিপাক হইলে লাভ, নচেৎ না।

অল্প আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোনো কোনো রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত করায় রোগীকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে 'যা না করে বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।' রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বচন আছে 'মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক।' এ-মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে? ক্রমশ এক-পা দুই-পা করিয়া উঠিতে হয়।

রোজা (উপবাস) ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা যথানিয়মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। মানুষ মাত্রেরই সংযম শিক্ষা আবশ্যক। এইজন্য দেখা যায়, 'পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো-না-কোনো প্রকারের উপবাসব্রত বর্তমান রহিয়াছে।'[৪] কারণ মানুষ জানে না, কী প্রকার খাদ্য কী পরিমাণে খাওয়া উচিত?

আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্যসামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসনা করা তো দূরে থাকুক, 'ইফতারি' (সান্ধ্যকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায় রসনা সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম করিয়া রসনাপূজার মহা-আড়ম্বর হয়। পূর্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফলমূল বা শাকরুটি দ্বারা সন্ধ্যায় জলপান (ইফতার) করিতেন। রাত্রিতে কী খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে ভুলিয়া সে-চিন্তাও করিতেন না। ধর্মগুরু মোহাম্মদ (সা.) নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিবার আশায় সমস্ত দিন পানভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে থাকিতেন। আর এদেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত (?) শিষ্য কিনা,—'ধর্ম ধর্ম' বলিয়া চিৎকারস্বরে গগণমেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন, তাই বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণে ও সন্ধ্যায় খাবার-আয়োজনে সমস্ত দিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন!! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য যে কতদূর সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যত প্রকার উপবাসব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজাব্রতই শ্রেষ্ঠ—অবশ্য যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার হয়, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বোঝেন।

খ্রিস্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টানগণ শুধু পানভোজন ব্যতীত পার্থিব সমুদয় কার্য হইতে বিরত থাকেন।[৫] সে-সময় তাঁহারা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নূতন কাপড় পরেন না, একান্ত প্রয়োজন না হইলে কোনো বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করেন না—এক-কথায়, সকল প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করেন। ঐ ত্যাগ স্বীকার করায় যে-অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সদ্ব্যয় করেন! আমাদের 'এতেকাফ'-এর[৬] সহিত ঐ ব্রতের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, 'এতেকাফের' সময় মসজিদে বসিয়া মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। (মৌলবী নইমুদ্দীন প্রণীত 'জোব্দাতল মাসায়েল' দ্রষ্টব্য।) আর খ্রিস্টানদের তাহা নিষিদ্ধ। (তবে দায়ে পড়িলে ভিন্ন কথা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমাদের 'ফেরতা'দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়। মহাত্মা মোহাম্মদ (সা.) হয়তো বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে-খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য কর ('ফেতরা' দাও), কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমগণ তাঁহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন, তাঁহার উপদেশের বিপরীত কার্য করেন।[৭]

সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাঁহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নাই—পাঠিকাগণ আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন—অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরিফের খরচ বেশি কিনা।[৮]

হিন্দুগণ সময় সময় ভীম (বা নির্জলা) একাদশী করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় এ-কথা কেহ অস্বীকার করেন কি? বিধবাদের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ এই যে, তাঁহারা রসনা সংযত রাখেন—এক সন্ধ্যা আহার করেন।

পাদরিগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যতীত কোনো ফললাভ হয় না, এ-কথাটি যুক্তিহীন। প্রমাণ—হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য। তবে 'মুসলমান' নামধেয় জীবগণ যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি পালন না করে, সে দোষ তাহাদের—রোজার নহে। সকল প্রকার সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করাই প্রকৃত রোজা। (নতুবা 'ধর্ম হয় না করলে উপবাস।') কিন্তু সচরাচর মুসলমানেরা এই পবিত্র রোজার কী ভয়ানক অবমাননা করিয়া থাকেন!!

আমাদিগকে মুসলমান বলিলেও 'মুসলমান' শব্দটির অপমান করা হয়। সুতরাং আমাদের ভণ্ড রোজার সম্বন্ধে যে পাদরিগণ বলেন, দিনে রোজার দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহা রাত্রির অতিভোজনে নষ্ট হয়। তাহা ঠিক। আমাদের রোজার উদ্দেশ্য কেবল রসনাপূজার মহা ঘটা!

কবে মুসলমান 'মানুষ' হইবে? রসনাপূজা ছাড়িয়া ঈশ্বরপূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভালোমন্দ বুঝিয়াছে, কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখন তো আমাদের আব্রু সে 'জরির মসনদ', তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুমকোমল 'শাহানা বিছানা' নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন্ সুখে? আমাদের অবস্থা এখন এই প্রকার—'ঝোপ্‌ড়ী মেঁ রহনা ও মহলকা খাব দেখ্‌না!' অর্থাৎ বর্তমানে কুঁড়েঘরে থাকি এবং অতীতের অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি!! একজন কবি বলিয়াছেন

I slept and dreamt life was beauty,
I woke and found life is duty

তাই তো জীবনটা খেলা নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশেষে বলি, জীবনধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবনধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমজান শরিফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।

নবনূর
২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ ১৩১১ সন।

টীকা

১. যদ্যপি তর্কের অনুরোধে এবং গলাবাজির জোরে অস্বীকার করা হইয়া থাকে সে ভিন্ন কথা!

২. হিন্দুদের নৈবেদ্যের সহিত উক্ত প্রকার 'নজর ও নেয়াজে'র সাদৃশ্য নাই কি?

৩. অভ্যাসের কৃপায় গৃহিণী বা গৃহস্বামীর নিকট ঐ দুর্গন্ধ অপ্রিয়বোধ হয় না।

৪. এই প্রবন্ধ রচনাকালে মৌলভী মকবুল আলী বি.এ প্রণীত 'রোজা' নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটুকু 'রোজা' হইতে গৃহীত।

৫. অনেকে উপবাসও করিয়া থাকেন। কেহ সর্বদাই প্রতি শুক্রবার উপবাস করেন।

৬. 'এতেকাফ' ব্রত বিশেষ। ধর্মোদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব কার্য হইতে বিরত থাকা।

৭. ঈদ-উৎসবের দিন যে দান করা হয়, তাহাকে 'ফেতরা' বলে।

৮. রোজা ধর্মের পাঁচটি প্রধান অঙ্গের (কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্ব) এক অঙ্গ। সে রোজা যাহারা ঐরূপে পালন করেন, অথচ 'ইসলাম' 'ইসলাম' বলিয়া শতকণ্ঠে চিৎকার করেন, তাঁহারা মুসলমানই বটে! তাঁহাদের নামাজও সেইরূপ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈদ-সম্মিলন

সংবৎসর পরে আবার ঈদ আসিল। আজি আনন্দের দিন উৎসবের দিন সমুদয় মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন!

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেন বসন্ত সমাগমে মানবের গৃহরূপ কাননে অসংখ্য প্রীতিকুসুম ফুটিয়াছে! বালক-বালিকার দল তো মনে করে, ঈদ না-জানি কী! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দ কোলাহলে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দপ্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটির একইভাবে প্লাবিত।

ঈদের নামাজের মূলে কী মহান ঐক্য লক্ষিত হয়! সহস্র সহস্র লোক একই কাবাশরিফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে;—সকলে একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে বসে—একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক প্রভুর উদ্দেশ্যে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পর সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কী সুন্দর ভ্রাতৃভাব! যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনোরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা আজি সে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোট বড় ধনী-নির্ধন একযোগে সম্মিলিত হইয়াছে—এ-দৃশ্য কী চমৎকার! এ-দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়; ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জা দূরীভূত হয়; নিরানন্দ, মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে একতা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের এ-অপার্থিব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরে শুভদিন এমন শুভসম্মিলন কোথায়?

কালের আবর্তনে এইরূপ আরও অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরও অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন, আরও অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদরবির অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐক্যরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ-প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগেও কি আমাদের ঈদ-সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতা মহাশক্তি, একতা আমাদের ধর্মের মূল—আমাদের সমুদয় ধর্মকর্মেই ঐক্য নিহিত আছে। জানি না, কোন্ দস্যু (আমাদিগকে অজ্ঞান-তিমির নিশীথে নিদ্রিত পাইয়া) আমাদের মহামূল্য একতানিধি অপহরণ করিয়াছে। জানি না, কাহার অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইয়াছি। তাই এখন আমরা সহোদরের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, সহোদরের সহিত হিংসা করি, পুত্রকন্যার অমঙ্গল কামনা করি। আমাদের ঘরে ঘরে আত্মকলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে পিতাপুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, তাহারা সমস্ত সমাজটিকে 'আপন' ভাবিতে পারিবে কিরূপে?

ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ-যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নবআশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্রস্বার্থ পদদলিত হউক। বলিয়াছি তো, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

আর এক-কথা। এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দুভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্বাদ আসুক; ভ্রাতৃবিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন!

আবার বলি, আজি কী সুখের দিন—আশীর্বাদ ও সুসংবাদ লইয়া শুভ ঈদ আসিয়াছে!!

নবনূর
৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
পৌষ ১৩১২ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিসেম ফাঁক

আলিবাবার নিকট দস্যুদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়া কাসেম তথায় গেল। 'সিসেম ফাঁক' বলিবামাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে বিস্ময়মুগ্ধ হইল। যক্ষের ধন দেখিয়া কাসেমের চক্ষুস্থির! সে দুই হস্তে প্রবাল, মুক্তা, মরকত, পদ্মরাগ, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিতে লাগিল। থলিয়া ভরিয়া আশরফি লইল। সে জীবনে এত ধন কখনো দেখে নাই; আজি তাহার ভারি আনন্দ। সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমি বস্ত্রে বস্তা বোঝাই করিয়া রাখিল। অদ্য সে উষ্ট্রপৃষ্ঠে ধন বহিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সবই তো হইল; এখন বাহির হইবার উপায় কী? কাসেম তো মূলমন্ত্র—অর্থাৎ উক্ত চারি শব্দ: 'সিসেম ফাঁক' ভুলিয়া গিয়াছে! রাশিকৃত ধন লইয়া, ধনস্তূপে থাকিয়া, মণিমুক্তায় বেষ্টিত হইয়া সে যে বন্দি-মুক্তির উপায় নাই। পরিশেষে কাসেম উন্মত্তের ন্যায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া 'গোধূম ফাঁক', 'উচ্ছে ফাঁক' ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করিল; কিন্তু সকল বৃথা—আসল কথা, 'সিসেম ফাঁক' সে ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ।

আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; নানাপ্রকার সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কাসেমের ন্যায় 'অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ' 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন', 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স', অমুক ইনস্‌টিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদুহাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন-না কেন—এ রত্নসম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিণী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশাভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী, তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না! গরিবের কথা বাসি হইলে ফলে; আমার কথাও (১০/১২ বৎসরের) বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রীশিক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুসলমান মহিলা সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নয়নগোচর হইতেছে। এমনকি, গত বর্ষের 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের' অধিবেশনে পরদানশীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, 'না জাগিলে সব ভারতললনা' এ-ভারত আর জাগিবে না।

সওগাত
১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষার দুক্ষু

'ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।'

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল—এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই।—সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট-দশজন ডাক্তারে টেপে নাড়ি, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থাপত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোঁড়দৌড়, জনতার হুড়াহুড়ি, লেমোজেড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)—এসব কি সভ্যতার নিদর্শন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।[১]

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে—কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় : চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধান ভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লীবাসী কৃষকের দুঃখদুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে, ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল;—এক-একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিংবা সাতশত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চাল চালে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে,—'পাছায় জোটে না ত্যানা!' ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতায়ালা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা—তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন: 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার।' তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল 'ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে', হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে 'মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল'—এ-কথার অর্থ কী? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে; কাব্য উপন্যাসও নহে; সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন-যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কী করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই-একটি উদাহরণ দেখাই—বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৮ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই

'কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম।' হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনো জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক-পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বেহার অঞ্চলে[২] দুই সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত! পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা 'পখাল' (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্রজলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাটশাক, লাউশাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত! আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহুকষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিংবা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত! শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনো তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে :—

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে!

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে 'মরাইভরা ধান ছিল, গোয়ালাভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল' ইত্যাদি কোন্ সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন—

কৃষক-রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় একপ্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' বলে। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা—কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া-খেলিয়া বস্ত্র সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই—

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে, সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইবার কারণ কী? কারণ যেহেতু আপাত-সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে-কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে 'পাছায় জোটে না ত্যানা' কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে তো! 'বৌ-এর পৈছা বিকায়' কিন্তু তবু 'বেলোয়ারের চুড়ি' থাকে তো! মুটেমজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়—কিন্তু ঐ যাহ্, যাইতে-আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া—ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর-একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বউ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানী চাই ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :—

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর—

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকা বাহকগণ পালকি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্টরূপে ইউরোপীয় নরনারীদের বরঅঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল! ক্রমে পল্লীবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়—তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা—বঙ্গের গভর্নর লর্ড কার্মাইকেল একখানি দেশী রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কার্মাইকেল ইংরেজ বাচ্চা—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশী শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লীগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই 'মরাইভরা ধান, ঢাকা মসলিন' ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প—বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩২৮

টীকা

১. অনেক আলেমের মতো লিবারপুলের লবণ হারাম। যে ব্যক্তি লিবারপুলের নুন খাইয়া সভ্যতার গুণ না মানে, সে 'নিমকহারাম' বৈকি!

২. ১৬ বছর পূর্বে বেহার ও উড়িষ্যার বঙ্গের অঙ্গভূত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্ডি শিল্প

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা রত্ন-প্রসবিনী ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা রেশম কীট জন্মিয়া থাকে, তাহা অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন। কোনো প্রকার কীট কুলপত্র, কোনো কীট তুতপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোষ বা গুটি দ্বারা বিবিধ রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অদ্য আমরা 'এন্ডি' নামক একপ্রকার রেশমের জন্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এন্ডি গুটি প্রধানত আসাম অঞ্চলে এবং রংপুর জেলায় আবাদ হয়।

এন্ডি গুটি আবাদ করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না, পরিশ্রমও নগণ্য বলিলেই হয়। ইহার খাদ্য এরন্ড পত্র। রংপুরে এরন্ড গাছের কোনো মূল্য নাই, যত্রতত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া জঙ্গল হয়। সম্ভবত 'এরন্ডপত্র' খায় বলিয়া এ রেশমের নাম 'এন্ডি' এরন্ডি', ক্রমে মধ্যস্থলের 'র' লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় 'এন্ডি' হইয়াছে। সুতরাং রংপুরে এন্ডি পোকার খাদ্য সংগ্রহ কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। সম্ভবত চারি আনার ডিম ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ পোকার গুটি লাভ হয়, তদ্বারা স্বচ্ছন্দে একখানা ১১ হাত লম্বা ও ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই প্রকার একখানা কাপড়ের মূল্য ৬ (ছয়) টাকা ছিল, এখন (যদি পাওয়া যায়) তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১৬/১৭ টাকা। যে গুটি সুতা পূর্বে এক পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য ছয় পয়সা! অতএব এন্ডি ধুতির মূল্য এখন ৩৬ হইলেও আশ্চর্যের বিষয় হইত না। ঠিক চারি আনার ডিমে ৫/৬ কাহন (অর্থাৎ একখানি ১১ হাতি ধুতির উপযোগী) গুটি লাভ হয় কিনা তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কারণ এখন রংপুর জেলায় এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হওয়ায় আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি নাই। এন্ডি সম্বন্ধে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লেখক কবিবর মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহেব লিখিয়াছেন

'এন্ডির তুলির জন্য এখানে (রংপুরে) ২/৪ জনের কাছে অনুসন্ধান লইলাম, যাঁহারা সখের জন্যে পোকা পুষিয়া থাকেন, এমন ২/১ জনকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু দর জানা ব্যতীত আর কোনোই উপকার হইল না। ২০ গণ্ডা গুটির দাম ১৫ পয়সা মাত্র। এখানে কাহারো ঘরে উহা বিক্রয়ের জন্য মজুদ নাই।'

গুটির হিসাব এই প্রকার—২০ গণ্ডায় এক পণ; ১৬ পণে এককাহন। তাহা হইলে দেখা যায়, এককাহন গুটির মূল্য মাত্র চারি আনা। তিন কাহন গুটিতে যে পরিমাণ সুতা প্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, তদ্বারা ৬ হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া একখানি চাদর প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ একখানি চাদরের মূল্য পূর্বে ৩/৪ টাকা ছিল, এখন ৯ টাকা হইতে ১৩ টাকা পর্যন্ত।

আমাদের বাল্যকালে যখন এন্ডি কাপড় দেখিতাম, তখন শুনিতাম যে উহা ভদ্র লোকের ব্যবহার্য নহে; উহা কেবল চাষারা ব্যবহার করে। সুতরাং এন্ডি বস্ত্রকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতাম। দরিদ্র চাষী স্ত্রীলোকেরাই এন্ডি পোকা পোষণ করিত, এন্ডি সুতা কাটিত এবং ইহার কাপড় ব্যবহার করিত। তাহারা স্বহস্তে কাপড়ের তানা পর্যন্ত করিয়া দিত, বাকি কার্য তন্তুবায়গণ করিত। আমরা তো এইরূপে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, কিন্তু ইহার আদর-কদর করিল কাহারা? আমরা যাঁহাদের পদলেহন—না, জুতার ধূলি লেহন করিয়া ধন্য হই!

আসাম অঞ্চলে এই এন্ডি বস্ত্র বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া আমাদের গুরুর গুরু-দেড় শত বৎসরের গুরু ইউরোপীয়গণ ইহাকে 'আসাম সিল্ক' বলিয়া অতি আদরের সহিত ইহা দ্বারা কোট, স্কার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমরাও হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর দোকান হইতে 'আসাম সিল্ক'-এর 'সুট' ক্রয় করিয়া পরিধান করা ফ্যাশন মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এই মূল্যবান শিল্পের উন্নতির কোনো চেষ্টা করিলাম না। ক্রমে রংপুরের চাষা ও আসামের বন্য পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা এন্ডি সুতা কাটা ভুলিয়া গেল। ফলে এখন আসাম হইতে গুটি বিদেশে রপ্তানি হয়, তথা হইতে কলে সুতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসামে আইসে। স্থানীয় তন্তুবায়গণ সেই সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, পরে সেই 'আসাম সিল্ক' কলিকাতার কোনো কোনো দোকানে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাও নাই, অর্থাৎ 'আসাম সিল্ক' আর সহজে (অন্তত লেডলর দোকানে) পাওয়া যায় না! সংবাদপত্রে সে আসামী এন্ডির বিজ্ঞাপন দেখা যায় তাহা খাঁটি বস্তু কিনা সন্দেহ। কারণ 'কাশী সিল্ক' নামে যে রেশমি কাপড় বাজারে দেখা যায়, তাহা জার্মানী হইতে আমদানি করা খোঁটা মাল।

বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন তো খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে খদ্দর, এন্ডি ও অপরাপর রেশমি বস্ত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। শুনিতেছি, একা খদ্দর আমাদের দেশের ষোলো আনা অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতের বিবিধ পট্টবস্ত্র অগ্রসর হউক। এন্ডি খদ্দরের তুলনায় কয়েকটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; ১. দীর্ঘকাল স্থায়ী (১০ বৎসর-এর পূর্বে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা নাই); ২. খদ্দর অপেক্ষা ওজনে হালকা; ৩. ফ্লানেলের ন্যায় গরম; ৪. ইহাতে কোনো প্রকার ভেজালের আশঙ্কা নাই। খদ্দরের তানায় মিলের সুতা ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে খাঁটি স্বদেশী বা হস্তনির্মিত বলা যায় না। তাহা ছাড়া 'জাপানী খদ্দর' না কি বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে! এন্ডি বস্ত্রের এসব বালাই নাই। আরও এক মজার কথা এই যে, যাবতীয় কাপড় নূতন অবস্থায় নয়নরঞ্জন চকচকে থাকে,—দুই-তিনবার ধুইলে বিশ্রী হয়, পুরাতন হইলে একেবারে অকর্মণ্য হয়। এন্ডি কাপড় ইহার বিপরীত—নূতন অবস্থায় বিশ্রী থাকে, প্রথম দর্শনে গ্রাহক বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রেতাকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার মতো মনোহর গুণ উহার নাই। কিন্তু এ কাপড় যতই ধোয়া যায়, যতই পুরাতন হয়, ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারে আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখিতে চিকচিকে হয়।

দুঃখের বিষয়, রংপুরের এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময় সময় সংবাদপত্রে 'আসামজাত এন্ডি' কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু রংপুরের সহিত এন্ডির কোনো সম্পর্ক আছে বা ছিল বলিয়া কেহ জানে না। ঝাড়া ছয় মাস পর্যন্ত রংপুরের কতিপয় ভদ্রলোককে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিয়া আমি মাত্র একটি গ্রাম আবিষ্কার করিয়াছি, যেখানে এখনো এন্ডি শিল্পের শেষ নিশ্বাসটুকু বহিতেছে। কিন্তু এইসবে ধন নীলমণি বেলকা গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও এখন এন্ডি পোকা পোষণ করে না। কেহ কেহ নিতান্ত দারিদ্র্য-পেষণে অনন্যোপায় হইলে পোকা পুষিয়া কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে। এ সময় এই নাভিশ্বাসটুকু রক্ষা না করিলে ইহারও অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

বেলকা হাই ইংলিশ স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় অতিশয় দেশহিতৈষী উৎসাহী লোক। তিনি ঐ স্কুলে ছাত্রদের অন্য একটি বয়ন ক্লাস খুলিয়াছেন। তাঁহার বয়নযন্ত্রে এন্ডি বস্ত্র বয়ন করা হয়। কিন্তু সুতার জন্য তাঁহাদিগকে অপরের ওপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সুতা লাভের সহজ উপায় স্কুলে পোকা পোষণ করা। কিন্তু উৎসাহ, সহায় ও সহকর্মীর অভাবে তিনি পোকা প্রতিপালন করিতে অক্ষম।

এন্ডি গুটি আবাদের প্রণালী এই—

১. হাট হইতে কতকগুলি পোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। বীজ অর্থে, কতকগুলি ডিমওয়ালা প্রজাপতি ও ডিম বুঝিতে হইবে।

২. ডিমগুলি একখণ্ড পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা ডালাতে শিকায় তুলিয়া রাখা হয়।

৩. সপ্তাহ বা দুই-সপ্তাহ কাল পরে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে এরন্ডের খুব কচি পাতা ছিঁড়িয়া খাইতে দিতে হইবে।

৪. প্রত্যহ পোকার বাসস্থান একবার পরিষ্কার করিতে হইবে; পিপীলিকা ও মাছি ইহার পরম শত্রু। সেজন্য কেহ কেহ নেটের ন্যায় পাতলা কাপড় দ্বারা পোকা ঢাকিয়া রাখে।

৫. দুই-চারিদিন কচিপাতা খাইয়া পোকাগুলি একটু বড় হয়, ইহার পর একদিন দেখিবেন, পোকাগুলি অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে, নড়েও না, পাতাও খায় না, তখন উহাদের মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া দিবেন না! এই অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'পোকার ঘুম' বলে। এক অহোরাত্রি কিংবা ততোধিক কাল ঘুমাইবার পর পোকাগুলি একটু বড় পাতা অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করে, এখন আর পাতা ছিঁড়িয়া দিতে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. কিছুদিন পরে পোকা আবার ঘুমাইবে। এইরূপে পোকা তিন কিংবা চারিবার ঘুমায়।

৭. শেষবারের ঘুমের পর পোকাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ ইঞ্চি হয়, রংটাও এরন্ড পত্রের অনুরূপ হয়! এখন ইহারা রাক্ষসের মতো পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সে-সময় ইহাদের পাতা খাওয়ার খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যায়। এখন বড় বড় পাতা গোছা বাঁধিয়া পোকার মাচার উপর একটা বাঁশের আড়ে ঝুলাইয়া দিতে হয়। দিনে তিন-চারিবার প্রচুর পরিমাণে পাতা দিতে হইবে এবং দুইবার পোকার বাসস্থান মাচা পরিষ্কার করিতে হইবে।

৮. ইহার ৩/৪ দিন পরেই পোকা গুটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এ অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'জরা' বলে। পোকা জরিতে আরম্ভ করিলে আর খায় না, বরং পাতার গায়ে যেখানে-সেখানে জরিয়া থাকে।

৯. অতঃপর এই জরিত গুটির যেগুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অপর গুটিগুলিকে গরম ক্ষারের জলে ডুবাইয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। ঐরূপ না করিলে কিছুদিন পর পোকাগুলি গুটি কাটিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐ ছিদ্রযুক্ত গুটি হইতে ভালো সুতা হয় না—হইলেও সে-সুতা মজবুত হয় না।

১০. ক্ষারে সিদ্ধ করিবার পর গুটিগুলিকে উল্টাইয়া আভ্যন্তরীণ মৃত কীট ফেলিয়া দিয়া ধুইয়া লওয়া হয়।

এক ফসল গুটি—অর্থাৎ ডিম ফোটা হইতে আরম্ভ করিয়া পোকা জরা পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া ২/৩ মাসে সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে দেখা যায়, বৎসরে অন্তত তিন ফসল গুটি আবাদ করা যাইতে পারে।

১১. এন্ডি সুতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, চরকা দ্বারা তুলার সুতা এবং অন্যান্য রেশমি গুটি হইতে সুতা প্রস্তুত করার পদ্ধতি হইতে অনুরূপ। ক্ষারে সিদ্ধ করা গুটির ৫টি হইতে ১০টি পর্যন্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে কিংবা একখণ্ড কাঠির উপর পরে পরে সাজাইয়া রাখা হয়, ইহাকে তুলি বলে। এই তুলিগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়। সুতা কাটিবার সময় ইচ্ছামতো দুই-তিনটি তুলি শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে একটি কাঠিতে একটা তুলি রাখিয়া লোহার কিংবা বাঁশের টোকোর সাহায্যে সুতা কাটা হয়। টোকোর অগ্রভাগ দেখিতে কতকটা ক্রুশের সুচের মতো। টোকোর নিম্নদিকে একটা পাথরের চাকতি। এই চাকতির উপর টোকোতে সুতা জড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে তুলিটা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। ব্যস, বামহস্তে তুলির কাঠি, দক্ষিণ হস্তে টোকো—বসিয়া, দাঁড়াইয়া, হাঁটিয়া, বেড়াইয়া—যেরূপে ইচ্ছা সুতা কাটা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বধূগণ সখ করিয়া স্বহস্তে অতি সূক্ষ্ম সুতা কাটিতেন। সে এন্ডি সুতা, রেশমি সুতার সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এখন আর সেদিন নাই, সুতরাং এখন কুলবালা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বউ-ঝিও আর টেকো হাতে লয় না।

পূর্বে নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা পূজা করিবার সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন তাঁহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আইসে জার্মানী হইতে! অধঃপতনের চূড়ান্ত আর কাহাকে বলে?

রংপুরে বামনডাঙ্গা স্টেশনের নিকটবর্তী যে দুই-একটি পল্লীতে এন্ডি শিল্পের নাভিশ্বাস বহিতেছে, তথাকার অধিবাসীগণ সামান্য চেষ্টা করিলে এই ব্যবসার দ্বারা বেশ দু-পয়সা অর্জন করিতে পারেন। এককানা ৬ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া চাদরের জন্য মূলধন ও লাভের একটা মোট হিসাব দেখুন

মূলধন

১.	তিন কাহন গুটি	.৭৫
২.	সুতা কাটার মজুরি (৩ কাহন গুটিতে বোধহয় ১ সের সুতা হয়) এক সের সুতার জন্য	.৫০
৩.	বেলকা বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন করাইলে মজুরি	৩.০০
	মোট	**৩.৫০**

কিংবা–

১.	হাট হইতে ১ সের সরু সুতা কিনিলে	৫.০০
২.	বয়ন ব্যয়	৩.০০
		৮.০০

লাভ–

ঐরূপ চাদরের মূল্য ন্যূনাধিক ১২.০০

এই অল্প মূলধনে যে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়, তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হইতে পারে? আর একটি উপায়ে বিনাপয়সা ও বিনাপরিশ্রমে এন্ডি গুটি লাভ করা যায়। তাহা এই যদি কেহ কেবল এরন্ড পত্র কৃষকবধূদের পোকার খাদ্যের জন্য দান করেন, তবে তিনি সে ফসলের অর্ধেক গুটি পাতার বিনিময়ে পাইবেন! দুঃখের বিষয়, কৃষক রমণীদের পোকা পোষণ করিতে উৎসাহ দিবার লোক পর্যন্ত নাই।

খোদার ফজলে এখন দেশে যে স্বদেশীয় সঞ্জীবনী বাতাস বহিয়াছে, এ শুভক্ষণে ভারতের নানাবিধ সুপ্তশিল্পের জাগরণ অনিবার্য! ৫০/৬০ বৎসরের পরিত্যক্ত—মৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরকা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে; মৃতপ্রায় এন্ডিশিল্পও নবজীবন লাভ করিবে। এখন আমাদের পরিধেয় খদ্দর, এন্ডি ও অন্যান্য রেশমি বস্ত্র না হইয়া উপায় নাই। এই স্বদেশীয় মাহেন্দ্রক্ষণে খোদার ফজলে রংপুর ও আসামের এন্ডি জাগিবে; ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদের রেশমি শিল্প জাগিবে, জাগিবে নিশ্চয়!

এখন কথা এই যে, রংপুরে এন্ডির পুনরুদ্ধার সাধন কে করিবে?

১. স্থানীয় জমিদারগণ? তাহা হইলে তো আর কথাই নাই। তাঁহারা উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সহানুভূতিসূচক ঈষৎ হাস্য করিলে—একটু উৎসাহ আজ্ঞা প্রকাশ করিলে এন্ডিশিল্পে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে—মৃত এন্ডি প্রাণলাভ করিবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকবধূ পরস্পরে বলাবলি করিবে—'আমাদের জমিদার সাহেব, রাজা মহাশয়, মহারাজা এন্ডি কাপড় চাহিয়াছেন; ওরে, আমি আজকেই পোকা পোষা আরম্ভ করিব।' এ বলিবে, 'আমি আগে', ও বলিবে, 'আমি আগে।' কিন্তু না, জমিদার মহোদয়গণ সুখনিদ্রা, মোহনিদ্রা, আলস্যনিদ্রা, আফিম-খাওয়া নিদ্রা, সর্পদৃষ্ট প্রাণঘাতিনী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না।

২. স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বড়লোকেরা? তাহা হইলেও অধিক কাঁদিতে হইত না। তাঁহারা আরামকেদারা হইতে নবনীত দেহখানিকে ঈষৎ দোলাইয়া, চক্ষু হইতে রঙিন চশমাজোড়া একটু সরাইয়া, গ্রামের দুই-চারিজন মাতব্বরশ্রেণীর লোককে ডাকিয়া দুই-চারিটা মিষ্টবাক্য ব্যয় করিলে এন্ডির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে জীবনীপ্রবাহ বহিয়া যাইবে। কিন্তু না, তাঁহারা 'ঝোঁপড়ি মেঁ রহনা ও মহল কা খাব দেখ্‌না' বংশগৌরব মানমর্যাদা গৌরব ইত্যাদির অনুরোধে প্রতিবেশী রাজা, মহারাজা, খাঁ বাহাদুরদের সহিত টেক্কা দিবার খেয়ালে ভুলিয়া তাহা করিবেন না।

৩. মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা? তাহা হইলেও বেশ হইত। তাঁহারা গ্রামের কৃষকদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া, হাতেকলমে উৎসাহ দিয়া, নিজেরা সখের জন্য পোকা প্রতিপালন করিলে একাধারে কিছু উপার্জন এবং দেশের বস্ত্রক্লেশ মোচন—উভয়ই করিতে পারিবেন। কিন্তু না, তাঁহার—

'চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি!
চাকুরি মাথার মাণিক!
চাকুরি বিনে বঙ্গবাসীর
জীবনধারণে ধিক্!
মশক করে হাত পাকিয়ে
লিখে, 'এ.বি.সি.ডি.';
চাকুরি হলো—ডাকপিয়াদা,
গ্রামে পুলো ঢি ঢি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা—

'চাকুরি মা! তোর চরণ দুটি
নিত্য পূজা করি,
এই অফিসে চাকুরি যেন
বজায় রেখে মরি!'

এহেন চাকুরির মায়া ত্যাগ করিয়া এন্ডিশিল্প উদ্ধার করিবেন না।

৪. তবে অপর কোনো জেলার দেশহিতৈষী লোক? তাহাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহারা এ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা মনে করিবেন, বাবা! নিজের ঘরদ্বার ছাড়িয়া কেউ জঙ্গলা দেশে যাইবে? রংপুরের জলবায়ু ভালো নয়—প্লীহা ও ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি।

তবে?—নীলকর, চা-কর প্রভৃতির ন্যায় কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষক (Planter) রংপুরে গিয়া এন্ডি গুটি আবাদ করিবেন। তখন সেই এন্ডিকর সাহেবের এন্ডি বাগানে ঐ রংপুরের দরিদ্র নরনারী কুলিরূপে খাটিবে। আর ভদ্রলোকেরা গুটি মাচার পরিদর্শক, বাজার সরকার কিংবা অন্তত কুলিন সরদার পদলাভ করিয়া ধন্য হইবেন। হইতে পারে শ্বেতাঙ্গ এন্ডিকরেরা সুতা প্রস্তুত করিবার জন্য কোনো সহজসাধ্য যন্ত্র নির্মাণ করিবেন। অতঃপর রংপুরের আধিবাসিগণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে 'রংপুরে রিফাইন্ড সিল্ক' কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবেন।

প্রথম 'আসাম সিল্ক' নাম শুনিয়া আমাদের চমক লাগিয়াছিল, পরে যখন দেখিলাম, তো দেখিলাম, সেই নগণ্য এন্ডি!!

ফল কথা, অপর জেলার লোকে গুটি আবাদ করিতে গেলে, তাঁহাকে মূলধনস্বরূপ অন্তত ২০০ (দুইশত) টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আর স্থানীয় লোকে ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে মাত্র ১০ (দশ) টি টাকা মূলধনস্বরূপ ব্যয় করিতে হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঙ ও সোনা

ভাদ্র মাসের 'সওগাত' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি যে কতিপয় বঙ্গলেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন, সেজন্য আমি 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম কলিকাতা'র সেক্রেটারিরূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু বিক্রমপুরী সাহেবের অত্যধিক উদারতায় আমার ভারি আপত্তি আছে। তাহা এই যে, তিনি মাদৃশ নগণ্যাকে কয়েকজন উপাধিধারিণী বঙ্গবিখ্যাত লেখিকার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজেকে অপমানিতা বোধ করিতেছি।

'নিখিল ভারত সাহিত্যসঙ্ঘ' আমার নিকট 'বিদ্যাবিনোদিনী' ও 'সাহিত্যসরস্বতী' উপাধি চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ফেরিঅলার নিকট জিনিস কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।

আজি-কালি যখন বাজারে সামান্য নিকেলের 'আনি' পর্যন্ত মেকী হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রমপুরী সাহেব সার্টিফিকেট দানের পূর্বে মেকী 'লেখিকা' আসল লেখিকাদের বিষয়, এমনকি, কোনো লেখিকা মৃতা কী জীবিতা—তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে ভালো হইত না কি? তিনি একই নিক্তিতে রাঙ ও সোনা ওজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিক্রমপুরী সাহেবের মতে 'পরলোকগতা' আফজালুন্নেছা সাহেবাকে আমি অদ্য (১৯ ভাদ্র, ১৩৩৩ সনে) এই মাত্র (১২টার সময়) দেখিয়া আসিলাম। অবশ্য তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আমাকে 'পরলোকের' দ্বার পর্যন্ত যাইতে হয় নাই। আফজালুন্নেছা সাহেবার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে; তাই তাঁহার 'মৃত্যু' সংবাদে কাঁদিবার পূর্বে তাঁহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম। তিনি তখন সুস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরে মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন—বেহেশতের ফলমূল নয়—আমাদের এই মৃন্ময় পৃথিবীর ভাত খাইতেছিলেন।

আশা করি, অতঃপর বিক্রমপুরী সাহেব অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বেচারী বঙ্গ 'লেখিকাদিগকে আগেভাগে সশরীরে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবেন না। আপাতত তাঁহাদের জন্য বেহেশতে সিট রিজার্ভ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সওগাত
আশ্বিন, ১৩৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি

সভানেত্রীর অভিভাষণ

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ!

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রী পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নির্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পরদার' অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি। ভালোরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এমনকি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষায়-কথায় অনেক ভুলভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মিসিস্ লিন্ড্সে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া—বিশেষত ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।'

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কী? উপায় তো আল্লাহর কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফলভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন? সে জীব ভারতনারী। এই জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছে; স্বয়ং থার্ডক্লাস গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটরচাপা পড়িলে, তাহার জন্য এংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূ-ভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ-দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এ যাবৎ নারীর ওপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং আমার হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছে! তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা, বিশেষত মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ববিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিস্টার হইয়াছেন। লেডি ব্যারিস্টার মিস ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা আর কী বলিব?—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।

'মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে'—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময় তাঁহার কোনো বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 'এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে। বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দূরপনেয় কলঙ্ক।' ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বে আমি হেন নগণ্য যাহা ১ম খণ্ড 'মতিচূরে' বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিতেছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্যন্ত মিসর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই; বরং আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রাসূল মকবুল (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তেরো শত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষা দানের বাধ্যতামূলক আইন পাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশগৌরব মনে করিতেছে। এখনো আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরানশরিফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই তো আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাস হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান—যাঁহারা স্বীয় পরগাম্বরের নামে (কিংবা ভগ্ন মসজিদের একখণ্ড ইস্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরয' (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন!

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশের গড়পড়তা প্রতি ২০০ (দুইশত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলারা বোধহয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। গত জানুয়ারি মাসে শিক্ষাবিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, 'তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই। কিন্তু আমি বঙ্গের মাত্র একটি গ্রাজুয়েট এবং আগা মইদুল ইসলাম সাহেবের কন্যাত্রয় ব্যতীত আর কাহারো নাম দিতে পারি নাই। আগা সাহেব বঙ্গদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটি মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া গেল, বলিতে হয়!! সম্ভবত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধানের পর প্রেসিডেন্ট ও বর্ধমান বিভাগের স্কুলের ইনসপেকট্রেস মহোদয়া আমাকে মুসলিম মেয়ে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছিলেন!! আবার আমি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

'স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলে যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অনম্যা হয়। ধিক! ইহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি, যাহারা নিজেদের অর্ধেক লোককে মূর্খতা ও 'পরদা'রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির—যাহারা সমানে সমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?'

ভারতবর্ষে এক কোটি লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন্ মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলিন্যের বড়াই করি! ভিক্ষাবৃত্তি সর্বাপেক্ষা নীচ কার্য, আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ববিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়; সুতরাং 'বাপ-দাদার নাম' লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কী কাজ করিবে?

এখন স্ত্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীর বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পরিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চাহেন না—আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে মিস্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, 'যদি তাঁহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon), তাহা আমরা দিতে পারি না' ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণত যেরূপ মুসলমানদের দাবিদাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোনোপ্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহর কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার। তিনি এ বিশ্বজগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে-অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না! মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখসুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যতদিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের রোদনও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কণকুহরে প্রবেশ করিবে না!! বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেয়ছাই মার আমাকে মারিবে।'

হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই—

'ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দার নাম শুনিবা মাত্র আপনারা হয়ত একযোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দার কোনো সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোনো মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দাকে 'সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত' বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। 'যন্ত্রণাদায়ক' হইলে অবলাগণ 'বাবারে! মা'রে! মলুম রে! গেলুম রে!' বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন! অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন! কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মতো আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থা-পত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরআন শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো কার্য করি না, শুধু তাহা পাখির মতো পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। কিছুদিন হইল, মিসর হইতে আগতা বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতা দানকালে বলিয়াছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন।' তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভালো। সুতরাং কোরানের বিধিব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি। স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কী হইবে? ষোলো বৎসর যাবৎ এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন—অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবি করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! যাহা হউক, তথাপি উর্দু এবং বাঙ্গালা উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে। আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামির পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামি হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন।[১] কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্য রূপ—যে বিধি-অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়িতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। আল্লাহর দান বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপ ভাবে জানালা-দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয়, গভর্নমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার-জানালার সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না! পাঁচ ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার মিস্ কোহেন বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ-সহ গেল যে, 'আপনারা অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন', তাহাতে তাঁহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন,—'স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কোন দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে, আঁখ্ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঁফ্‌ড়া খারাব হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ!' ইয়া আল্লাহ্! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই। ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য (ফেল) হয়; ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং স্কুল-গৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আর কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ-ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কু-রোগের একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল এবং আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইস্‌লামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার মুস্‌লিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলা-সমাজে সর্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।[২]

সওগাত
চৈত্র, ১৩৩৩

টীকা

১. সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলে শুনি, মুসলমানগণ বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই! কিন্তু এ কথা কী বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা ইসলামিয়া কলেজে হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কী দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ত অর্থাৎ শাস্ত্র মানিতেন, তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার অর্ধেক অবশ্যই বালিকা-বিদ্যালয়ে দান করিতেন।

২. Bengal Women's Educational Conference-এ (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে) পঠিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুকানো রতন

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকা'য়ে;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশা'য়ে

অভাগিনী বঙ্গদেশের নিভৃত অন্তঃপুর-উদ্যানে কত ফুল নীরবে ফুটিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে? অন্তঃপুরের সুরক্ষিত লৌহসিন্দুকেও না-জানি কত উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধানও অনেকেই জানে না। অদ্য আমরা মাত্র একটি রত্নের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের মুসলিম সমাজ নিতান্ত দীন নহে—তাহাতে এমন অমূল্য রত্নরাজিও আছে।

করিমুন্নেসা খানম সাহেবা

গত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের কোনো উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরে অর্থাৎ তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুম মৌলবি জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সাহেবের গৃহে ঐরূপ একটি রত্ন (করিমুন্নেসা খানম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখির মতো কোরান শরীফ ব্যতীত আর কিছু পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না! তাঁহার ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুন্সি সাহেবের নিকট ফার্সি পড়িয়া আসিতেন—ভগিনীকে শুনাইয়া আবৃত্তি করিতেন—

'কে বে-ইলমে না-তওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত'

তখন বালিকা করিমুন্নেসাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাঙ্গলা পড়া শুনিয়াও তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন—ক'য়ে আকার দিলে 'কা', ইকার দিলে কি', দীর্ঘ ঈকার দিলে 'কী', কৃ, খৃ, গৃ ঘৃ নৃ—ইত্যাদি। আর তিনি প্রাঙ্গণে মাটিতে আঁক কাটিয়া বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

একদিন করিমুন্নেসা গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরানেতে আল্লাতালা কয়েছে এমতি,
ফাদ খুলি ফী ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি'

সেই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা আসিয়া পড়েন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন যে, 'আজ আমার সর্বনাশ,—বুঝি এখনই আমাকে যমালয়ে যাইতে হইবে!' কিন্তু না, শোকর আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্! পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না,— বরং ভয়ে মূর্ছিতা-প্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন এবং সেইদিন হইতেই একটু একটু 'সাধুভাষা'র বাঙ্গলা পড়াইতে লাগিলেন। ব্যস্! আর যায় কোথা? যত মোল্লা মুরব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—'হে মেয়েকে বাঙ্গলা পড়ান হইতেছে!' তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্য-জ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

শুধু পড়াই বন্ধ হইল না,—এখন করিমুন্নেসাকে অন্ধকার কারাগৃহে (অর্থাৎ বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে) পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বিবাহ হইয়া গেল। শাপেই বর—শ্বশুরালয় দেলদুয়ারে আসিয়া তিনি কয়েকজন দেবরসম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি সমাজের অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কেবল নিজের লেখাপড়া শিক্ষার জন্যই লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই। বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যের পর তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্যও তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে।

দেলদুয়ারে ছেলেদের উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব দেখিয়া করিমুন্নেসা খানম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বড় ছেলেকে (হাজী এ. কে. গজনভী সাহেবকে) ইংল্যান্ডে পাঠাইলেন এবং ছোটটিকে (মিঃ আবদুল হালিম গজনভী সাহেবকে) সেন্টজেভিয়ার কলেজে ভর্তি করিলেন! এত বড় পাপ কার্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা-কুৎসা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত—পাঠিকা ভগিনী তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

করিমুন্নেসা খানম স্বভাব-কবি ছিলেন। পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজিকালি দেখি, লোকে ভালোমতে বর্ণজ্ঞানের সহিত ভালোমতে পরিচিত না হইয়াও ভাড়া করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা সাহেবা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালে-ভদ্রে কোনো রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্সের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত। দুই-তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমি জোর করিয়া কোনো হিন্দু সংবাদপত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে 'সাবের বংশের জনৈকা কন্যা' নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার; আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরো পাঠাইবেন।'

তিনি ইংরাজি ভাষা শিখিবার জন্য সাধনাও কম করেন নাই। তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক কোনো কোনো ম্যাট্রিক পাস করা লোকের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থলে ১৬ বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন তিনি ও আমি প্লানচেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বারা লিখাইতেছিলাম।[১] আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরেজিতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'খেলাই মৃত্যুর পর ইংরেজি শিখিয়াছে দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে অনায়াসে ইংরাজি শিখিতে পারিব।'

তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমতো আরবি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'মন্ত্রপাঠের মতো কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবি পড়িতেছি।' তিনি পারস্য ভাষাও জানিতেন।

সমাজ তাঁহাকে গলা-টেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের-পর স্তর-অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখায়, আমার বর্ণিতা মহিলাটিও সেইরূপ কাপড়-চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন; পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্যে লাঞ্ছনা সহিয়াছেন—শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য-চর্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। করিমুন্নেসা সাহেবা লক্ষাধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক পারস্য গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

গত ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর এই রত্নটি ৭১ বৎসর ৫ মাস বয়সে হৃদযন্ত্র অচল হওয়ায় (হার্টফেল করিয়া) চির-লুক্কায়িত হইয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগকে 'অকাল মৃত্যু বলা যায় না বটে; তবু কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ দিলে ভালো হইত। এখন আর আমার কিছুই ভালো লাগে না; মনে হয়—আর কে পড়িবে?

সওগাত
আষাঢ়, ১৩৩৪

টীকা

১. প্ল্যানচেট কি জিনিস—তাহা সত্য কি মিথ্যা, এ স্থলে সে-বিষয় আলোচ্য নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানি ভিখারিনী

আমেরিকাবাসিনী মিস্ মেয়ো 'ভারত মাতা' নামক পুস্তকে হিন্দু নারীদের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে অতি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নির্মম সত্যকথা বলার জন্য হিন্দুগণ মিস্ মেয়োকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন, কিন্তু গালির চোটে কাকের কালো রঙ বকের মতো সাদা হইবে না, পরিত্যক্ত জারজ শিশু পুনর্জীবন লাভ করিবে না, দ্বাদশ বর্ষীয়া প্রসূতিদের বিবিধ রোগ নিরাময় হইবে না; হাসপাতালে রোগিণীদের সংখ্যাও হ্রাস হইবে না। এ দেশীয় কর্তারা বলেন, 'ভারত মাতা' পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু কথা এই যে, যাহা ভালো, তাহা তো ভালোই; তাহার পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। যাহা মন্দ তাহাই সংশোধন করা আবশ্যক।

ডাক্তারের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইলে, তিনি রোগীর রোগসমূহেরই উল্লেখ করেন এবং রোগ দূর করিবারই ব্যবস্থা দেন। আপনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা দিবার সময় ডাক্তার আপনার পরিপাক শক্তির প্রশংসা-পত্র লিখিতে বসেন না। তারপর ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পড়তা ১৬ কোটি পুরুষ তো আছেই। সে-জয়ঢাকে কাটি ঠুকিবার জন্য মিস্ মেয়োর দরকার কী? মিস্ মেয়োর প্রয়োজন সেই কথা কহিতে—যাহা এযাবৎ আর কেহ বলে নাই—যাহা এযাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ কুড়ি বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারো শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই—আজ মিস্ মেয়োর গর্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে!

'ভারত মাতা'—লেখিকার সহিত ভারত-পিতাগণ 'চুলোচুলি' করিতেছেন, এই সুযোগে, মুসলিম-সমাজ! আপনারা ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন তো আপনারা নিজ সমাজের রানিকে কিরূপ ভিখারিনী সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতে কোনো দেশ, কোনো জাতি, কোনো ধর্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইস্‌লাম ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে!

কোনো জাতি কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইস্‌লাম কন্যাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্ধেক অংশ ভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা-কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে, তাহা স্বামীর কবলে পড়ে—স্ত্রী ভোগ করিতে পান না। মুস্‌লিম স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা-অনুসারে 'দেন-মোহর' বাবদ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ-বিভাগের পূর্বে স্ত্রীর 'মোহর' (স্ত্রীধন) এবং তাঁহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।

হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবনমৃত্য হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ি-বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, 'বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া কোনোরূপে বাঁচিয়া থাকে।' কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্বিবাহর অনুমতি দিয়াছে। বিধবার প্রতি কোনো অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোনো বাঁধা নিয়ম নাই।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিংবা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফলপ্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। 'মাতার পদতলে স্বর্গ' বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোনো নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র বলে, 'স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।' আর আমাদের রাসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'তালাবুল ইলমি ফরিজাতুন, 'আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন' (অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলিম নর ও নারীর অবশ্য কর্তব্য)।

কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতে পাই? হিন্দুগণ কন্যাকে অংশ দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা 'উইল' করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। উইল দ্বারা স্ত্রী কিংবা কন্যাকে যথাসর্বস্ব দান করিতে পারেন। আর মুসলমানেরা কন্যার দ্বারা সম্পত্তিতে লা-দাবি লিখাইয়া লইয়া কন্যাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। নানাবিধ জঘন্য উপায়ে নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্ট করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।

হিন্দুগণ বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। কন্যার বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন (যদিও সে-জন্য পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে 'অ-হিন্দু' বলিতেছেন)। আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, টেলিগ্রাফ-যোগে কোনো দূরদেশে অবস্থিত বরের সহিত অপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স্ক—৯ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতেছে। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অথবা দুশ্চরিত্র পানাসক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া বুক-ভাঙা রোদনে অথবা বক্ষ ভিজাইতে থাকে—সেই হৃদয়-বিদারী অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পাত্রী কিছুতেই 'হুঁ' বলিবে না,—কিন্তু অভিভাবকও নাছোড়বান্দা—তাঁহারা বলপূর্বক 'হুঁ' 'হুঁ' বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।

এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, স্কুল, হাইস্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।

৬০-৭০ বৎসর পূর্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজি শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানদের জন্য 'অযোগ্যতার' অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরি লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed Class-এর) তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'অযোগ্য'। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা তো অতি স্বাভাবিক। 'অযোগ্য' বলার জন্য রাগ না করিয়া 'যোগ্য' হইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

মাসিক মোহাম্মদী
পৌষ, ১৩৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আজ তেহরানে গিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের এক পুত্র মস্কো গিয়াছে, আর এক পুত্র এবং কন্যা ফ্রান্সে আছে। আর আমি নিজে এই কন্যাদের সঙ্গে এইরূপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'মহামান্যা সুরাইয়া বেগমের শরীর বড়ই অসুস্থ, তিনি শয্যাগত আছেন। এমনকি, লেডি ডাক্তার পর্যন্ত তাঁহার নিকট আছে। এই কারণে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না। যদি ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকা হয় এবং তাঁহার শরীর কিছু ভালো হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।'

এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার এক দৌহিত্র ও চার দৌহিত্রী, অর্থাৎ রানি সুরাইয়ার চার কন্যা—আমিনা, আবেদা, আরেফা আর আদেলা প্রভৃতিকে দেখিলাম। রাজকুমারীরা অতিশয় সুন্দরী, তাহাদের পোশাক একেবারে আজকালকার ইউরোপীয় ধরনের এবং সকলেরই আধুনিক ধরনের চুল কাটা, এমনকি, বেগম তরজী সাহেবারও চুল কাটা এবং পোশাক একেবারে ইউরোপীয় ধরনের। এই মহিলাটির পূর্বপুরুষগণ আরব এবং শ্যাম দেশবাসী এবং আরব জাতির বিশেষ সৌন্দর্য তাঁহার চেহারায় বিদ্যমান আছে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'আমরা কান্দাহার হইতে এমনি অবস্থায় আসিয়াছিলাম যে, আমাদের পরনের কাপড় ছাড়া কোনো জিনিসপত্র, এমন কি, আর এক প্রস্থ কাপড় পর্যন্তও আমাদের সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নাই। এখানে আসিয়া আমরা হোটেলে দর্জি ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।'

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শাহ আমানুল্লাহ খানের প্রতি বিশেষ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা তাহাদের হৃদয়ে পোষণ করে। আর ভারতবর্ষের শুধু মুসলমান নহে, অন্যান্য জাতির মহিলাগণও মহামান্যা সুরাইয়া বেগমকে প্রাণপণে ভালোবাসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা শাহ আমানুল্লাহর জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে।'

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাস্তবিকই আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি রাখেন। কিন্তু আক্ষেপ যে, আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরা আমাদের কাফেরের ফতোয়া পর্যন্ত দিতে ত্রুটি করে নাই। বিশেষত এমন বাদশাহকে তাহারা কাফের বলিল, যিনি সিংহাসনে আরোহন করামাত্র সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দিয়াছেন—যাহাদের সংখ্যা সে দেশে কেবল শতাবধি নহে, হাজারের চেয়েও বেশি ছিল;—এমনকি, তাঁহার মাতার অন্তঃপুরে যে সমস্ত দাসী ছিল, তাহাদিগকেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন। আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ খানের এই ক্ষণিক রাজত্বের সময়ে একটিও বাঁদী দেখা যায় নাই; কেননা, বাঁদী অথবা 'গোলাম' কেহ রাখিলে তাঁহাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইত।—বাঁদী গোলামের স্থানে চাকর ও চাকরানি অন্দর ও বাহিরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই চাকরদের সহিত অধিক কঠোর ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আজ তেহরানে গিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের এক পুত্র মস্কো গিয়াছে, আর এক পুত্র এবং কন্যা ফ্রান্সে আছে। আর আমি নিজে এই কন্যাদের সঙ্গে এইরূপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'মহামান্যা সুরাইয়া বেগমের শরীর বড়ই অসুস্থ, তিনি শয্যাগত আছেন। এমনকি, লেডি ডাক্তার পর্যন্ত তাঁহার নিকট আছে। এই কারণে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না। যদি ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকা হয় এবং তাঁহার শরীর কিছু ভালো হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।'

এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার এক দৌহিত্র ও চার দৌহিত্রী, অর্থাৎ রানি সুরাইয়ার চার কন্যা—আমিনা, আবেদা, আরেফা আর আদেলা প্রভৃতিকে দেখিলাম। রাজকুমারীরা অতিশয় সুন্দরী, তাহাদের পোশাক একেবারে আজকালকার ইউরোপীয় ধরনের এবং সকলেরই আধুনিক ধরনের চুল কাটা, এমনকি, বেগম তরজী সাহেবারও চুল কাটা এবং পোশাক একেবারে ইউরোপীয় ধরনের। এই মহিলাটির পূর্বপুরুষগণ আরব এবং শ্যাম দেশবাসী এবং আরব জাতির বিশেষ সৌন্দর্য তাঁহার চেহারায় বিদ্যমান আছে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'আমরা কান্দাহার হইতে এমনি অবস্থায় আসিয়াছিলাম যে, আমাদের পরনের কাপড় ছাড়া কোনো জিনিসপত্র, এমন কি, আর এক প্রস্থ কাপড় পর্যন্তও আমাদের সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নাই। এখানে আসিয়া আমরা হোটেলে দর্জি ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।'

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শাহ আমানুল্লাহ খানের প্রতি বিশেষ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা তাহাদের হৃদয়ে পোষণ করে। আর ভারতবর্ষের শুধু মুসলমান নহে, অন্যান্য জাতির মহিলাগণও মহামান্যা সুরাইয়া বেগমকে প্রাণপণে ভালোবাসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা শাহ আমানুল্লাহর জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে।'

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাস্তবিকই আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি রাখেন। কিন্তু আক্ষেপ যে, আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরা আমাদের কাফেরের ফতোয়া পর্যন্ত দিতে ত্রুটি করে নাই। বিশেষত এমন বাদশাহকে তাহারা কাফের বলিল, যিনি সিংহাসনে আরোহন করামাত্র সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দিয়াছেন—যাহাদের সংখ্যা সে দেশে কেবল শতাবধি নহে, হাজারের চেয়েও বেশি ছিল;—এমনকি, তাঁহার মাতার অন্তঃপুরে যে সমস্ত দাসী ছিল, তাহাদিগকেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন। আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ খানের এই ক্ষণিক রাজত্বের সময়ে একটিও বাঁদী দেখা যায় নাই; কেননা, বাঁদী অথবা 'গোলাম' কেহ রাখিলে তাঁহাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইত।—বাঁদী গোলামের স্থানে চাকর ও চাকরানি অন্দর ও বাহিরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই চাকরদের সহিত অধিক কঠোর ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর তিনি বলিলেন—'সমস্ত আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা যে, বাদশাহের মাত্র এক বিবি থাকে, তাঁহার দ্বিতীয় বিবি কিংবা কোনো রক্ষিতা থাকে না। আহা! এমন বাদশাহের বিরুদ্ধে তাহারা কাফেরি ফতোয়া দিল! বাদশাহ স্বদেশের উন্নতির জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন যে, তিনি দশ বৎসরের মধ্যে কাবুলকে গুলজার করিয়া তুলিলেন। তিনি রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন, ইমারত নির্মাণ করাইলেন, মোটর চালাইলেন, বৈদ্যুতিক তার লাগাইলেন, উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন, হাসপাতাল স্থাপন করিলেন। আধুনিক জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি দ্বারা কাবুলকে গৌরবময় করিয়া তোলাই তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি তদুদ্দেশ্যে নিজের দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তরুণদিগকে শিক্ষালাভের নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইলেন—যাহাতে তাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং, খনির কাজ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এবং যাহাতে নিজের দেশে নিজের লোকেরাই কাজ করিতে পারে!'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কাবুল শহরে বালিকাদের জন্য কয়টি স্কুল স্থাপন করা গিয়াছে।—তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এবং গণনা করিয়া বলিলেন—'কাবুলে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় স্বয়ং মহারানি সুরাইয়া স্থাপন করিয়াছেন। আমি উক্ত স্কুলসমূহ তদারক করিতাম। স্বয়ং মহারানি মেয়েদের পরীক্ষা নিতেন এবং যখন-তখন স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেন। এই স্কুলে যাহারা ভর্তি হইত তাহাদের মধ্যে গরিব মেয়েদের জোড়া-জোড়া কাপড়, এমনকি জুতা মোজা পর্যন্ত মহারানি দিতেন। বাদশাহ স্বয়ং প্রত্যেক মেয়েকে রাজকোষ হইতে বৃত্তি দিতেন—যাহাতে লোকে কাপড় ও বৃত্তির লোভে মেয়েদিগকে পড়ায়।'

অতঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আমি ইউরোপ, মিসর এবং সিরিয়ার বিদ্যালয়সমূহ দেখিয়াছি। আমি বলিতে পারি যে, কাবুলের বিদ্যালয় ঐ সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোনো কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর। বাদশাহ স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপে ও তুরস্কে এই কারণে পাঠাইলেন যে, সেখানে গিয়া তাহারা প্রত্যেক রকমের আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়া আসে—যাহাতে এই অশিক্ষিত দেশের বালিকাদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী আনিবার প্রয়োজন না হয়। শিক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে প্রেরিত ঐ সকল বালক-বালিকাদের খরচের জন্য রাজকোষের দ্বার বাদশাহ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে হাজার হাজার পাউন্ড মাসিক খরচ পাঠানো হইত।'

মহারানি সুরাইয়ার কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, 'আমার কন্যা অতিশয় সুশীল, সহৃদয়া ও আপন-ভোলা মেয়ে। তিনি নিজের স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা, সর্বসময়ে শোকে-দুঃখে তাহার ছায়াতুল্য সহচরী। আর তাহাদের দাম্পত্য-প্রেম অত্যন্ত গাঢ়।'

আমি বলিলাম, 'মহারানি সুরাইয়া অতিশয় ভাগ্যবতী। চিন্তা করিবার কিছুই নাই—যদিও তিনি এখন আর আফগানিস্তানের 'বদবখত' ও 'ছেয়াহ্ বখত্' লোকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর রাজত্ব করিতেছেন না, কিন্তু তিনি বাদশাহ আমানুল্লাহর উপর রাজত্ব করিতেছেন। রানি সুরাইয়া বাঁচিয়া থাকুন, বাদশাহ আমানুল্লাহ দীর্ঘজীবী হউন।'

মহারানির মাতা বলিলেন, 'যিনি নিজের দেশবাসী এবং আপন প্রজাদের রক্তপাত করিতে অনিচ্ছুক এবং যিনি শুধু রক্তপাতকে এড়াইবার জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়াছেন, এমন পুণ্যশ্লোক বাদশাহকে 'কাফের' ফতোয়া দেওয়া হইল! প্রকৃতপক্ষে, ঐ বদ্‌বখত্ অভিশপ্ত জাতি বাচ্চাই-সাক্কার মতো ডাকাতের রাজত্বেরই উপযুক্ত। বাচ্চাই-সাক্কা, সে কে? সে কেবল 'হ্যাট' পরার অপরাধে লোকেদের শিরশ্ছেদ করিয়াছেন। সে সকল রকম দোষ এবং পাপের বাজার গরম রাখিয়াছে; তাহার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে পর্যন্ত অপমানিত করিয়াছে। আমানুল্লাহ খাঁকে এই জন্য 'কাফের' বলা হয় যে, তিনি অন্যায় কার্য করিবার অনুমতি দেন নাই। তিনি অন্যায়কারীদের পরম শত্রু। তিনি শান্তিপ্রিয়, দয়ালু-হৃদয় এবং ধার্মিক। তিনি প্রাচীনকালের দাসত্ব মোচন করিয়াছেন। তিনি বদ্‌বখত্ আফগানিস্তানকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন এবং সভ্য করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ মহাত্মাকে 'কাফের' বলাই চাই!'

মহারানির মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, রাজকুমারীদিগকে দেখিয়া এবং মহারানির সঙ্গে আর একদিন আসিয়া দেখা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া, যাহা হউক, গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আজকে এমন পাষাণ হইতে পাষাণতর কে আছে যে, প্রকৃত মুসলমান পুণ্যাত্মা বাদশাহ্ আমানুল্লাহ এবং মালেকা সুরাইয়ার জন্য চক্ষু সজল এবং বুকে দীর্ঘশ্বাস না রাখে!

সওগাত,
ভাদ্র, ১৩৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবেহ্ সাদেক

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা—উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হও। ঐ শুন, 'মোয়াজ্জিন' আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ সাদেক—মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছে—তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাহারা ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধানা সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে—আমরা বঙ্গনারী গৃহ-কারাগারে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি, আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।

আমরা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিয়াছি। আমরা সময়ের গতির সহিত সমপদক্ষেপে নড়িব না। আমরা শপথ করিয়া বসিয়া আছি যে, আজানের শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিব না। কিন্তু তাহা যে আর হইবে না। ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!

আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াছি দাসী, চিরকাল দাসী, থাকিব দাসী।

আহ! কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন—

'মনের মরম ব্যথা প্রকাশিতে নারি,
কত পাপ ছিল তাই হয়েছিনু নারী।'

আমাদিগকে 'নাকেসুল আকেল' বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মূক বলিয়া কোনোকালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই। আমাদের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়—আমরা তাহাতেই গৌরব বোধ করি।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রভুগণ আমাদিগকে মুল্যবান অলঙ্কারের শামিল গণনা করিতেছেন। তাই দেখুন কত প্রকারের 'নারী রক্ষা সমিতি' গঠিত হইতেছে! বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ, তখন যাহাতে আমরা চুরি না হইতে পারি, সেজন্য জাগ্রত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রহরীর প্রয়োজন। আমার অভাগিনী ভগিনীগণ! আপনারা কী ইহাতে অপমান বোধ করেন না? যদি করেন তবে এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?

একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি—আমাদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়; তাই দেখুন, 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির' পার্শ্বে 'নারীরক্ষা সমিতি।' ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর কী হইতে পারে? যাহা হউক, এখন এ অপমানের ইতি হওয়া চাই।

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী। আমরা আসবাব নই; বলো কন্যে। আমরা জড়াউ অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো, আমরা মানুষ! আর কার্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ! অন্ততপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কত পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।

শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক. ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা চাউল ও যাঁতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লম্পঝম্ফ, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্তরূপ শরীরচর্চা শতগুণ শ্রেয়। খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গভর্নমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভালো কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।

যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,—উঠ, কর্তব্যপথে অগ্রসর হও।

মোয়াজ্জিন

আষাঢ়-শ্রবণ, ১৩৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম

মাননীয় সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণ!

আমি সর্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমনকি, অনেকে আমাকে এজন্য একটা nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আর আমার কোনো দেবতা থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন—"প্রার্থনা সময়ে 'ধনং দেহি, মানং দেহি' এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল একঘেঁয়ে—'স্কুলের জন্য গৃহং দেহি, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি' বলে। দাও বেটীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে!"

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্যের সহিত আমার দুটি কথা শুনুন।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'টা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে—

ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ি,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ি—
অন্তিম দশায় খাবি খাব!

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ-স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়; চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয় তবে সাইনবোর্ড থেকেও শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ, আমার কোনো বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথাব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখুন—এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙালি হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারলে, তখন তাঁরা চোখ খুললেন; পরে পাখির কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, 'আর রাত্রি নাই' ভোর হইয়াছে', তখন তাঁরা অলসশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়?—এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়; সুতরাং তখন তাঁরা দলে দলে খ্রিস্টান হতে আরম্ভ করলেন—ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলে 'ব্যানার্জি' হলেন, আর সরকার হলেন, 'সিরকা'! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজহিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সবংশে খ্রিস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হলো—তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রিস্টানের স্কুলে পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপরদিকে মোসলেম সমাজ যখন 'ঝোঁপড়ী মে শুয়ে মহলের খাব' দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙা চালের ভিতরও উঁকি মারলে। তখন তাঁরা আর কেবল 'পন্দেনামা' আর 'শাহনামা' পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রিস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল-কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খ্রিস্টানের কলেজে লেখাপড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন—বলেন বিলাতি বুলি; চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলি!'

তখন পর্যন্ত মোসলেম সমাজের ততবেশি অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলেমেয়েরা তা দেখতে পেত না—তারা বাড়িতে নামাজী মুসল্লি মাকে সর্বক্ষণ দেখত—সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা; আর পুব, দক্ষিণ যে-কোনোদিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে 'আল্লাহু আকবর' বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু 'রাহে নাজাত' এবং 'সোনাভান' পুঁথি পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না—তাই তাঁরা মেয়েদের দিলেন Convent এবং হিন্দু স্কুলে পড়তে। Convent-এ পড়তে গিয়ে লয়লার নাম বদলে হলো 'লিলি' আর জয়নব হলো 'জেনি'। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়েশার নাম হলো 'আশা', আর কুলসুম হয়ে গেল 'কুসুম'! ঐ পর্যন্ত হয়ে থামলেও ক্ষতি ছিল না, আমাদের অধঃপতনের ঐখানেই শেষ নয়।

পরবর্তী যুগে জেনির ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হলো খ্রিস্টান আয়ার, যাতে ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরাজি কথা বলতে শিখে। আর তার মেয়ের নাম হলো 'বারবারা আরীফ'। এখন বারবারা ঘরে তো আর মাকে নামাজ পড়তে দেখে না; সুতরাং তার খেলার আদর্শ হলো গির্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়িতে এসে গায়

'Jesus saves me this I know,
For the Bible tells me so--'

কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুসলমান বেইমান,
মারো জুতা, পাকড়ো কান!'

অপরদিকে আমাদের কুসুমের মেয়ের নাম হয়েছে 'সৌদামিনী বেগম'! সৌদামিনীর খেলার আদর্শ হয়েছে পূজা, আর মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়া। আর সে গান করে

'যমুনার মাটি অঙ্গেতে লেপিয়া
হরি নাম লিখ তায়;
সব সখী মিলে বল হরি হরি,
যখন পরান যায়।'

অথবা

'নেড়ে মুসলমান,—
তার না আছে ধন, না আছে মান!'

সেদিন Bengal Women's Education Conference উপলক্ষে জনৈক উচ্চশিক্ষা 'মুসলমান ব্রাহ্ম' মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে, যেহেতু তাঁর বাল্যকালে মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাঁর বাবা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যেভাবে হয়েছে তাতে তিনি কোরআন, হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নাই।

ঐরূপ একটি সুশিক্ষিতা মহিলাকে তাঁর পিতামাতা এবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ খরচের খাতায় লিখতে বাধ্য হলো। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা প্রকারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশ ভারী হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের খাতা কিরূপে বেড়ে যাচ্ছে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, গ্রাজুয়েট পাত্রী না পেলে তাঁরা বিয়ে করবেন না; মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্রাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায়, তবে তাঁরা খ্রিস্টান হয়ে যাবেন।

কেউ আবদার করে কাঁদেন যে, 'মা আমাকে একটা নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন; এখন তিনিই বউ নিয়ে থাকুন—ও কাঠের পুতুল নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না।' কোনো ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই.এ. পাস পাত্রী চাই। কেউ চান অন্তত ম্যাট্রিক পাস; তা না হলে তাঁরা খ্রিস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ—বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। এলাহাবাদের কবি আকবর সাহেব বেশ বলেছেন—

'তিফিল মেঁ আয়ে কেয়া মাঁ বাপ কে আতওয়ার কী?—
দুধ তো ডিব্বে কা হায়, তা'লীম হায় সরকার কী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন 'এম.এ. পাস' বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এজন্য সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তাঁরা আমাদের হাতছাড়া না হন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার আরও জানা আছে যে, অনেক বিকৃতমস্তিষ্ক ধর্মহীন লোক উপযুক্তা বিদূষী ভার্যার হাতে পড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসুল্লী হয়েছেন।

এই বিংশ-শতাব্দীতে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে নানারকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জিত করে আঁকড়ে ধরে আছেন; আমাদেরই উত্তরাধিকার, 'তালাক' 'খোলা' প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে, 'পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার বিল', পত্নীত্যাগ বিল', 'পরিত্যাগ বিল' ইত্যাদি নানারকমের বিল পাস করিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি সুন্দর ধর্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচারপ্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত জানোয়ার সাজতে বসেছি 'সুরেন্দ্র সলিমুল্লা, স্যামুয়েল খাঁ'গোছের নাম শুনতে কেমন লাগবে?

ফল কথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ঔষধ—একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়—যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলর এবং গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন, আমাদের মেয়েরা কোন্ পাপে ঐসব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে? আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিতা হবে—যাদের সন্তানসন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক, হযরত ফাতেমা জোহরার মতো। এর জন্য কোরআন শরিফ শিক্ষার বহুলবিস্তার দরকার। কোরআন শরিফ, অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুলপ্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতুম,—'কোরআন শরিফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।' সে-কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কোরআনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরআন শরিফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরিফের বিধান অনুযায়ী ধর্মকর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[২]

মাসিক মোহাম্মদী,
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

টীকা

১. গত ৮ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের' ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত লেখাটি সেক্রেটারি সাহেব কর্তৃক পঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেন্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. পরম ভক্তিভাজন বেগম সাখাওয়াত হোসেন সাহেবের এই প্রবন্ধটি আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পত্রস্থ করিলাম। প্রকৃত কাজের কদর যে-সমাজে নাই, তাহাতে কাজের লোকের সৃষ্টি খুব কমই হইয়া থাকে এবং কচিৎ কদাচিৎ হইলেও সমাজের উপেক্ষা ও অবহেলার আঘাতে অনেক সময়ে মানুষের প্রাণ অবসাদে-অভিমানে মুষড়িয়া পড়ে। লেখিকার ন্যায় আদর্শ মহিলা সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা করার যে বিশেষ কোনো কারণ নাই, তাহা অবগত আছি। কিন্তু তত্রাচ বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই লেখার ছত্রে ছত্রে, বাহিরের হাসিকৌতুকের অন্তরালে ক্ষোভের একটা মর্মান্তিক জ্বালা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। সমাজের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে, আমাদিগকে আজ এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না।

এই প্রবন্ধে লেখিকা একস্থানে বলিয়াছেন—'আমার কোনো বংশধর নাই।' আমরা তাঁহার এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। আল্লাহতায়ালার মঙ্গলময়ত্বের কোমল-কঠোর আঘাতে যে মাতৃহৃদয়ের বিগলিত করুণাধারা 'পিপাসার' নামে কারবালার মরুপ্রান্তরেও স্বর্গের ছল-ছবিল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, একের বাঁধ ভাঙিয়াই তো সে আজ সহস্রমুখী হইতে পারিয়াছে। তাই তো আজ তিনি একটিকে বিসর্জন দিয়া শত সহস্র কন্যার মাতৃকর্তব্যের গৌরবময় জ্বালা বুক পাতিয়া লওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

সম্পাদক মাসিক মোহাম্মদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হজের ময়দানে

[৯ জিলহজ]

অদ্য পবিত্র হজের দিন। এই তীর্থযাত্রা মুসলমানদের ধর্মের চারি অঙ্গের একটি অঙ্গ। প্রথম অঙ্গ নামাজ, দ্বিতীয় রোজা, তৃতীয় জাকাত এবং চতুর্থ হজ।

প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য অন্তত জীবনে একবার হজব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। পরিষ্কার বস্ত্র, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শরীর, সর্বোপরি ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ মন, পবিত্র প্রাণ লইয়া হজ করিতে হয়। যাত্রার পূর্বে সমস্ত দেনাপাওনা চুকাইয়া, স্ত্রীপরিজন বা অপর পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হয়। পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই। উপরন্তু অশ্রুতপূর্ব ঘটনা কিংবা বিপদআপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত হাতে কিছু অতিরিক্ত টাকাও থাকা চাই। মক্কা শরিফে গিয়া যেন পরের দ্বারস্থ বা গলগ্রহ হইতে না হয়। এক-কথায়, পার্থিব সমস্ত বিষয় হইতে অবসর লইয়া আল্লাহর দরবারে ধন, মন, তন, প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়।

'ওমরাহকে সাধারণত ছোট হজ বলা হয়। হজ ও 'ওমরাহ'তে অতি সামান্য পার্থক্য আছে। 'ওমরাহ' সকল সময়ই পালন করা যায়, কিন্তু হজ বৎসরে একবার মাত্র জিলহজ চন্দ্রের ৯ তারিখে সম্পন্ন করিতে হয়।

৯ জিলহজের দিন এই হজব্রত পালন করা হয় এবং যাত্রিগণের ৭ তারিখের পূর্বেই মক্কা শরিফ পৌঁছা কর্তব্য। হজের সময় কী কী বিধান পালন করা কর্তব্য, তাহা সেখানে গেলে তথাকার 'মু'-অল্লিম'দের নিকট সহজেই শিক্ষা করা যায়।

প্রধান ক্রিয়া 'আরকান'সমূহ মোটামুটি এই

১. ইহরাম বাঁধা। এ সময় সমস্ত পোশাক খুলিয়া বিনা সেলাইয়ের দুই খণ্ড শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে হয় ও সমস্ত মস্তক অনাবৃত রাখিতে হয়।
২. তওয়াফ, অর্থাৎ কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।
৩. সা'ঈ, অর্থাৎ 'সাফা' এবং 'মারওয়া' নামক দুইটি ছোট পাহাড়ের উপত্যকায় সাত বার দৌড়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

ইহাতে দেখা যায় যে, ইহরাম সমস্ত নরনারীকে তুল্য অবস্থায় রাখে—পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সকলেই সেলাইবিহীন সাদাসিদে কাপড় পরে এবং সকলেই আড়ম্বরশূন্য সাধারণভাবে সাধু জীবনযাপন করে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, স্বদেশী, বিদেশী সকলে এক সাম্যমন্দিরে অবস্থান করে। এই দিন এই স্থানে রাজা, বাদশাহ আর নগণ্য কৃষকে কোনো প্রভেদ থাকে না। ইহরামে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান।[১]

সেখানে পদ ও বর্ণ, সম্পদ ও জাতি, রাজা ও প্রজায় কোনোই প্রভেদ নাই। স্রষ্টার সম্মুখে সকল মানবজাতি সেখানে একই আকার ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণে 'আরাফাত' নামক আশ্চর্য মরুভূমিতে সমগ্র মানবজাতির সাম্যই সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য। আরাফাতেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সক্ষম হয়।

সমগ্র পৃথিবীর আর কোনো স্থানে এরূপ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হয় না। তীর্থযাত্রীর অবস্থা, তীর্থযাত্রার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ, পরিভ্রমণ ইত্যাদিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্তবৃন্দ আল্লাহতায়ালার প্রেমে অনুপ্রাণিত।

নির্বিকার ও সত্যকার 'ঈশ্বরপ্রেম' এই স্থানেই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। উপাসকের হৃদয়ে প্রেমবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, নিজের শরীর তাহার নিকট অবহেলার বস্তু। নিজের মনপ্রাণ আল্লাহর দরবারে বিসর্জন দেওয়াতেই তাহার পরম আনন্দ। প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় সে বাঞ্ছিতজনের গৃহের চারিপাশ দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করে এবং দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুত সে নিজের সত্তা পারমার্থিক সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া নিজের সকল স্বার্থ ভুলিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।

তীর্থযাত্রী পার্থিব সকল যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছে, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তাহার আর কোনো আকর্ষণ নাই। তীর্থ ভ্রমণই (অর্থাৎ হজ) আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম উৎকর্ষ। তীর্থযাত্রী (হাজী) তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকট প্রচার করিয়াছে যে, 'মানবতার চরম সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পার্থিব যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত প্রকৃত সংযোগ রাখিতে হইবে।'

'আরাফাত' প্রান্তরের এই দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। সেখানকার জলবায়ু এমনই আল্লাহপ্রেমের মদিরায় পরিপূর্ণ যে, সেখানে অবস্থানকালে মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না; তাহার একমাত্র কাম্য হয় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। তাহার শিরায়-শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রেমের বিদ্যুৎ চলাচল করে। তাহার মনোগত ভাব এই হয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী যেন স্বপনে হারাই আপনে,
মনেই থাকে না এ যে ধরাতল।'

এই অবস্থায় হাজীর মনের ভাব অতি নির্মল ও পবিত্র হয়। কোনো একটা বটতলার পুঁথিতে দেখিয়াছি, বেহেশতবাসীদের মধ্যে কোনো কোনো পুণ্যাত্মা একবার আল্লাহর দর্শন পাইবেন, সে-সময় আর তাঁহারা বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না, মিনতি করিয়া বলিবেন—

বেহেশতে না যাব মোরা, মেওয়া না খাইব,
দেখিয়া তোমার রূপ এইখানে র'ব।

আরাফাতের প্রান্তরে দাঁড়াইয়াও হয়তো লোকের মনের ভাব এই প্রকার হয়। অন্তরের অন্তর হইতে সুর বাজে—

'নাহি চাহি ধন-জন-মান—
নাহি, প্রভু! অন্য কাম!

আহা! এ ময়দান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না!'

হজ সমাপনান্তে কোরবানীর পালা। কোরবানী বলিতে হাজীগণ পশু হত্যা করেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মনের সমস্ত কলুষ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দুষ্ক্রিয়ার কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্তরের যাবতীয় কালিমা হত্যা করিয়া নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন।

হজের সময় নরনারীর তুল্য অধিকার। উভয়ের পরিধেয় একই প্রকার সেলাইবিহীন দুই খণ্ড বস্ত্র মাত্র। এখানে জরীর লেস ঢাকা নতুন ফ্যাসানের বোরকা নাই, ঘেরা-টোপ ঢাকা পালকিও নাই। শরীফজাদী বিবিদিগকে পদব্রজেই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপত্যকায় দৌড়াইতে হইবে; কাবাশরিফ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। এ সময় পুরুষদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি অনিবার্য।[২]

ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা হজের জন্য আলাদা 'পরদানশীন' দিবস প্রচলন করেন না কেন? কলিকাতায় যেমন প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অবরোধবন্দিনীদের জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য করা হয়, ভারতীয় শরীফগণ সেইরূপ নারীর জন্য হজের স্বতন্ত্র দিন ধার্য করিতে পারিলে বুঝিব, তাঁহারা মরদ বটে।

পরিশেষে ভক্তির সহিত এই প্রার্থনা করি, যেন সকল মুসলিম নরনারী জীবনে একবার হজের প্রান্তর দেখিতে পায়।—আমীন!

মাসিক মোহাম্মদী
বৈশাখ, ১৩৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. 'ইহরাম' নরনারী নির্বিশেষে সকলকে বাঁধিতে হয়। তবে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য ইহার প্রকারভেদের ব্যবস্থা আছে। মুখ আবৃত করিয়া রাখাই নারীদের ইহরামের প্রধান অঙ্গ।
সম্পাদক মাসিক মোহাম্মদী।

২. কোনো এক সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন—'যাহারা নারীর জন্য অবরোধ প্রথাকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গ বলে, তাহাদিগকে ফতওয়া দেখাইতে হইবে যে, স্ত্রীলোকের জন্য হজ নিষিদ্ধ! কারণ, হজ করিতে গেলে নারীকে সর্বপ্রকার ইহরামের সময় মুখাবরণ খুলিতে হইবে।' ইত্যাদি—লেখিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল

[সফল স্বপ্ন]

সে বহুদিনের কথা (১৯০৫ খ্রি.)। তখন আমরা ভাগলপুরের বাঁকা নামক সাবডিভিশনে ছিলাম। মরহুম ডেপুটি সাহেব (আমার পূজনীয় স্বামী) 'টুর'-এ গিয়াছিলেন; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইদিন আমি কী করিতেছিলাম! তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, 'Sultana's Dream' দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'A Terrible Revenge.' (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মি. ম্যাকফারসনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন!

যথাসময়ে লেখাটা মি. ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরত আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেইসঙ্গে ডেপুটি সাহেবকে যে-পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English.... I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious."

ভাবার্থ—

'ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং অপূর্ব। রচনার ইংরাজিও নিখুঁত। আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ুপথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারই আভাস দিয়াছেন। এ-বিষয়ে কল্পনা অতি মনোরম।'

যে-সময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেটপ্লেনের অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আইসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্তত আমি তখন সে-সব কিছুই দেখি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ খ্রি.) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনো উড়োজাহাজে উঠিতে পাইব, এরূপ আশা কখনোই করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।

গত ৩১ নভেম্বর (১৯৩০ খ্রি.) রবিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীমান মোরাদ আসিয়া বলিলেন, 'খালাআম্মা, চলুন, আগামী পরশু আমার প্লেনে আপনাকে উড়াইয়া আনি; কলিকাতার চারিদিকে উড়িতে প্রায় ৩৫ মিনিট লাগিবে!' তখন আমার প্রাণ অভূতপূর্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

এ-শুভ সংবাদ বেশি লোককে জানাইলাম না দুই কারণে :—প্রথম কারণ এই যে, মাত্র দুইমাস পূর্বে, 'আর ১০১' নামক সুবৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ায় ৪৫ জন হতভাগ্য আরোহী সশরীরে নরকানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার বিভীষণস্মৃতি লোকের মনে তখনো জাজ্বল্যমান থাকায় সকলের মনে এরোপ্লেন সম্বন্ধে ভয়ানক আতঙ্ক আছে বলিয়া আমাকে লোকে উড়িতে বাধা দিবে। দ্বিতীয় কারণ, অনেকে ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার ফটো লইতে।

যথাকালে ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা শুভযাত্রা করিলাম। এক মোটরে মিসেস রাসাদ (শ্রীমান মোরাদের মাতা), তাঁহার তৃতীয় পুত্র কোয়াদ, মিসেস দে এবং আমি; অপর মোটরে আমার ভগিনী ও তাঁহার পুত্রকন্যা প্রমুখ ছিলেন। যাত্রার সময়ে দেখি, আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী মিসেস দাউদর রহমান আসিয়া উপস্থিত। তিনিও আমাদের সঙ্গে দমদম চলিলেন।

এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান! কেবল আমাদের মোটর তিনটি এবং আমরাই। আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান 'মোরাদের' প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি—ধরাখানা সত্যই সরা তুল্য। আমি ক্রমে ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। আমার দক্ষিণদিকে অস্তগামী সূর্য, বামদিকে ১১ রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণপ্রায় চন্দ্র—উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নিচে চাহিয়া দেখি—কলিকাতার পাকা বাড়িগুলি, কোঠা-বালাখানা, এমারত সব ইস্টকস্তূপের মতো দেখাইতেছে—হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ, আর হুগলী নদী—সে তো জলাশয়ের সামান্য একটি রেখার মতো দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নিচে আসিলাম। আমি নামিলে পরে মিসেস রাসাদ মাত্র ৫ মিনিটের জন্য উড়িলেন। শোকর আল-হামদুলিল্লাহ।

২৫ বৎসর পূর্বে লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধবন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই। আমার পূর্বে যে কয়জন বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা এরোপ্লেনে উঠিয়াছেন, তাঁহারা উড়িয়াছেন সুদক্ষ ইউরোপিয়ান পাইলটের সহিত। আর তাঁহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স্ ছিল। আমার এসব কিছুই ছিল না। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও নিরুপায় অবস্থায় একটি বালকের সহিত গিয়াছিলাম। মধ্যপথে প্রয়োজন বোধ করিলে মোরাদের সহিত কথা বলিবার আমার কোনোই উপায় ছিল না। শীতকষ্ট হইবে না শুনিয়া গায়ের শালখানাও 'মিসেসদের হাতে ফিরাইয়া দিলাম। প্লেনে বসিলে মোরাদ বলিলেন, 'খালাআম্মা! ভালোমতো কান ঢাকিবেন।' যাহ্! কান আবার কী দিয়া ঢাকিব?—শালটাও তো ফেলিয়া আসিলাম। সে-সময় মাথার আঁচলখানাই ছিল একমাত্র সম্বল। ইঞ্জিনের ভয়ংকর গর্জনে যখন কানে তালা লাগিতেছিল, তখন বুঝিলাম, মোরাদ কেন কান ঢাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অভ্যন্তরীণ আনন্দের আতিশয্যের তুলনায় সে কষ্ট অসহ্য হইলেও নগণ্য বোধ হইল।

বিমান-বীর মোরাদের সৎসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কিন্তু আমি বলি, মিসেস রাসাদের ধৈর্য এবং সাহসও কম নয়। বেচারী অসহায়া বিধবা যে কতবড় পাষাণে বুক বাঁধিয়া প্রথম সন্তানটিকে সম্পূর্ণ একাকী কেপটাউন অভিমুখে রওনা হইতে দিয়াছিলেন এবং এখনো মোরাদকে একাকী বিলাতে যাইয়া প্লেনে কাজ শিখিতে দিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। আল্লাহ তাঁহার সহায় হউন! আমিন!

মোয়াজ্জিন
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর অধিকার

আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্রপাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুক, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় একতরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্তত এইটে তো প্রায় প্রতিক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থশ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোনো ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ভভরে প্রচার করে, 'আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।' তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে নিয়ে; সামনে বারান্দায় কিংবা উঠানে বসে স্বামী নামক জীবটাকে নিয়ে কতকগুলি পুরুষ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চৈঃস্বরে

'আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরে দিলাম তালাক।'

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধহয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এরপর কোনো বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, নাকের, হাতের অলঙ্কারগুলি খুলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক-টুকরা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙে দেয়, আর বলে, 'দেনমোহর মাফ করে দিয়ে যা!' মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে, সাজসজ্জা হারিয়ে, হাতে গড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য—পুরুষটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবকরূপে উপস্থিত থাকে (কারণ এইরূপ দু-একজনকে পূর্বেই ডেকে আনা হয়) সেই অভিভাবকস্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে টেনেহিঁচড়ে পালকি কিংবা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকা বিবাহে কত আগ্রহ ও সাধ, সেই সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে এই একটি ছড়াও প্রচলিত রয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে।
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে।'

মাহে-নও
মাঘ, ১৩৬৪

টীকা

১. ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, বাংলার মুসলিম মেয়েদের জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বিদায় নিয়েছেন এই মাটির পৃথিবী থেকে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিন্তা করেছেন এদেশের অভাগিনী মুসলিম নারী জাতির কথা। ৯ ডিসেম্বর ভোররাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে-রাতেও তিনি ১১টা পর্যন্ত তাঁর টেবিলে বসে কাজ করেছিলেন। যে টেবিলে শেষ লেখাপড়ার কাজ করে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানে পরদিন এই অসমাপ্ত লেখাটি পেপার ওয়েটের নিচে দেখা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর পরিবারের সকলের গৌরবের পাত্রী। তাই, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার জন্ম হলেও আমার অক্ষর পরিচয়ের আগেই হয়েছিল বেগম রোকেয়ার অপূর্ব জীবন ইতিহাসের সাথে পরিচয়। তাঁর জীবনের শেষমুহূর্তের সাথীর একজনের কাছ থেকে কিছুদিন আগে পেয়েছি তাঁর শেষ চিন্তাধারার দিশা—যে লেখা আরম্ভ করে শেষ করবার অবকাশ আর তিনি পেলেন না মহাকালের ডাকে।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুকালে তাঁর চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশীদ সাহেবা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে তাঁর কাছেই ছিলেন। তিনি এই লেখাটি বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁর টেবিল থেকে নিয়ে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। বছর দুই আগে বেগম মরিয়াম রশীদ পরলোকগমন করেছেন। তার কিছুদিন আগে তিনি লেখাটি বেগম রোকেয়ার প্রিয় শিষ্যা ও সহকর্মিনী বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের হাতে দেন।

বর্তমানে পুরুষের একাধিক বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। বিবাহ ও পারিবারিক আইন, এসবের আলোচনা চলছে। কিন্তু সে-যুগেও বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে বিবাহবিচ্ছেদ ও নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলেছিল। এতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেগম সখিনা ফাররুখ, সুলতানা মুয়ায়িদজাদা, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ও আরও বহু মহিলা।

পুরুষদের তালাক দেবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ করা সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গের কিছু আভাস এই লেখাটিতে বেগম রোকেয়া দিয়ে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়া আজ সশরীরে আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে। তাঁর আরব্ধ মহৎকাজ সম্পন্ন করেই তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান আমরা প্রদর্শন করতে পারি। জীবনের শেষমুহূর্তেও তাঁর লেখনী দিয়ে গেছে আমাদের কাজের দিশা। তিনি যে দিশারী।—মোশাফেকা মাহমুদ ('নারীর অধিকার' প্রবন্ধটির সংগ্রাহিকা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন

এখন আমরা হিমালয়ে আছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্বত দেখিলাম। পাঠিকাদিগের নিকট হিমালয় নূতন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত—নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এসব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশি দুঃখ হইত এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়, আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না। এতদিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথাসময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি স্টেশনে আসিয়া পহুঁছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইস্ট ইন্ডিয়ান গাড়ির অপেক্ষা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলগাড়ি ছোট। হিমালয়ান রেলগাড়ি আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট, ক্ষুদ্র গাড়িগুলি খেলনা গাড়ির মতো বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়িগুলি খুব নিচু।–যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়িগুলি "কটাটটা"—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতিউচ্চ (Steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment Room এবং স্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব স্টেশনেই Ladie's waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপীয় ভগ্নিগণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room -এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—একসঙ্গে চারিজন হাত মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নিরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুনি, ব্রাশ পাউডার তো রাখেন। বাঙ্গালি মেয়েরা এত ঘন ঘন চুল বিন্যাস করিতে পারে না। যাহা হউক ইউরোপীয় ভগ্নিদের স্ফূর্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিং রুমে 'ভুটিয়ানী' আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (Sea level) হইতে তিন হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্মল শ্বেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুজ্‌ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমান্তের ন্যায় দেখায়। নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকাবাঁকা সিঁথি!!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে হিমাদ্রির পাষাণ বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহাদেরই কোনো একটি বিশালকায় জাহ্নবীর উৎস, এ কথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝর্ণার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই সেই জন্য বোধহয় গাড়ি থামিয়াছে। (বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্তন করা হইতেছিল) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফিট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে। এইখানে ৪১২০ ফিট উচ্চে 'মহানদী' স্টেশন। স্টেশনের নামটা খুব ভালোমতো পড়িতে পারি নাই, যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধহয় 'মহানদী'ই নাম। যাহা হউক, যদি স্টেশনের নাম ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার দোষ নহে—স্টেশন হইতে আমার গাড়ির দূরত্বের সে দোষ।

অবশেষে কারসিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফিট। স্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি Ladie's waiting room-এ একটু বসিলাম। ইউরোপীয় ভগ্নিদের মুখ ধোয়া এবং কেশ বিন্যাস দেখিলাম। একজনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আয়াকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়িতে উঠিতে গেলেন। আয়ার কি গরজ, যে ছেলের মুখ ধোয়াইব? সে তাহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনুমান দশ সেকেন্ড দেরি করিয়া গাড়ি অভিমুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐরূপ হয়ই। ট্রেন ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিং রুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

স্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূরে নহে, শীঘ্রই আসিয়া পহুঁছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জিলীঙ্গের ঠিকানায় Book করা হইয়াছিল। জিনিসপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহমুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জিলিং যাবার পূর্বে আমাদের জিনিসপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল। পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহমুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব-সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু তো খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভালো নহে। আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরনার সুবিমল, শীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, দর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হাল্কা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে চমৎকার। এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল, মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্যের রাজ্য রচনা করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায় তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোনো কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলা"য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবনিফেয়াস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন এই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারি আনন্দ হইল। একটা ডাল ভাঙিয়া মাপিলাম ১১ ফিট লম্বা। স্বয়ং তরুবর ২০/২৫ ফিট উচ্চ হইবে।

কোনো কোনো স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালোবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই-তিনবার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশে স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরানি "ভালু" বলে, জোঁকে কী ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়। ভুটিয়ারীরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মতো করিয়া পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে, গায় জ্যাকেট এবং বিলাতি শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই-এক মণ বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তরসঙ্কুল আবুড়াখাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে। ঐরূপ নিচেও যায়। যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে।

মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, 'রমণী জাতি দুর্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা।' জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে, সমভাবে উপার্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশি বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। 'সবলেরা' পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে 'সবলেরা' বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধহয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুটিয়ানীরা 'পাহাড়নী' বলিয়া আপন পরিচয় দেয় এবং আমাদিগকে 'নীচেকা আদমী' বলে। যেন ইহাদের মতে 'নীচেকা আদমী'ই অসভ্য। স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু 'নীচেকা আদমীর' সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদগুণরাজি হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার 'নীচেকা আদমীর' সঙ্গে বিবাহও হয়। ঐরূপে ইহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

মুসলমান ধর্মে শাস্ত্রানুমোদিত পরদা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহাবিপদ ভাবে। শাস্ত্রে পরদা সম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পরদা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর। যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পরদা সে-ই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানব জাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটা ঝরনা বহিতেছে, এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কী বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকি ছিল পর্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ তো মিটে নাই যত দেখি, ততই দর্শনপিপাসা শতগুণে বাড়ে। কিন্তু কেবল দুটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি উচ্চ শৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরনা প্রথমে যেন বলে, আমায় দেখ। আমায় দেখ। যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি তখন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, আমাকে কী দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর। ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ কত বিস্তৃত, কী মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্টজগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র। বালুকা কণা বলিলেও বড় বলা হয়।

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্তন না করি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টিয়াপাখির মতো কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্তত আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া ওঠে, 'ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য।' তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডূকের হিমালয় বর্ণনা আজি এইখানে সমাপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী-পূজা

'হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়', একখানি পুরাতন 'ভারতী' পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমি বলিলাম, 'হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোনো দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।'

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'মাফ করুন মিসেস চ্যাটার্জি! এ দেশে ললনারা পদদাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!'

জমিলা একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইহার খুব বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন; খুব ভালো উর্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা এত অধিক যে, ইহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মুসলিম রমণীদের সহিত আমার পরিচয় মাত্র দুই-তিন মাস হইল হইয়াছে; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য-সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি 'ভারতী' দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'এ দেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ!'

আমি ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে তাহাকে দেবীরূপে কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী কল্পনার কথা ছাড়িয়া সত্য ঘটনা দেখান।

আমি ও ভাই কুসুম! তুমি আমায় সাহায্য কর। আনো তো তোমার মহাভারতখানা, ইহাদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম : তোমরা তিনজনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিত্ব করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি? বর্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কি দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ ভারত-ললনাকে দাসী বলিতে চান?

জমিলা না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজ গুণে ধন্য হইয়াছেন। সীতা নিজে ভালো লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কিরূপে পূজা করিয়াছিল?

আমি (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা তাঁহারা বিদুষী ছিলেন, সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই-চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি কিন্তু আর কী? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, খনা সর্বসাধারণ কর্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা ক্ষমা করুন, মিসেস চ্যাটার্জি। আমার কথাটুকু শেষ হইতে দিন। খনা এখন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কী প্রকারে তাহা কি আপনি বিদিত নহেন? তাঁহার যে রসনা ঐ বচনগুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে!

আমি হত্যা তো করা হয় নাই; —তবে হ্যাঁ,—খনার রসনা কর্তিত হইয়াছিল।

জমিলা : 'হত্যা' কি গাছে ধরে? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম আপনারা পুরাতন কথা ছাড়ুন। বর্তমান শতাব্দীর ঘটনা দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি : বেগম সাহেবারা দুইজন, আর আমি একা। জোর যার, মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম সে কী! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন? যত দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা আমরা দুইজন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্বল। কারণ আপনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা;—(ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ এ. ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদিকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড়বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না? খ্রিস্টাব্দের ২০শ শতাব্দী?

কুসুম : ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়;—এই শেষ একশত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বেশ! ইদানীং ব্রহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটি কথা শুনিয়া রাখুন,—আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব করেন, তখন উক্ত সমাজের দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি এ বড় শক্ত condition!

কুসুম শক্ত হইলেও পণটা ন্যায়সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্বেই তোমার ফাঁকির পথ বন্ধ করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি?

আমি কী রকম ফাঁকি?

কুসুম উঁহারা কোনো হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, 'আমাদের ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না।'

আমি তাহা তো ঠিক। ব্রাহ্মসমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমেনা : যদি কেবল নববিধান সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজের দেবী লইয়া টানাটানি করেন কেন? কেবল গুণের প্রশংসার ভাগ লইতে অগ্রসর হইবেন, আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা তো বড় অবিচার!

জমিলা এই জন্য আপনি বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থাক, নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই, অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলাম, একটু পরে ভাবিলাম, 'আমি এতই ভীরু যে বিনা তর্কে হারিব?' প্রকাশ্যে বলিলাম

'না বেগম সাহেবা! আপনাদের ভয় নাই' আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না—চলুন!'

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু মিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইল, আমি জেদ ধরিয়া বলিলাম—

'কই বেগম সাহেবা, আপনি তো একটিও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না!'

জমিলা বলিল, 'একটি কেন, অনেক বলা যায়',—'সে বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা?'

আমি আপাতত একটি শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা : বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন, সেই হিন্দু কুলকামিনীর ভাষায় তো আমরা শুনিতে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে,
গড় কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?

* * *

বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি

* * *

নাই দয়া নাই ধর্ম, বোঝে না'ক কর্মাকর্ম
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়।'

কী বলেন ভাই! ঐ কয় ছত্র পদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের 'আর্তনাদ' না পূজা প্রাপ্তিতে হর্ষে 'আশীর্বাদ' বলিব?

আমি উহা তো কবির রচনা—কল্পিত বেদনা।

জমিলা :—আপনি বাল্যবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিলেন?

আমিনা একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য,—

কুসুম : ধ্রুব সত্য।

আমিনা কিন্তু ইহা তো সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।

আমেনা : কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে নারী-পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত 'Heart Beats' গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন?

আমি প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, 'হাঁ দেখিয়াছি। তাহাতে কোনো ললনা দলনতত্ত্ব নাই।'

আমেনা মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মোঃ এস. জে. ব্যারোস কর্তৃক লিখিত মজুমদার মহাশয়ের জবানিতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।

আমি অবলাপীড়নের নমুনা?—আচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে?

আমেনা স্থির স্বরে বলিলেন, 'হাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছিলেন।[১] বাড়ির গাভীটার কোনো রূপ পীড়া হইলেও বোধ হয় কর্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪শ হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না; আর ঈশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব, পরিবারের একজন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, এ কথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্যদের সুখনিদ্রা ভাঙাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্তাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই![২] চাকরটা পর্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না—না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মতো বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটিলেন,—(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলের গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের বাড়ি গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগ্যকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটি তো ভারতবর্ষেরই পুরুষ, সে অবশ্য জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য প্রভুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

'আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই ঊনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগলপ্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কি আকুলতা, কি মর্মান্তিক যাতনা ছিল, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের যত প্রকার আশীর্বাদ ভোগ করি, তন্মধ্যে মাতৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ। সব সুখসমৃদ্ধি তুলাদণ্ডের একদিকে, আর মা একদিকে!!'

'ইহাকে—বিধবার প্রতি এইরূপ নির্মম নির্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী-পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।'

আমি ঈদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটি বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম না প্রভা দিদি! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে কথা এই যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মতো ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সে সব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই-চারিটি পরিবারের ঐরূপ অবস্থা জানি।

আমি (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোনো লোমহর্ষক ব্যাপার অবগত আছেন?

জমিলা একটি ঘটনাা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; সে অনেক কথা!

আমি বলুন, শুনি।

জমিলা বলিলেন,—'একজন বড়লোকের শিশুকন্যা পীড়িত ছিল। বাড়িতে দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ি, যত প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে, সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিকে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকির চিকিৎসা হইতেছিল না।'

'কোনো অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন,—কর্তা শুনিলেন না! এমনকি কর্তা একদিন নিজের প্রয়োজনবশত ডাক্তারের নিকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকির অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কী কখনও মরে?' এই বলিয়া কর্তা প্রস্থান করিলেন।

'অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপায়ান্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন! পুংশাবককে যখন পিতা হনুমান বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটিকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে! কিন্তু পর্দানশীন মহিলা পিতৃ-অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন—থাকুন; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কী?'

আমি "ঈস্! মানুষ এমন পাষণ্ড হয়! শেষে কী হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?'

জমিলা 'শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, সে নিজে ডাক্তারের নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকি বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সকলেই জীবিত আছেন!!'

আমি 'পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান?'

জমিলা : 'তাহা আমি বলিব না,—তাঁহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া কাজ কি? এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!'

আমি 'দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মুসলিম রমণী একেবারে নিরুপায়। ঐ পর্দা তাঁহাদিগকে পশু—হনুমানমাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।'

আমেনা অবরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে-মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যতদিন ভদ্রশিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পরদা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষসমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কুসুম : আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই! তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পরদার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্ত্রী-কন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন?

জমিলা পরদার আদি স্রষ্টা কে? তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কোনো মুসলিম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তখন তিনি বলেন, 'আমরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্দার স্রষ্টা, হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পরদার আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন, তাহা ঠিক নহে।' আবার যে মুসলমান ভাইটি পরদার প্রতিকূলে কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, 'পরদার প্রথা মুসলমানেরা বিধর্মীদের নিকট শিখিয়াছে।' যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনিই হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি আপনারা ধীরে ধীরে পর্দা ছাড়েন না কেন? আমরা তো ছাড়িয়াছি।

জমিলা : আপনারা পরদা ত্যাগে খুব ভালো আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যে ভাবে পরদা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন?

আমেনা ভয় না করুন, কিন্তু অনেকে প্রকৃত পরদার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং অনেক স্থলে পবিত্রতা নষ্ট—

আমি থামিলেন কেন? বলুন—

আমেনা আমি একটি অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখসুবিধার জন্য আমরা সে কর্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি : হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পরদা ত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনাদিদি হয়তো ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি কিন্তু মোটের উপর মুসলিম সমাজে যেরূপ রমণী-পীড়ন হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের 'আনারকলি'র সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন? সম্রাট আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর আনারকলির শবের উপর সেই সুন্দর সমাধি ভবন নির্মাণ করিয়াছেন! পরন্তু তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোনো বিষাদের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে?

জমিলা মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে 'নারী-পূজা করি' বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ-দেশের কাট-মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্মত কর্তব্য!

আমেনা : আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাট-মোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কুরআন শরীফের বিধান মানিলে অবলা-পীড়নও চলে না; অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আপনারা কি মনে করেন, কাট-মোল্লারা অন্যায় পরদার পক্ষপাতী?

জমিলা দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা হ্যাঁ, ঠিক বলিলেন। এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি। মোল্লাদের কথা ছাড়ুন, মিসেস চ্যাটার্জি!

আমি : মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবেন কিরূপে?

জমিলা : মধুলুণ্ঠন করিবার সময় তো পূর্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধূম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয় এবং সে সময় দুই-একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মূর্খতা হইবে। এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি তাহা তো আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব।

আমেনা : বলিবার তো অনেক ছিল; সে সব মর্মভেদী কাহিনী কি বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম।

টীকা

১. 'Everybody in the house was up expect my uncle, who was the Karta (Head), Nobody seemed to care to call in a doctor.....My perplexity may be imagined.'

২. Rushing to speak to my uncles, I was not admitted to their rooms; and no one, not even a servant, would go for a medical man. maddened and despairing, I rushed into the streets, tried to call up Keshub and other friends; but every gate was shut for the night. I ran to a doctor's house in the neighbourhood, but his servant turned me out. I don't know into how many places I went, and pleaded my poor, dying mother's case, but could not get medical help.

What need to bewail the world's hard heartedness? What need to curse the selfish. Cruelty of men and women to the wretched, forsaken Hindu widow?...

'But if men were more compassionate, and society recognised their (women's) rights to the commonest necessaries of life, perhaps they would be less hard on themselves, and many a heart-stricken son would be spared, the misery I felt when I found my mother's beloved life sink under the load of the world's neglect and indifference.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা-জ্যোতিঃ

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। পূর্বাকাশে তবে এ কিসের আলোক দেখা যায়? মাত্র অমানিশা অবসানে আকাশের কোলে শুকতারা দেখা দিয়েছে, ঊষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।

অনেক সময় মনে করি, আমাদের উন্নতির কোনো আশা ভরসা নাই। যে দেশে পুরুষজাতি অবলার প্রতি শত্রুতাচরণই গৌরবের বিষয় মনে করে, সে দেশে আর আশা কী? কিন্তু কালের বিচিত্র গতি সব দিন সমান যায় না। এখন দেখি, দয়াময় আমাদের প্রতি সদয় কটাক্ষে চাহিয়াছেন।

বাঙালি হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্নত ও সুশিক্ষিত; পক্ষান্তরে, বাঙালি মুসলমান পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের তুলনায় অনেক হীন ও অধঃপতিত। অতএব কেবল বঙ্গের কতিপয় নারীবিদ্বেষীর ক্ষুদ্রাশয়তা দর্শনে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে।

সমাজের অর্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব; এ রহস্য বোম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ বেশ বুঝিয়াছেন। তাই এখন আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয় পাঠিকা বলিতে পারেন, 'আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হইলে আমাদের লাভ কী? আমরা আছি বঙ্গদেশে—আলীগড় তো বহুদূরে। আমাদের মুক্তির উপায় কি?'

মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষাবিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌঁছিতে বাধা দিতে পারিবে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সুশিক্ষালাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথে যতই কণ্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাসী (বিশ্বাসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেই। এবার এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল—তাহারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াছে, কত ব্যক্তি জনতার পদচাপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। তবু কি তীর্থযাত্রী পুনরায় তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে। কখনই না। তিথি বিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অসূর্যম্পশ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু কুলবালারা শিবিকাসহ ডুবিয়া স্নান করেন। সুতরাং দেখিতেছেন, বিশ্বাসিনীর শুভকার্যে দুর্ভেদ্য পরদাও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

জ্ঞান ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মুসলিম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল; কিসের বলে? জ্ঞান-বলে। আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য এবং সর্ববিষয়ে উন্নত; কেন? জ্ঞানবিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ—জ্ঞান।

কোনো বস্তুই ইচ্ছামাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা জ্ঞানপিপাসা অনুভব করা মাত্রই কেহ সুধাভাণ্ড হস্তে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইবে না। তৃষ্ণার্তের নিকট কূপ আইসে না—পিপাসীকে কূপের নিকট যাইতে হয়। সমাজের একটি সুনীতি একতা—এই একতা স্থাপনের জন্য আলীগড় ও বাঙ্গালাকে একাকার করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙালি মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংল্যান্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা রমণীদের 'ব্লুস্টকিং' বলিয়া বিদ্রূপ করেন; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও 'নভেলপাণি' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক চমৎকার কথা—আমরা পুরুষের রচনায় ইংল্যান্ডের সমাজের যত চিত্র না দেখিতে পাই, তাহা মহিলাদের রচনায় দেখিয়া থাকি। মিসেস হেনরি উড এবং মেরি করেলির উপন্যাসে অনেক সামাজিক ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি মাননীয়া মেরি করেলি তাঁহার কোনো উপাখ্যানের নায়িকা (ডেলিশিয়া)র প্রিয় কুকুরটিকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন!![১] যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরেজ-ললনা মাথা তুলিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মুসলিম ললনার পালা।

দুই বৎসর পূর্বে আমরা বলিয়াছিলাম, 'আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?'[২] এখন দেখি সত্যই আলীগড়ে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগারের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? অবশ্য জেনানা কলেজ এখনও সুদূর ভবিষ্যতের পরপারে। সম্প্রতি কেবল নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে; এই স্কুলটিকে সেই ভাবী জেনানা কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, তবে এখনই এত আশায় উৎফুল্ল হওয়া কেন? আশার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বীজ, তৎপরে অঙ্কুর, তারপর বৃক্ষ—সর্বশেষে ফল। আজি যে দীর্ঘ তাল-তরুটি উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া গগন চুম্বন করিতেছে, তাহার বীজ কবে নিহিত হইয়াছে? অন্তত চল্লিশ বৎসর পূর্বে। অতএব আলীগড়ের 'স্কুলবীজ' দেখিয়া আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য আমরা ইহার ফল ভোগ করিতে পাইব না–ফল ভোগ করিবে আমাদের তৃতীয় পুরুষ। যে তালের গাছ বপন করে, সে নিজে কদাচিত ফল খাইতে পায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কেবল আশায় আশ্বস্ত হইলেই কি আমাদের কাজ শেষ হইবে? অবশ্য না। ঐ স্কুলবীজটির প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য আছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও স্কুলের কার্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা চাঁদা দেন, ভালো কথা—যদি না দেন, তবে মহিলাদের চাঁদা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর্তব্য আছে, যিনি তাহা পালন করিতে ইচ্ছুক তিনি সেক্রেটারি সাহেবকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহই প্রধান কার্য। আলীগড়ের মহানুভব লোকেরা যে মহৎ কার্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দুই-চারিজনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এ সময় যদি সকলে উহাতে যোগদান না করেন, তবে ও স্কুলবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না—যদি আশাতরু এবার অর্থাভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, তবে আবার বীজ সংগৃহীত হওয়া সুদূরপরাহত। যে মাতৃজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রয়োজন, তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে কেন? আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই।

লাহোর, বোম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা ইংরেজি হইলে ভালো হয়; নতুবা কোনো বিখ্যাত প্রাদেশিক (যেমন হিন্দি) ভাষার চর্চা রাখিলে চলে। লাহোরের লোকে আমাদের বঙ্গভাষা শিখিবে, এরূপ আশা দুরাশা, সুতরাং বাঙালিকেই উর্দু শিখিতে হইবে।

দেশের, বিশেষত নিজের সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে নারী কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যে শিক্ষা মানবের পক্ষে অশেষ উপকারী, সেই শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত রমণী সামান্য অর্থরূপ স্বার্থত্যাগ করিবে না কি? জ্ঞান বিনিময় হযরত 'হাভা' স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন—তাঁহারই দুহিতা হইয়া আমরা কি সামান্য অর্থত্যাগে বিমুখ হইব?

কেহ হয়ত বলিবেন, 'একবার আদি জননী জ্ঞানফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে, আবার বঙ্গজননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হইলে আমাদিগকে গৃহচ্যুত হইতে হইবে না তো?' উত্তরে বলা যাইতে পারে, গৃহচ্যুত হওয়ার তো আশঙ্কা নাই—আশঙ্কা আছে কর্মহীন, আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন জড়তারূপ স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার।

আদি মাতা নিষ্কর্মা অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করিলে মানবজাতি ধর্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পাইত কোথায়? আমাদের মনে হয়, স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্ত্যবাসী দরবেশ মনসুর অধিক সুখী ছিলেন। মহর্ষি মনসুর ঈশ্বরপ্রেমের যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, স্বর্গে থাকাকালীন হযরত আদম কি সে সুধার আস্বাদ জানিতেন?

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোনো ভালো লোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যই সে পাগল হইয়া যায়। নারীজাতি কি বাস্তবিক হীনবুদ্ধি? না, বরং রমণী প্রতিভার আদি অধীশ্বরী। ইহা সর্ববাদী সম্মত যে, নারীই প্রথমে জ্ঞানফল চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে পুরুষ তাঁহার (উচ্ছিষ্ট!) প্রদত্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ 'ডানাকাটা' অবস্থায়ও তাহা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, যে ক্ষেত্রে মুসলমান বালক শতকরা ২০/২৫ জন কৃতকার্য হয়, সে স্থলে বালিকা (বোম্বাইয়ে) শতকরা ৭৫ জন কৃতকার্য হইয়াছে। যে স্বদেশী ব্রত পালনে বাঙালি পুরুষেরা প্রকৃত কার্যের তুলনায় ফাঁকা হইচই বেশি করেন, সেই ব্রত 'নভেলপাণি'রা দৃঢ়তার সহিত নীরবে প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং অবলাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

সুদীর্ঘ নৈরাশ্য-যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি, ভগিনী! ঐ চাহিয়া দেখুন—ঐ দূরে-আশা-জ্যোতিঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান কন্যার পুস্তক-সমালোচনা

(নূতন পুস্তক ধর্মসাধননীতি)

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কি করিব? 'সমালোচনা' বলিতে যেন একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব থাকে; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্যগণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

'ধর্মসাধননীতি'তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—'ধর্মসাধনা, 'অন্ধাত্মানুরাগ', 'অনুতাপ', চিত্তসংযমের উপায়', 'বাহ্যিক উপাসনা', 'আন্তরিক উপাসনা', 'জীবন্ত উপাসনা', 'নামসাধনা, 'ধর্মসঙ্গীত', 'যোগ ও প্রেমাবেশ', 'রোজা' (সংযমব্রত), 'নির্ভয়স্থাপন', 'সাংসারিক সুখের অসারতা', 'কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব', 'কামনা ও ক্রিয়া' 'সাধুচরিত্র' এবং 'পরিশিষ্ট'—অনুতাপতত্ত্ব', ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান, তাহা সূচিপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, 'সেই মহাগ্রন্থে (অর্থাৎ কিমিয়ায়ে সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।' আমি বলি, আমাদের ধর্মসংক্রান্ত সত্যসমূহ 'রত্ন'-ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ, আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছেন!—যেন একটি রত্নও ভাষান্তরিত হইতে না পারে! যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ লোকে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে!

যখন কোনো উদারচেতা মুসলিম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোনো এক অংশ উর্দু বা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন সেই রত্নভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে তাহার শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি এ কী করিয়াছেন! রত্নভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছেন।—মোল্লাদের অতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্দুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন! সহজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরল বঙ্গ ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন! 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে', এই নীতিবাক্যের মর্ম আপনি বুঝিয়াছেন, আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম ব্যক্তিকেও থালাভরা মানিক দান করিলেও মহামূল্য 'কিমিয়ায় সাদতের' ভাণ্ডার শূন্য হইবে না! তাই অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি।

'মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্তিত ইসলামধর্ম' গ্রন্থে 'আত্মমন্তব্যে' লিখিত হইয়াছে, একজন (মুসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।' তাই তো আপনার হাতে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে দেখিয়া যে মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মুসলমানও (বিখ্যাত 'বানাতন নাশ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উর্দুভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

'মুসলমান জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু' কথাটা ভালোমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মুসলমান, অথচ ধর্মবিশ্বাসে 'ব্রাহ্ম' এরূপ লোকও আছে না কি?

'ধর্মসাধননীতি'র 'জীবন্ত উপাসনা' পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হযরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায়ে শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত; এমনকি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। কার্যত তাহাই করা হইয়াছিল। হযরত আলী উপাসনায় এমনই মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর যে ইহার কোন অংশের উল্লেখ করিব, কোন অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচকের ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রিদের ন্যায় আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিবিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সেদিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছি—'মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত 'ধর্মসাধননীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম প্রচারক?

'ধর্মসঙ্গীত' সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাদৃত হইয়াছে।' এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে 'সঙ্গীতবিরোধী' দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে 'মুসলমান ধর্মটা বড় 'খটখটে'—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।' এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মুসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (disturbed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য মুসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নামাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্র মনে নামাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নামাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ি গায়কের গর্দভ-গর্জনের কথা ভিন্ন। তাহাতে তো জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

'কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে' শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধস্বরূপ।

'ধর্মসাধননীতি' হিন্দু মুসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দজ্জাল

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মুসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন 'কেয়ামত' 'দজ্জাল' বা 'পোলসেরাত' সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমার তো মনে হয়, 'মহিলা' যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মুসলমানের ন্যায় খ্রিস্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হযরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্বে এক বিধর্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে; তাহার নাম 'দজ্জাল'। দজ্জাল মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যিশুখ্রিস্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বের দাবি করিবে![১] দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দভ থাকিবে।[২] এই কয়টা জিনিস লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে; এবং তাহার সহিত অর্ধখানি রুটি (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদয় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যিশুখ্রিস্টত্বের দাবি না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি না'ই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে। হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃতপক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনী! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল তো পরে আসিবে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানত দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশতা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা। এমনকি তাঁহাকে ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবে বশবর্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্মের বা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা! ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম 'পোলসেরাত'। 'পোলসেরাত' সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ[৩], তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোলসেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—

অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা তো অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বারবার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে।

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; সে ফেল (fail) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কি? কেহ আরম্ভে, কেহ এক-তৃতীয়াংশ পথে (পোলসেরাতের প্রথম মোড়ে), কেহ অর্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্যন্ত), অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই ফেল হয়। কচিৎ দুই-দশ জন ভাগ্যবান লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন

'মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এ ছার সংসারে
কারুই পুরে না মনোবাসনা।'

এই ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে কয়জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহারপ্রাপ্ত হয়? কয়জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয়জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয়জন জীবনের এক-একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয়জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—

'জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!'

* * *

তাই তো, একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোলসেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, যিনিই কোনো বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১. যিশুখ্রিস্টত্বের দাবি করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রিস্টান?) তাহার সঙ্গে ২. অর্ধেক রুটি থাকিবে[৪], যে রুটি থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩. জলের কর্তা হইবে[৫]; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে!) ৪. পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫. এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথায় অবশ্যই কোনো গূঢ় অর্থ আছে। মোটামুটি তো এই দেখা যায়; —১. খ্রিস্টান দজ্জাল ২. অন্ন ৩. জল ও ৪. অতুল ঐশ্বর্যে অধীশ্বর এবং সে ৫. বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ!!

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্মগুরু (হযরত মুহম্মদ), যিনি এক কথা জানিতেন! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন। ধন্য তিনি! অমর তিনি!!

অবশ্য আমার সাধ্য কী যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি। আমি কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাঙ্গালা 'কেয়ামত-নামা' পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম, আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোনো কোনো অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন, কেহ হয়ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্বে তিনি যেন একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্যন্ত।

টীকা

১. 'ঈসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল
আমার কলেমা সবে করহ কবুল।'
অন্যত্র 'হর ঠাঁই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা!
'কেয়ামত নামা'

২. 'বড় এক আতশখানা, সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার॥
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে॥'

৩. 'চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার॥
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা!
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা॥
'পোনের হাজার সাল সেই রাহা,'
অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে!

৪. 'সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটি।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটি দিবে বাঁটি॥

৫. 'আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি॥
অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কাটা মুণ্ড কথা কয়’

‘বঙ্গলক্ষ্মী’র পাঠিকা ভগিনীগণ জানেন, ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে মুসলিম ললনা কিরূপ পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নির্জীব। এখন তাঁহারা এ-কথা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুসলিম-নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সেই কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিতেছি।

প্রায় দুই মাস হইতে সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছিল যে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা-সমিতির বিরাট আয়োজন হইতেছে। মুসলিম পরদানশীন মহিলাদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ পরদার ব্যবস্থা থাকিবে। ২৬ ডিসেম্বর ‘অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের’ অধিবেশন হইবে এবং ২৮ তারিখে জুবিলী অধিবেশন হইবে। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম মহিলাগণ আলীগড়ে সমবেত হইয়াছিলেন।

২৬ ডিসেম্বর বেলা ৯টার সময় যখন সমাগত মহিলাবৃন্দ তত্রত্য বালিকা কলেজের সেক্রেটারি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের পত্নীকে সভামণ্ডপে যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন, ‘হাঁ সব প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন না, মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারি প্রফেসর শিরওয়ানী কি গোলযোগ করিতেছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সভামণ্ডপে যাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দিবেন না।’ অতঃপর মিসেস্ আবদুল্লাহ সকলকে শিরওয়ানীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি দেখাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, ‘এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারিরূপে আমার হুকুম এই যে, মেয়েরা মণ্ডপে আসিতে পারিবেন না। তাঁহারা হুকুম অমান্য করিয়া যদি আসেন, তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায়ী হইব না।’

মহিলাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্বে বোরকায় (বিশেষ প্রকার অবগুণ্ঠনে) আবৃত হইয়া যাইবেন। পরে মিসেস আবদুল্লাহর সহায়তায় বালিকা কলেজের মোটরবাসে আমরা প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক রওনা হইলাম। আমরা পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন্ লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিনা দ্বিধায় সকলে মণ্ডপে গিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিলাম। তথায় বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আতিয়া বেগম সাহেবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন। আমরা দেখিলাম, চিক এবং কাপড় ঘিরিয়া যে পরদার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা সব খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিক ও কাপড়ের পরদাগুলি পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রফেসার শিরওয়ানীর দোর্দণ্ড প্রতাপের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছিল।

মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলে আতিয়া বেগম সাহেবা ভলান্টিয়ারদের দ্বারা চিকগুলি বাঁধাইয়া দিলেন। কর্তৃগণ আতিয়া বেগমকে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। আর আতিয়া বেগম রাগে কাঁপিতেছিলেন।

যথাসময়ে আতিয়া বেগম একটা চেয়ারে দাঁড়াইয়া দুই চিকের ফাঁক হইতে মুখ বাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; তখন সমস্ত শ্রোতমণ্ডলী ফিরিয়া বসিলেন। অনেকে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া চিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রফেসার শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পরে আতিয়া বেগম প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

২৮ ডিসেম্বর জুবিলী অধিবেশন ছিল; সে-দিন মহিলাগণ বিনা বাধায় মণ্ডপে গিয়াছিলেন। যথাবিধি চিক পরদার ব্যবস্থা ছিল। সেদিন আতিয়া বেগম আমাদের নিকট না বসিয়া প্লাটফরমের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের বক্তৃতার টিটকারি দিতেছিলেন। একবার তিনি বলিলেন, 'যে ভদ্রলোক মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন, তিনি চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।' চিকের অন্তরাল হইতে জনৈক মহিলা দুইগাছি চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রকারে পরদানশীন নির্জীব মুসলিম মহিলাগণ রণাঙ্গন হইতে প্রফেসার শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং দেখিলেন, ভগিনী! এখন কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব 'বঙ্গলক্ষ্মী'র জয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নতির পথে

আজকাল সবাই উন্নতি করেছে—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি উন্নতি আর উন্নতি। কেবল আমি অথর্ব বুড়ো অচল হয়ে বসে আছি। তাই ভাবি আর বেশি করে ভাত খাই, আর ভাবি যে কী করে আমার উন্নতি হবে।

চশমাটা ভালো করে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে নজর পড়ল—'ক্রুশেন সল্ট্' খেলে সত্তর বছরের বুড়ো কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। ব্যাস্—এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই! কী বলব—এক হপ্তা 'ক্রুশেন সল্ট্' খেতে না খেতে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো! তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব হয়ে থাকা নয়—যাই তরুণদের সাথে মিশতে।

লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি মেলা তরুণ এক জায়গায় জড়ো হয়ে গান করছে—

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে—'

বাঃ! আমার বড় ভালো লাগল—বিশেষত আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কি না-অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ওষুধ খেয়ে যে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গেছি—তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না!

তরুণকে বললুম, 'ভাই, আমি দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেলে (শিং কাটিয়ে) তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।'

সে বলল, 'বেশ এস।'

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বলল, 'এখন আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'ভায়া। পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ বলল, 'কি জান দাদা। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে—সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না।'

যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল—ইরানি, তুরানি, তুর্কী, আল্‌বানিয়ান, ইরাকি, কাবুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,—বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল—

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে—'

কখনও ঐ গানটাই উলট-পালট হয়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—

'পাগড়ি নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—' ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে—আর—

'রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!'

শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ! তরুণীরাও অর্ধ-দিগম্বরী॥

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি না-ও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম—'ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ তা উলঙ্গ হয়ে কেন?'

সে বললে, 'আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি—আমাদের কি কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস—সব বিসর্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি।'

চুপ করে থাকা আমার ধাতে নেই—আমি মরণকালে যমের সঙ্গেও গল্প করব। তুরানী তরুণকে বললুম, 'তোমরা তো ভাই নিজের দেশেই আছ, তোমরা স্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?'

সে বললে, 'এ কোথাকার ওল্ড ফুল! পৃথিবী যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে—অর্থাৎ যেখান থেকে যাত্রা করেছে, ঘুরে আবার সেইখানে পৌঁছবে—এ তাও জানে না!'

পরে আমি কাবুলি তরুণকে বললুম, 'ভাই! তোমরা তো চিরস্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?'

সে আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, তাদের দেশ আবর্জনায় ভরে গেছে, এখন তারা দেশের পঙ্কোদ্ধার করছে। পাগড়ি ও প্রকাণ্ড কাবুলি পায়জামা আর চুল, দাড়ি—এসব নিয়ে কাজ করতে গেলে, কাদার ছিটায় (চুল, দাড়ি, পাগড়ি, পায়জামা) সব বিতিকিচ্ছি হয়ে যাবে যে! তাই কেবল হ্যাট ছাড়া দেশে আর কোনো আবরণই থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে! এখন দেখি কি, সেই তরুণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে—যখন মুনি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হতো না বলে টেনেটুনে পরতে হতো—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি মিনতি করে বললুম—'ভায়া তরুণ! দয়া করে তোমার প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেমে পড়ি।'

ইরানি তরুণ হাসতে হাসতে বললেন, 'দাদা! এখনই কি হয়েছে—কোল ভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও গায়ে রং মাখার যুগে এসে পৌঁছায়নি।'

আমি কাকুতি করে বললুম, 'দোহাই ভায়া তরুণ! আর না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা এখন আদি-মাতা হযরত হাভার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপি করেছিলেন। আর আদি-মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় তো চুলও নেই—এরা কী দিয়ে গা ঢাকবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭০০ স্কুলের দেশে

এই বঙ্গদেশে এমন একটি জেলা আছে, যেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সাতশত বিদ্যালয় আছে। সেই জেলার এক গ্রামের জমিদারের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার নিজ গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। বিদ্যালয় স্থাপন করা বরং সহজ, কিন্তু তাহা পরিচালনা করা সহজ নহে; বিশেষতঃ পরদানশীন মেয়েদের স্কুল।

জমিদার সাহেব শেষে স্থির করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন একটি সুশিক্ষিতা পাত্রীর সহিত। সেই বধূ তাঁহার বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবে। তদনুসারে যথাসময়ে অতি সমারোহের সহিত জমিদার পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। বধূর নাম,—ধরুন, সালেহা খাতুন। সালেহা শ্বশুরবাড়ি গিয়া দেখে, তাহার সহিত কেহ কথা বলে না; শাশুড়ি, ননদ সবাই যেন তটস্থ! পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে আসিয়া ফিসফিস করিয়া পরস্পরে কথা বলে। সকলেই বউ দেখিতে আসে—বউ যেন জাদুঘরের কোনো আজব চিজ—তাই সমস্ত দিন ছেলেমেয়েসহ স্ত্রীলোকেরা আসে বউ দেখিতে। কিন্তু কেহই বধূর সহিত কথা বলে না। কারণ সালেহার দোষ ত্রিবিধ। ১ম, সে কলিকাতার মেয়ে; ২য়, সে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের ম্যায়া, ৩য়, সে সাখাওয়াত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের মিডল পরীক্ষায় পাস করা মাইয়া! তাহা ছাড়া সে উক্ত স্কুলে থাকাকালীন কলিকাতা গার্লস স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্নমেন্ট হইতে ২৮.০০ জলপানি পাইয়াছে; ফার্স্ট এড এবং হোম নার্সিং (অর্থাৎ প্রাথমিক প্রতিকার ও গৃহ চিকিৎসা) পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছে, সুচারু সূচিকর্মের জন্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে পদকপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এসব কথা গ্রামময় রাষ্ট্র ছিল। তাই সে শ্বশুরবাড়িতে উপাধি পাইল, 'পড়া বউ'। স্বয়ং কর্তাও গৃহিণীকে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি যেন হঠাৎ যেমন তেমন কোনো কথা বলিয়া 'পড়া বউ'-এর নিকট হাস্যাস্পদ না হন। তাই তিনিও পুত্রবধূর সহিত ওজন করিয়া কথা কহেন। সুতরাং বেচারি সালেহা সমস্ত দিন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে নিতান্ত একাকিনী বোধ করিত।

ক্রমে অবস্থাটা সালেহার বর বুঝিতে পারিলেন। একদিন তিনি নিজে ছোট ভগিনীকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন তাহার ভাবিজানের সহিত কথাবার্তা বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, তাহার কাছে কেন দুদণ্ড বসে না। তাহার উত্তরে সে কাঁদকাঁদভাবে বলিল যে, ভাবিজানের নিকট সমস্ত দিন হাটের মতো লোক থাকে, সে কেমন করিয়া তাহাদের সম্মুখে যাইবে, (কারণ সে যে কুমারী বালিকা) আর তাহাকে মুরুবিরা বারণ করিয়াছেন 'পড়া ভাবি'র সহিত কথা বলিতে; কারণ সে তো লেখাপড়া জানে না!

একবার এক মুন্সেফের বউ দুই-চারি কথা বলিয়াই হঠাৎ চুপ করিলেন এবং সভয়ে সকাতরে চুপি চুপি বলিলেন, 'মাফ করিবেন, আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। আমার স্বামী আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কারণ আপনি পড়া মানুষ,—আর আমরা কথা কইতে জানি না!'

এদিকে ছয়-সাত মাস পরে সালেহাকে তাহার শ্বশুর তাড়া দিতে লাগিলেন যে, পাড়ার ভালো মানুষের মেয়েদের লইয়া স্কুল আরম্ভ করা হউক। কিন্তু তাহারা পড়ালেখার নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিল,—বাপরে! 'পড়া বউ' বলে কী? কোরান কিতাব হইল পাক জিনিস,—আমরা মাগী না ছাগী, কী কাজে লাগি? মাগীর জাত নাপাক, তাহারা কোরান শরীফ ছুঁইবে? সালেহা শ্বশুরকে এ সমস্ত বলায় তিনি বলিলেন, 'তবে আপাতত অর্ধ ভদ্রদের ছাড়িয়া নিম্নশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলকে নামাজ শিক্ষা দাও। নামাজে কেহ আপত্তি করিবে না।'

নামাজ শিক্ষা আরম্ভ হইল। ইহাতে সালেহার শাশুড়িও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিন কাল গিয়াছে, এখন আল্লাহতায়ালার এবাদত করা দরকার। নতুবা—

'বেনামাজী, বে-দ্বীন ও বে-ঈমানে
বে-তাইন সাজা হবে হাশর-ময়দানে'

তাহারা নামাজ শিখিতে সম্মত হইল। সালেহা সকলকে একত্রে দাঁড় করাইয়া মুখে মুখে বলিয়া নামাজ পড়াইত। পরে প্রত্যেককে নামাজের জন্য ব্যবহৃত সূরাসমূহ মুখস্থ করিতে দিত।

একদিন মাগরিবের সময় সকলকে নামাজের নিয়ত ও সূরা বলিয়া দিয়া সালেহা নিজে নামাজ পড়িতে গেল। তাহার নামাজ শেষ হওয়ামাত্র তাহার ছোট ননদ দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, 'ও ভাবিজান! দেখুন আসিয়া,—কালার মা তক্তপোষে শুইয়া ঘরের থামে দুই পা তুলিয়া দিয়া পড়িতেছে,—আলহামদো আলে, দুই ঠ্যাং উঠল চালে।' সালেহা তাহার সহিত গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলের পড়া শুনিতে লাগিল। সকলে আলাদা আলাদা সুর করিয়া পড়িতেছে—

কেহ বলিতেছে—'ইন্নিয়া জাহাদো—'

অপর একজন—'ইসুফ! ইসুফ! ফিছা ধরে নাচ—'

অপর একজন—'খইচালা দিয়া নারাণ জাতা—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর একজন—'আলামতারার কয়টা ফালা—'

অপর একজন—'বেজার হইতেন মুন্সিজী—'

সাহেলার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল,—রাগে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে কাঁদিয়া গিয়া শাশুড়িকে সমস্ত বলিল।

তিনি আসিয়া স্বকর্ণে পড়া শুনিয়া সকলকে ধমকাইয়া বলিলেন, 'ওরে সর্বনাশী, কালীচুন্নি—ও! তোদের গালে কালী! দূর হ! তোরা কিসের নামাজ শিখবি?'

জনৈকা বৃদ্ধা (সেই কালার মা) সাহস করিয়া বলিল, 'বিবী সা'ব, দূর দূর করিয়া শেয়াল কুকুরের মতো তাড়ান কেন? নামাজ না পড়লে তো আমাদের বয়েই যাবে। কালার বাপ হজ্ব করে আইলছে; আমরা এত বড় পীরের মুরিদ; আমরা মনজিলের দিন (মহররমের ১০ তারিখে) বিবীর নামে রোজা রাখি; খোদার নাতিদের নামে শরবত খাওয়াই—আমাদের মতো ছওয়াবের কাজ আর কেউ করুক দেখি!' সালেহার শাশুড়ি 'নাউজুবিল্লাহ! তোবা তোবা!' বলিয়া কানে হাত দিলেন। নামাজ শিক্ষার্থিনীরা রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার সপ্তাহকালে পরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সালেহার নিকট চাঁদা চাহিতে আসিল। কিসের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, এ-কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা গিয়াছে, তাই শীতলা দেবীর পূজা করিতে হইবে। সালেহা মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এ-সব শেরেক বেদাত করা ভালো নয়। তোমরা ছেলে বুড়া—সকলে বসন্তের টিকা লও। তাহারা বলিল, 'তুমি 'পড়া বউ' কলিকাতার ম্যায়া, দুই-চারিখানা ক্যাতাব পড়িয়াছ, তাই মনে কর তুমি খুব জান,—কিন্তু মা। তুমি ছাই কিছুই জান না! শীতলামাতাকে স্বয়ং খোদাও ভয় করেন! এমনকি শীতলাদেবী খোদার গায়েও পাঁচ গোটা বসন্ত দিয়াছেন।' সালেহা কানে আঙুল দিয়া বলিল—'রক্ষা কর আর শুনিতে চাই না।'

অপর এক বর্ষীয়সী ধীরভাবে সালেহাকে বলিল, 'পড়া বউ' যদি রাগ না কর তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। লোকে যে বলে, খোদা ও রাসূল। হ্যাঁ মা! খোদা ও রাসূল একই লোক না? সালেহা তাহার কথার যথার্থ উত্তর দিয়া তাহাকে কলেমা পড়াইল এবং ভালোরূপে কলেমার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিল, 'এখন হইতে তওবা কর আর কখনও বিবীর নামে রোজা রাখিও না। হযরত ইমাম হাসান ও হোসেনকে খোদার নাতি বলিও না—' ইত্যাদি। তদুত্তরে আর একজন বলিল, 'আমাদের পয়গম্বর সাব খোদার দোস্তজি; দোস্তের নাতি কী খোদার নাতি হয় না?'

কালার মা বুড়ি বলিল, 'দেখ পড়া-বউ' এই জন্যই এতদিন তোমার লগে আমরা কথা কই নাই। কালার বাপ আগেই আমাকে বলেছিল, পড়া বউ ইংরাজি পড়েছে, তার লগে কথা কইলে ঈমান নষ্ট হবে। বিবী ফাতেমা তানার বাপের দোস্তের কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে 'তাউই সা'ব। বছরের সবদিন আপনার থাকুক, কেবল মহররম মাসের দশটা দিন আমাকে দেন।' আমাদের পীর সাব বলিয়াছেন যে, কোরান শরীফের মানে পড়িলে বা মানে বুঝিতে চাইলে বে-আদবী হয়, আর ঈমান যায়। আর তুমি পড়া বউ, এসব কলেমার মানে বলিয়া দিয়া আমাদের সকলের ঈমানের মাথা খাইলে। তুমি দুই পাতা ইংরাজি পড়িয়াছ, কিন্তু দ্বীন-এসলামের কথা কাঁচকলা কিছুই শিখ নাই। আমি তোমাকে বলি, আজ থেকে তওবা কর, পীর সা'বের কাছে মুরিদ হও,—আর কখনও ইংরাজি পড়িও না,—কোরান শরীফের তরজমা পড়িও না!'

সালেহা দেখিল, তাহার শ্বশুরের মধ্য-ইংরাজি বালিকা-স্কুলের আশা একেবারে আকাশ-কুসুম। সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজে পাড়ায় 'ধর্মপরায়ণা' স্ত্রীলোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় কি না, এখন সেইরূপ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। সে পাড়ার অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালিকাদের দেখাইয়া দেখাইয়া নিজে সেলাই করিতে বসিত। স্বহস্তে ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদি কাটিয়া সেলাই করিত। তাহারা স্থিরভাবে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিত, আর পরস্পরে ফিসফিস করিয়া কী সব বলাবলি করিত। একবার একজন সাহস করিয়া বলিল,—

'আচ্ছা পড়া বউ, তুমি থান কা থান আনাম কাপড় কাটিয়া টুকরা টুকরা কর, আবার সেই টুকরাগুলি জোড়া দাও,—ইহাতে লাভটা কি? আনাম কাপড় কাটই-বা কেন, আবার জোড়াই বা দাও কেন?'

সালেহা তাহাদের বলিল, 'তোমরা আগলা গায়ে থাক, ইহা লজ্জার কথা; শাড়ির সঙ্গে অন্তত শেমিজ পরা দরকার। তোমরা কাপড় আনিলে আমি ছাঁটকাট ও সেলাই করা শিখাইয়া দিব।'

দুই-চারি দিন পরে কয়েকজন ভালো মানুষের বউ-ঝি কয়েকটা ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক ইত্যাদি আনিয়া সালেহাকে দেখাইয়া বলিল—'বাপজি বলে, এসব তৈয়ারি জামা পোশাক তো হাটেই কিনতে পাওয়া যায়, তবে এত মেহনত করিয়া সেলাই করার দরকার কি? পড়া বউয়ে জানে না যে এসব পোশাক হাটে পাওয়া যায়।' সালেহা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল, ইহাদিগকে পথে আনিবার কোনোই উপায় নাই। আর মধ্য ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়,—তাহা আপাতত স্বপ্নই রহিয়া গেল।

একদিন সালেহার শাশুড়ি, একটা সুজনী সেলাই করিতেছিলেন। তিনি কার্যান্তরে উঠিয়া গেলে সালেহা সেই কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, নিজের সময় যাপন করা এবং শাশুড়ির কাজে সাহায্য করা,—বুড়ো মানুষ কষ্ট করিয়া সুচে সুতো পরান, তাই সে সুজনী সেলাই করিতে বসিল। কিয়ৎকাল পরে সে মাথা তুলিয়া দেখে,—পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া তাহার কাঁথা সেলাই দেখিয়া শতমুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশংসা করিতেছে। একে অপরকে বলিতেছে,—'দ্যাখ্ বু! পড়া বউ-এর গুণ আছে—কাঁথা সেলাই করিতে জানে।'

অপরে বলে, 'তাই তো এ গুণের কথা আমরা জানতাম না; আমরা বলি, কলিকাতার জজ ম্যাজিস্টারের ম্যায়া—সে আবার কী জানব—আরে আয়, আয়! দ্যাখ আইস্যা! পড়া বউ কাঁথা সেলাই করতে জানে!' সকলের দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া সালেহার শাশুড়ি কোনো বিপদের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তথায় আসিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি আনন্দে ও গর্বে স্ফীত হইয়া বলিলেন,—'জানব না? সেলাই করে মেডাল পাইছে? তোমরা সবাই বলতে, আমার বউ কাঁচকলা কিছুই জানে না,—এখন দেখলে তো? কী সুন্দর চিকন সেলাই! আমার চাইতেও ভালো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলিস্তাঁ

কোরান-শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেছেন

'ফাঁদ খলিফি ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি'

অর্থাৎ—'অতএব আমার বাগানের মধ্যে আইস এবং আমার বাগানে প্রবেশ কর।'

মানবের চরম লক্ষ্য সেই গুলিস্তাঁ—যাহা আল্লাহ পুণ্যাত্মাদিগকে দান করিবেন—যেই গুলিস্তাঁয় প্রবেশ করিতে আল্লাহ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আমরা তুচ্ছ মানব সামান্য লতা-পাতা লইয়া গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া থাকি; কারণ ফুলের মতো সুন্দর, ফুলের মতো নির্মল এবং ফুলের মতো পবিত্র জিনিস জগতে আর কিছু নাই। কত কবি কত ছন্দে যে ফুলের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাস্তবিকই ফুলের সুষমা, ফুলের সৌরভ এবং সৌন্দর্য মানুষকে যত আনন্দ দেয়, আত্মহারা করে, তেমন আর কিছুতে পারে না। এ জ্বালা-যন্ত্রণাময় জগতে যদি কিছু জুড়াইবার জিনিস থাকে, তবে সে একমাত্র ফুলকেই বলা যায়।

সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! তিনি মাটি ও ধুলা হইতেই ফুল উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যতই পাপিষ্ঠ হই না কেন, অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করিলে আমাদের সমস্ত কলুষ ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে, আমাদের মন পবিত্র ফুলের মতো হইবে। পাপ, পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা ফুল হইতে পারিব। ফুল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনো বস্তু পৃথিবীতে আছে কি? ফুল অমূল্য ধন। আমেরিকার একটি গোলাপ ফুলের মূল্য সময় সময় ২৫০ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার লোক জানে ফুল কী জিনিস! আমাদের দেশে প্রকৃতির দয়ায় ফুলের অভাব নাই; তবু গোলাপের মতো সুন্দর ফুল বনে-জঙ্গলে হয় না।

ফুল না হলে আমাদের চলে না; জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শুভকর্মে ফুল ব্যবহৃত হয়। নববধূকে ফুলের অলঙ্কার পরাই; ফুল দ্বারা বিবাহের মজলিস সাজাই। ফুল প্রিয়জনকে উপহার দেই। ফুল দ্বারা আরও আরও কত কী হয় তাহা বর্ণনাতীত। জীবনের শেষ ক্রিয়া শবাধার ফুল দ্বারাই সজ্জিত হয়। অতএব আমরা ফুলের সৃষ্টিকর্তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকাকে এস্তেকবাল করিতেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতুক-কণা

এক

প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে হেপোপটেমাস জন্তুর বিষয় বুঝাইবার সময় বলিলেন,—'হিপোপটেমাস কেমন কুৎসিত জন্তু তাহা যদি ভালোমতো বুঝিতে চাও, তবে আমার মুখের দিকে তাকাও।'

দুই

এক আফিংচি ছেলে কোলে লইয়া মেলায় গিয়াছিল; অনেকক্ষণ নানা দৃশ্য দেখার পর তাহার মনে হইল ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বেচারা ছেলে খুঁজিয়া হয়রান। শেষে থানায় সংবাদ দিয়া বাড়ি ফিরিল। ঘরে প্রবেশের সময় কপাটের আঘাত লাগায় তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ছেলের গায়ে চড় মারিয়া বলিল—'কমবখৎ! আগে কাঁদিসনি কেন? তা হলে আমার এত হয়রান হয়ে থানায় খবর দিতে হতো না।'

তিন

হরিশবাবু চাকরের হাতে একটা চিঠি আর পাঁচটা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, সে যেন টিকিট কিনিয়া চিঠিতে আঁটিয়া চিঠিখানা ডাকে দেয়। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাসিমুখে পয়সা ফেরত দিয়া বলিল,—'নিন আপনার পয়সা। যেই দেখলুম ডাকবাবু মাথা নিচু করে লেখাপড়া করছেন, আমি অমনি চুপি চুপি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে ফেলেই, দিয়েছি দৌড়! দেখুন তো কি বুদ্ধি করে বিনি পয়সায় আপনার চিঠি ডাকে দিয়ে এলুম, তবু আপনি আমায় বোকা বলেন!'

চার

পাদ্রি সাহেব মিশন স্কুলের ছাত্রদিগকে পাঠ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভবিষ্যতে তোমরা কে কী হতে চাও?' জনৈক ছাত্র বলিল,—'আমি কৃষক হব।' পাদ্রি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—, 'বেশ ভালো কথা। তুমি মানবের ক্ষুধা নিবারণের উপায় করবে। লোকের পরম উপকার করবে।'

অপর একজন বলিল, 'আমি শিক্ষক হব।' পাদ্রি সাহেব পূর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'এ তো আরও ভালো; তুমি মানবের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করবে। শারীরিক খাদ্যের চেয়ে মানসিক খাদ্যের মূল্য বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় ছাত্র বলিল,—আমি পাদ্রি হব।' এবার পাদ্রি সাহেব আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি মানবের পরিত্রাণের কারণ হবে। শারীরিক ও মানসিক খাদ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক খাদ্য আরও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা বাপু! বল তো তুমি কেন পাঁদ্রি হতে চাও?'

ছাত্র বলিল, 'আমরা গরিব বলে মাংস খেতে পাই না। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি যেদিন যান, সে-দিনই আমার মা মুরগি রেঁধে আপনাকে খাওয়ান।'

পাঁচ

এক বাড়িতে বিবাহ হইতেছিল। যে মোল্লা বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তোতলা; আর বর ছিল বধির। মোল্লা সাহেব বহু কষ্টে বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'ব-ব-বল, বি-বি-বি-ই-ইঃ-ঈ সমিল্লাহ—' বর জিজ্ঞাসা করিল, 'অ্যাঁ?' মোল্লা ভারি বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, আমি এত কষ্ট করিয়া বিসমিল্লাহ বলিলাম ও হতভাগা তাহা শুনিতেই পাইল না।

ছয়

একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভূগোল পড়াইবার সময় দিক-নির্ণয় বুঝাইতেছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেখ, তোমার বাম হাত দক্ষিণ দিকে, ডান হাত উত্তরে, মুখ পশ্চিম দিকে, এখন বল তো তোমার পশ্চাতে কি আছে?' সে উত্তর দিল, 'স্কুলে আসবার সময় মা আমার ছেঁড়া প্যাৎলুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই আছে।'

সাত

দুইটি ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। তাহাদের একজন বরের মা এবং একজন কনের মা সাজিয়াছিল। বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার সময় মোল্লাজি বরের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বরের মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইল যে, বল উহার মায়ের এখনও বিবাহ হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

God Gives, Man Robs

There is saying, 'Man proposes, God disposes, 'but my bitter experience shows that God gives, Man Robs. That is, Allah has made no distinction in the general life of male and female—both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc. necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on.

Our great Prophet has said 'Talibul llm farizatu ala kulli Muslimeen-o-Muslimat', (i.e. it is the bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowlede). But our borthers will not give us our proper share in education. About sixty years ago, they were opposed to the study of English even for males; now they are reaping the harvest to their bitter experience. In India almost all the doors to wealth, health, and wisdom are shut against Muslims on the plea of inefficiency. Some papers conducted by Muslim may or may not admit this-but fact is fact-the inefficiency exists and stares us in the face! Let me also venture to say that it is so; for children born of well-educated mothers must necessarily be superior to Muslim children, who are born of illiterate and foolish mothers. The late Lady Shamsul Huda by way of conversation often used to say that the Muslim public abused her husband because he had given certain high posts to Hindus ignoring Muslim claims, but they failed to see their own fault that such and such Muslim gentlemen were really unfit for the posts.

It is an irony of fate that the Hindus, who are bound by their cartload of Shastras to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, i.e. within ten years of age, are, as a matter of fact, allowing the greatest liberty to their womenfolk and giving them high education. They are trying to get laws passed against child-marriage raising the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

age to sixteen years though their Pandits are loud in proclaiming the attempt as 'unworthy of a Hindu'; and they are devising means to popularize widow-marriage, heedless of their Pandits, who quote Shastras saying 'not only should a woman refrain from marrying a second time but she should reduce her body by living only on fruits, roots, flowers, etc. after her husband's death.'

On the other hand, while Islam allows every freedom to women (so much so that a woman cannot be given in marriage without her consent of free will, which indirectly prohibits child-marriage) we see people giving away their daughters in marriage at tender ages or giving them in marriage without their consent. Many a time a bride bitterly bewails her fate on being compelled to marry a bridegroom whom she knows to be a drunkard or an old man of sixty, but the marriage celebration proceeds despite her silent protest. And so-called respectable families in our socity take pride in preventing widow-marriage, no matter whether the widow be a girl thirteen or a child of seven years of age!

The worst crime which our brothers commit against us is to deprive us of education. There is always some grandfather or elderly uncle who stands in the way of any poor girl who might wish to be educated. From experience we find that mothers are generally willing to educate their girls, but hey are quite helpless when their husbands and other male relations will not hear of girls attending school. May we challenge such grandfathers, fathers or uncles to show the authority on which they prevent their girls from acquiring education? Can they quote from the holy Quran or Hadis any injunction prohibiting women from obtaining knowledge?

We know there are mussalmans of advanced ideas who are anxious to give their daughters a good education, but for want of a suiltable High School for Muslim girls they cannot have their wishes fulfilled, and so they groan under the wretched social system. Why cannot the public of Calcutta support one ideal school for Muslim girls? Such a High English School with boarding accommodation and hostel, which can supply the demands of all the different classes of people, high and low, is very badly needed in Calcutta. On our part we are willing to convert this school (we mean the Sakhawat Memorial Girls School) to that ideal one, provided we get public support and money enough to meet the cost of up keep.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL

From the most ancient times there has existed in India a system of education which though distinct in its characteristics and ideals from the modern western system has produced great men and earnest seekers after truth. This ancient Indian Education developed in the early period of history the science of grammer and mathematics. It has enabled India to make the mark in the sphere of high philosophy and metaphysics. Conditions of life have changed considerably from those prevalent in those early days and to work out without many essential modifications ancient theories and practices in education is by no means a practical proposition. Yes we must seek the elements of value in our ancient heritage. we must assimilate the old while holding to the now. Thus will we render more beneficial our present educational system, the great defect of which is that it is an exotric in an alien soil, It is unsuited to our needs and requirements and incapable of developing the distinctive thread of our national thought and culture.

If education is described as the preparation for life or for complete living the indian educator had formed of it a true and valuable conception. The ancient curriculum was not confined to mere booklearning. It included many more things, Physical development received its due share of attention. In those early days little was known of our vast expenditure on costly buildings. The place of instruction was outdoor under the shade of a tree, in a natural environment which impressed what was learnt all the more deeply on the mind. The student's life was, moreover, one of healthy activity, for he had to work for the teacher in his house and on the field, looking after his cattle and even collecting alms for him. Moral education was similarly not neglected. The period of studentship was a time for vigorous discipline. Rigid rules were laid down for the conduct of the pupils including hygienic, moral and religious

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

precepts and the regulation of good manners. Implicit obedience was expected and obtained from the student by the teacher and there were elaborate rules for the respect due to the latter.

The modern demand is for an education which develops all the faculties, Physical, moral and mental. From what we know of the ancient system of education in this country methods were followed which conduced to the achievement of this aim. Those were days before science was known or had changed the possibilities of existence, Yet in this civilised and advanced generation we must acknowledge the value of Indian methods. The necessity for open air schooling as far as practicable is emphasised by us today. Healthy outdoor sports are recommended to keep up the physique of the student and the value of moral training is endorsed. We are thus advancing in a right direction. What we should recognise, however, is that our educational goal is age old. We are not experimenting with new fancied ideas but are adopting traditions or our ancient system in introducing what we consider are twentieth century educational reforms. Thus progress be accelerated, for the Indain mind is slow to accept innovation but that which is traditional and of proved utility finds ready favour.

Religion is a tremendous force and the chief concerns of all Asiatic people. From start to finish Eastern Philosophy and literature are religious. In India religion has pervaded education as all things else. The very purpose of education in the early ages was religious, namely, to train young Brahmans for their duties in life as priest and teachers of others. Thus the spiritual side of education was greatly stressed. The idea of educational discipline was extended to the whole of life and the theory of Asrams or stages those of student, house holder hermit and wandering asectic was developed. The student was first to acquire learning. He was next to enter upon the 2nd stage that of grihasta or house holder. Then after having brought up a family and done his duty in the world he would enter upon the life of a Vanprastha or forest hermit and later become a 'Sannyasi' or wandering ascetic. The ancient Brahmanic education was therefore not only a preparation for the life but for a future existence as well.

In this utilitarian age when religion is treated as obsolete and the all engrossing objective ordinarily are personal ambition and the advancement of material prosperity it becomes all the more necessary

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

for us to retain our ancient ideals. We should try as in the past to teach true values and give the students a guidance for all duties and relations of life... the practical duties of life. At a later stage of history in India (as in the Middle age in Europe) a tendency arose to life. The current philosophy taught the unreality of the world and that the highest wisdom was to... release from worldly fetters. But Islam has disapproved strongly of extreme other worldliness. The Holy Quaran has declared against the monastic life, for if all were to forsake the world the bonds of society would soon be broken. In our daily prayers we Muslims beseech Allah saying. 'Our Lord grant us good in this world and good in the hereafter.' Our sin should be to hermonise in due proportion the two purposes, spiritual and secular, in the education we impart. Much can be done in accomplishing this aim by impressing on the girls the excellence of our ancient ideals and of the life of great national heroes.

One of the most notable characteristics of Indian educational ideals is the relation between pupil and teacher. The Indian system knew nothing of a large Institution or a large class of pupils taught together. There was usually one teacher for a few pupils from the beginning to the end of his period of studies. Thus individual attention was given. A family relationship sprang up between teacher and pupils which had a high moral effect. 'In the most', writes an educationist, 'it is the Institution rather than the teacher which is emphasised and it is the school or college which a student regards as his 'Alma Mater' In India it is the teacher rather than the Institution that is prominent and the same affection and reverence which a western student has for his 'Alma Mater' is in India bestowed with a life long devotion upon the teacher.' It is not desirable or practicable in this democratic age when a general spread of education should be our aim to abolish large Institution. But we may with benefit require of the teacher the high responsibility of moulding the character of the pupil by personal influence and example. We must require of our teachers a high intellectual moral and spiritual standard and our aim should be to work for a condition which shall make such a class of teachers available. The teaching profession is one of the noblest in the world. Its responsibilities and opportunities both require to be increased.

The state of the education of women in India has for long centuries been deplorable. In the early Aryan period women held a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

position or authority and honour. We are told in the 'Upanishads' of women who took part in deep discussion on philosophical truths and the authorship of some Vedic hymn is ascribed to them. Yet even in the Rigg Veds there are indications that women were coming to be looked down upon as inferior beings who should remain in subjection to men. Education for women has therefore become anonymous with us for breaking the barrior of ancient custom which shut them from learing. When we advocated the education of girls we generally imply the adoption of western methods and deals in their training to the exclusion of all that is Indian. This mistake on our part cannot be too strongly guarded against. We should not fail to set before the Indian girl the great and noble ideals of womenhood which our tradition has developed. This ideal was narrow and circumscribed in the past. We may enlarge and widen it increasing its excellence but what we should avoid is its total neglect and a tendency to slavish imitations of Western custom and tradition. In the past, with a few exception our women were not noted for scholastic attainments. Their sphere was the domestic. Yet in the obscurity of their lives they conducted their duties with capacity and considerable amount of...and care. Their fingers were toilworn. The cares of family, the effort to advance the happiness of others, these engrossed them. They were loyal and steadfast in times of endurance and hardship and proved to be in the words of the Mahabharata—

'A companion in solitude, a father in advice. A rest in passing through life's wilderness.'

We should by all means broaden the out-look of our girls and teach them to modernise themselves. Yet they should be made to realise that the domestic duties entrusted to them cover a task on which the selfare of the country depends. They should not fall behind their illiterate sisters in splendid endurance, heroism and discipline. We should teach our girls if they are to fulfil their heavy duties commendably, above all to concentrate on desires and efforts which are not superficial. We should teach them that the art of happiness lies just in discipline, that service should be their watchword, even though that service may not be more than a determination 'not to a by add transient sign to the sum total of the world's unhappiness.'

In ancient India the arts and crafts were not neglected. The caste system with its many disadvantages, helped to foster them and keep

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

up the standard of work. The dexterity and skill of each particular trade was handed down from father to son. The teaching was by handling and observing real things and unconsiously the boy picked up from his father many secrets of the trade. The encouragement of kings and great nobles was also responsible for the production of really fine work. But in these days the tradition of vocational training has disappeared in India. Parents give no thought to the career which their boy or girl adopted by temperament to adopt, all that they desire being that their child should obtain a hallmark of the University, a degree I feel tempted to quote from a poem by Justice Akbar, which runs thus—

'Tifl men bu a's Keya me bap atwar kee. Dooth to dibbe
ka hai, Ta'llm hai sicar kee.
That is, How can the infant get any scent of
its parents' character.
While it is fed on tinned milk and gets educated
by the Government?

The ancient tradition of vocational training (although this training must be given today under changed circumstances) must be revived by active propaganda.

The future of India lies in its girls. The development of its educational system on proper lines is therefore a question of permanent importance. Although India must learn many lessons from the West, to impose on it the western system without modifications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain the elements of good in her age old traditions of thought and methods. It must retain her social inheritance of ideas and emotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the West a new educational practice and tradition may be evolved which will transcend both that of East and the West.

In short, our girls would not only obtain University degrees, but must be ideal daughter, wives and mothers-or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~